ব্যথা বেদনা ও তার উপশম

অরুণ কুমার পাল

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

ব্যথা বেদনা ও তার উপশম

ডাঃ অরুণ কুমার পাল

বি.এস.সি., এম.বি.বি.এস., ডি.এ. (ক্যাল), এম.এস. (অ্যানেস্থিসিয়া)

অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানেস্থিসিয়োলজি,

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কলিকাতা ;

প্রেসিডেন্সী সার্জন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

BYATHA BEDANA O TAR UPASAM

[PAIN RELIEF]

Dr. Arun Kumar Paul

প্রকাশকাল : অক্টোবর, ১৯৮৬

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা]

আর্য ম্যানসন (নবম তল),

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,

কলিকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রক :

রূপলেখা

২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : দুর্গা রায়

চিত্রাঙ্কন : পরেশ মুখার্জী

মূল্য : চব্বিশ টাকা

Published by Dr. Ladli Mohan Roychowdhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally sponsored scheme of production of books and literature in regional languages at the University level, launched by the Government of India, the Ministry of Human Resources Development (Department of Education), New Delhi.

॥ এই গ্রন্থ
শ্রীমতী কন্যাকুমারীকে
উৎসর্গীকৃত ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'ব্যথা বেদনা ও তার উপশম' শীর্ষক পুস্তকখানির রচনার এবং প্রকাশনার জন্য অনেকের কাছেই আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। ডাঃ হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা এই বইটি প্রণয়নে অনেক উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন, তার জন্য আমি তাঁর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। এছাড়া যাদের কাছে সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেছি, তাদের মধ্যে ডাঃ বিমল বরন হোড়, প্রধান, অ্যানেস্থেসিয়া ডিপার্টমেন্ট, ডাঃ প্রতুলকুমার দাশ, শিশু শল্যচিকিৎসক, ডাঃ কৃষ্ণকুমার হোড়, ডাঃ দিলীপ মুখার্জী, অ্যানেস্থিটিষ্ট, মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা এবং শ্রী সুভাষ হালদার, ফিজিওথেরাপিস্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসংগে বন্ধুবর স্বর্গীয় ডাঃ সুবীরকুমার ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে মনে পড়ে। তার উৎসাহ এবং আন্তরিক শুভকামনা আমাকে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছে। তার অকালমৃত্যুতে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। তার আত্মার শান্তি কামনা করি।

এই পুস্তক প্রণয়নে বিভিন্ন মেডিকেল পত্রপত্রিকা এবং পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং সে সকল গ্রন্থবিবরণীতে উল্লেখিত হয়েছে। সেগুলির লেখকের এবং প্রকাশকের কাছে আমি সবিশেষ ঋণী।

এই পুস্তক প্রকাশনার বিরাট দায়িত্ব বহন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। এর মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক ডঃ লাডলী মোহন রায়চৌধুরী এই বই প্রকাশের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছেন—তাঁর কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। ভূতপূর্ব আধিকারিক শ্রী দিব্যেন্দু হোতার সক্রিয় সহযোগিতাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পুস্তকের ছবিগুলি সুন্দরভাবে এঁকেছেন শ্রীপরেশ মুখার্জী এবং যত্নসহকারে প্রুফ সংশোধন করেছেন শ্রী সুরতোষ দত্ত—তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এছাড়াও আমার বহু শুভানুধ্যায়ী, সহকর্মী এবং ছাত্রছাত্রী এই পুস্তক

প্রকাশে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং প্রভূত সহযোগিতা করেছেন—তাঁদের প্রত্যেকের জন্য রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সবশেষে স্বীকার করতেই হবে যে শ্রীমতী কন্যাকুমারী এই পুস্তক প্রণয়নে অকুণ্ঠ অশেষ উৎসাহ এবং প্রেরণা জুগিয়েছেন, তাঁকে সর্বান্তঃকরণে জানাই অজস্র ধন্যবাদ, প্রীতি আর শুভেচ্ছা।

জন্মাষ্টমী, ১৩৯৩ ;
২৭শে আগষ্ট, ১৯৮৬।

অরুণ কুমার পাল

Pain is the cry of nature in distress.

—Rovenstine

Divine is the task to relieve pain.

—Hippocrates.

Words are the most powerful drugs to mankind.

—Kipling

ভূমিকা

ব্যথা, বেদনা বা যন্ত্রণা মানুষের এক বিশেষ অনুভূতি। এই ব্যথা সাধারণতঃ দেহকোষের ক্ষতি বা অসুখ থেকে উদ্ভূত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই ব্যথার কারণ নির্ণয় করা যায় এবং সেইমত পর্যাপ্ত চিকিৎসায় দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ব্যথা উপশম করা সম্ভব। তবে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা। এই ধরনের ব্যথা মানুষকে পঙ্গু করে ফেলে, অনেক সময় সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, এমন কি দীর্ঘস্থায়ী কষ্টকর অতিষ্ঠ ব্যথায় রোগীর জীবনে বিতৃষ্ণা আসে। রোগ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে, সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় রোগী আত্মহত্যাও করে বসে। স্বাভাবিক মানবিক কারণেই এই সব দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা এক বিরাট স্বাস্থ্য সংকট। এই সব ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে বা উপশম করতে সেই আদিকাল থেকেই চিকিৎসাবিদদের চেষ্টার অন্ত নেই। আধুনিককালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে, এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে ব্যথা উপশম করা সম্ভব হয় না। সেসব ক্ষেত্রে ব্যথাকে অলংকার মেনে নিয়েই কালাতিপাত করা ছাড়া উপায় থাকে না।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অ্যানেস্থিসিয়া বিজ্ঞানের এই ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে অবদান অনেক। বিভিন্ন ধরনের ব্যথা উপশমকারী ঔষধ প্রয়োগ, হিপনোসিস বা সম্মোহনবিদ্যা, আকুপাংচার পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের নার্ভ ব্লক, স্পাইনাল ব্লক, এপিডুরাল ব্লক, বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা পদ্ধতি, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি তাপ প্রয়োগ, ক্রায়োএনালজেশিয়া, সাইকোথেরাপি, ফিজিওথেরাপি ইত্যাদির সাহায্যে আধুনিককালে ব্যথা উপশমের চেষ্টা করা হয় এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রোগীর ব্যথা উপশম ঘটে। আজকাল বিভিন্ন দেশে ব্যথা নিবারণের জন্য ক্লিনিক খোলা হচ্ছে। এখানে বিশেষজ্ঞ অবেদনবিদ্যাবিশারদ চিকিৎসক আধুনিক ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সাহায্যে রোগীর ব্যথা নিরাময় বা উপশমের চেষ্টা করেন। অবশ্যই এই সব ক্লিনিকে শল্যচিকিৎসক, স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞ, মানসিক

রোগ বিশেষজ্ঞ এবং ফিজিওথেরাপিস্টের যৌথ প্রচেষ্টা থাকা দরকার। আমাদের দেশেও এই সব ক্লিনিকের ব্যাপক প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইংরেজী ভাষায় এই ব্যথাবিজ্ঞান বিষয়ে অনেক বই আছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় নেই। অথচ শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এখন জাতীয় নীতি হিসাবে স্বীকৃত। সেই কারণে বাংলা ভাষায় এই ব্যথাবিজ্ঞানের প্রাথমিক বইটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক জ্ঞান বিস্তারে কিছুটা সহায়ক হবে—এই আশা নিয়ে বইটি রচিত হয়েছে।

মানবদেহের বিভিন্ন অংগপ্রত্যংগের ব্যথা, বিশেষতঃ দীর্ঘস্থায়ী পুরানো ব্যথার বিভিন্ন দিক এবং তার চিকিৎসা যথাসম্ভব সহজ, সরল, সাবলীল এবং বোধগম্যভাবে এই পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে। এই পুস্তকে অনেক সুপরিচিত ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং অনেক সময় মূল ইংরেজী শব্দগুলি বাংলা বানানে লেখা হয়েছে। পরিভাষা যাতে বিষয় বোঝার পক্ষে অন্তরায় না হয় সেদিকে যথাসম্ভব সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

পরিশেষে বিনীত বক্তব্য এই যে যাদের জন্য এই পুস্তক রচিত সেই সাধারণ চিকিৎসক এবং মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের ব্যথাবিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই পুস্তক কিছুটা সহায়ক হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

জন্মাষ্টমী, ১৩৯৩ ;
২৭শে আগষ্ট, ১৯৮৬।

৮/ডি মধু গুপ্ত লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০১২।

অরুণ কুমার পাল

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
শারীরবৃত্তিয় বিচার বিবেচনা

ব্যথা বেদনা এবং যন্ত্রণা মানুষের এক অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া। প্রত্যেক মানুষকেই কোন না কোন সময় যন্ত্রণার শিকার হতেই হয়। অনেক অসুখেই রোগীর যন্ত্রণা হয় এবং এই যন্ত্রণার প্রকারভেদে, বিস্তৃতি ব্যাপকতায় এবং আনুষংগিক উপসর্গে চিকিৎসকের রোগনির্ণয়ে অনেক সাহায্য হয়। এই যন্ত্রণা বা ব্যথা বেদনা অবশ্যই আমাদের শরীরে একটি রক্ষণাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যখনই শরীরের কোন অংশে বা কোষে ক্ষতি হয়, তখন ব্যথা দিয়েই অনেক সময় অনুভূত হয় এবং শরীরও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে ক্ষতিকর ক্রিয়া থেকে যথাসম্ভব শরীরকে বাঁচাতে।

মানুষের ব্যথা অনুভূতি না থাকলে তাকে অনেক বিপদ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হতো। আগুনের কাছে অত্যধিক তাপে ব্যথা অনুভূতি হয় তাই মানুষ আগুন থেকে সরে থাকে। অজান্তে তাপ অনুভূত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আগুন থেকে সরে যায়। ঘুমের সময় একপাশে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলে নীচের দিকে রক্তপ্রবাহ কমে যায় এবং এর ফলে ব্যথা অনুভূতি হয় এবং তখন মানুষ নিজের অজান্তেই পাশ ফিরে শোয়। এই রকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যাতে সুস্পষ্ট বোঝা যায় ব্যথা অনেকসময় মানুষের উপকারে লাগে —তার রক্ষণাত্মক ভূমিকার জন্য।

ব্যথা বেদনার প্রকারভেদ :

ব্যথা বেদনা নানা প্রকারের হতে পারে। এদের মধ্যে সূচ ফোটানো ব্যথা (pricking), জ্বালা করা ব্যথা (burning) এবং বিরামবিহীন (aching) ব্যথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য আরও অন্য ধরনের ব্যথা হতে পারে, যেমন দপ দপ করা (throbbing) ব্যথা, মোচড় দেওয়া (spasmodic) ব্যথা, টান ধরা (cramping) ব্যথা, বৈদ্যুতিক শক লাগার মত (electric) ব্যথা ইত্যাদি।

সূচ ফোটানো ব্যথা সাধারণতঃ হয় শরীরের চামড়ায় কিছু তীক্ষ্ন জিনিষ ফুটে গেলে অথবা ছুরি বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে কেটে গেলে। এই ধরনের ব্যথা শরীরের অনেকটা জায়গা জুড়ে হতে পারে। জ্বালা করা ব্যথাও খুব তীক্ষ্ন ধরনের হয় এবং খুবই কষ্টকর। Aching ব্যথা সাধারণভাবে শরীরের অভ্যন্তরে হয় এবং কমবেশী এটাও অস্বস্তিকর।

ব্যথা বেদনার অনুভূতি শরীরের প্রায় সর্বত্রই হতে পারে। মুক্ত স্নায়ুপ্রান্তে (free nerve terminal) প্রথম ব্যথার অনুভূতি হয় এবং তারপর স্নায়ুতন্ত্রের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তু দিয়ে প্রবাহিত হয়। ব্যথা বেদনার অনুভূতি সম্বন্ধে প্রধানতঃ চারটি বিষয় বুঝতে হবে—ব্যথা কী ধরনের, ব্যথা খুব বেশী অথবা কম, ব্যথার ব্যাপ্তি কত এবং ব্যথা কোন অংশে সীমাবদ্ধ কী না—তা বুঝতে হবে।

অগভীর বা superficial ব্যথা মোটামুটি একটি বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে, তবে গভীর বা deep ব্যথা অনেকসময় সঠিক বোঝা যায় না। আবার পেটে বা বুকের অভ্যন্তরে visceral ব্যথা সঠিক বোঝা আরও কঠিন এবং এসব ব্যথা অনেক সময় শরীরের অন্য অংশে নির্দেশিত হয়—একে বলে নির্দেশিত বা referred ব্যথা।

এই অগভীর বা গভীর বা নির্দেশিত ব্যথা বেদনা সবই কিন্তু বহির্দেশীয় (peripheral) ব্যথা। এছাড়াও মস্তিষ্কস্থিত ব্যথা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের জন্য কেন্দ্রীয় বা central ব্যথাও হতে পারে। আবার মানসিক কারণে psychogenic ব্যথাও হয়। সুতরাং ব্যথা বেদনার শ্রেণীবিন্যাস মূলতঃ ব্যথা কোথা থেকে উদ্ভূত তা থেকেই করা হয়। যেমন ঃ

১। বহির্ভাগীয় (peripheral) ব্যথা
- ক) অগভীর (superficial) ব্যথা
  চামড়ায় বা ত্বকে (cutaneous) ব্যথা
- খ) গভীর (deep) ব্যথা
  মাংসপেশীতে, হাড়ের সন্ধিস্থলে (somatic) ব্যথা
  আভ্যন্তরীণ (visceral) ব্যথা
- গ) নির্দেশিত (referred) ব্যথা

২। কেন্দ্রীয় (central) ব্যথা

৩। মানসিক (psychological) ব্যথা

এই সব ব্যথাই আবার তার নিজস্ব গুণের তারতম্যে, তীক্ষ্নতার তারতম্যে, স্থায়িত্বকালের মাধ্যমে এবং কারণগত বৈষম্যে নানাভাবে বিশ্লেষণ এবং বিচার বিবেচনা করা হয়।

ব্যথা বেদনার বিস্তৃতি :

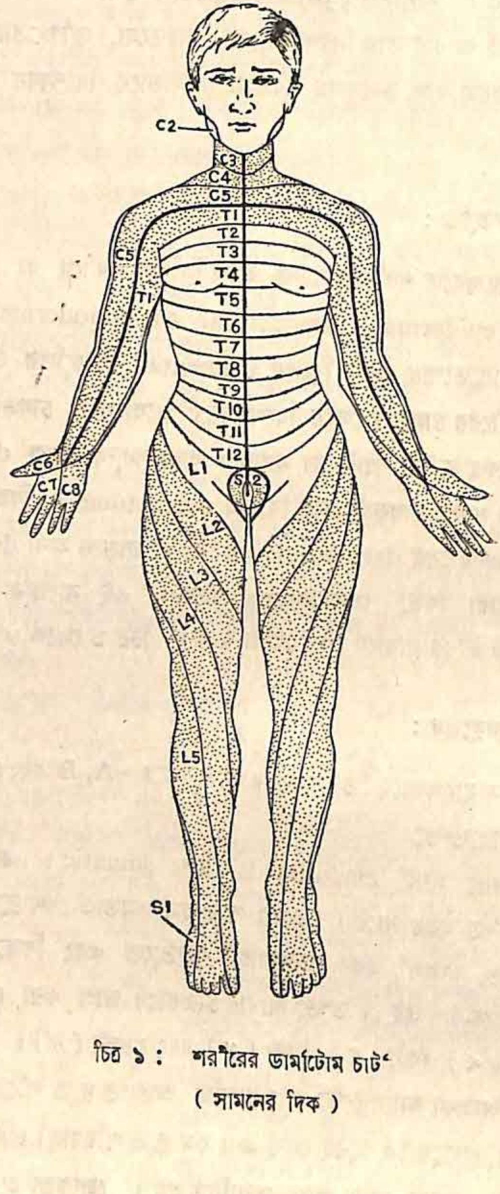
জন্মগত ভ্রূণতত্ত্বমতে শরীরের সমস্ত অংশ বিভিন্ন পর্যায়ে বা segment-এ বিভক্ত। সমস্ত epidermal, mesodermal এবং endodermal কোষসমষ্টি একটি বিশিষ্ট স্নায়ুতন্ত্রের একটি বিশেষ segmental বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে। এটি শরীরের চামড়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। চামড়ার যে অংশ শরীরের দুই দিকের দুইটি স্পাইনাল নার্ভের দ্বারা সমৃদ্ধ তাকে dermatome বলে। শরীরের সমস্ত চামড়াই তাই বিভিন্ন dermatome-এ বিভক্ত। অবশ্য এক dermatome-এ সেই dermatome-এর স্নায়ু ছাড়াও অন্য dermatome-এর স্নায়ুর দ্বারা কিছু overlaping থাকে। এই নার্ভের segmental বিস্তৃতি কয়েকটি ছবির মাধ্যমে বেশ বোঝা যায়। চিত্র ১ থেকে ৮ দ্রষ্টব্য।

স্নায়ুতন্তুর প্রকারভেদ :

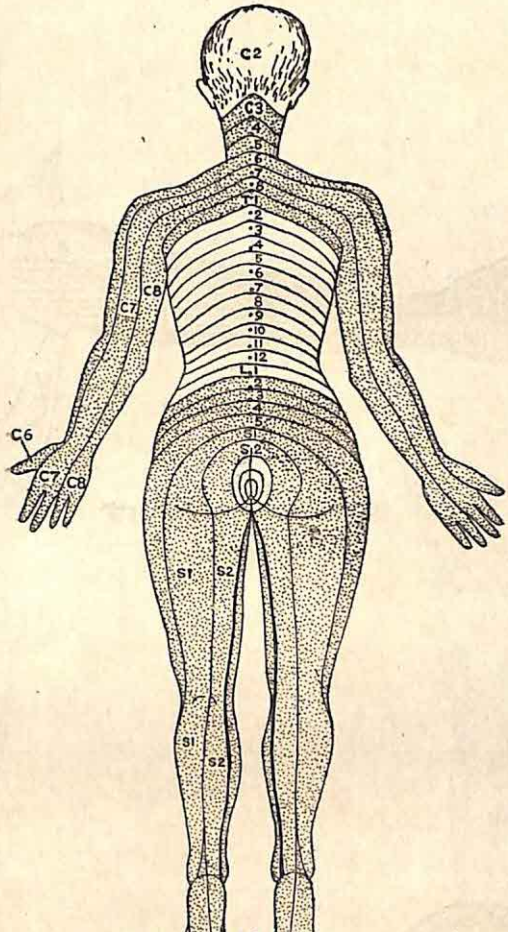
স্নায়ুতন্তু সাধারণভাবে তিন রকমের হতে পারে—A, B এবং C।

১। A স্নায়ুতন্তু

এই স্নায়ুতন্তু সবই medullated এবং somatic। এদের ব্যাস ১ থেকে ২০ μ পর্যন্ত হতে পারে। এদের পরিবহন ক্ষমতাও বেশ দ্রুত। এগুলি motor তন্তুতে, স্পর্শ এবং তাপবাহী তন্তুতে এবং কিছু ব্যথাবাহী স্নায়ুতন্তুতে থাকে। এই A তন্তু আবার চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন—আলফা (α), বিটা (β), গামা (γ) এবং ডেল্টা (δ)। এদের মধ্যে সব থেকে বড়—আলফা স্নায়ুতন্তু এবং এগুলি অত্যন্ত দ্রুত পরিবাহী। অন্য-দিকে ডেল্টা স্নায়ুতন্তুগুলি খুবই ছোট এবং কম দ্রুত পরিবাহী। এই ছোট ছোট স্নায়ুতন্তুগুলিই ওষুধের দ্বারা প্রথম প্রভাবিত হয়। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধগুলি খুব অল্প পরিমাণে দিলে বড় বড় স্নায়ুতন্তুগুলি এড়িয়ে ছোট ছোট তন্তুগুলিই আগে ব্লক হয়।

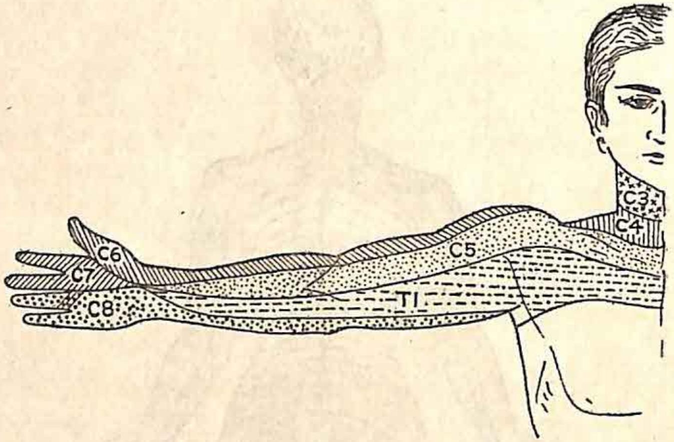


চিত্র ১ : শরীরের ডার্মাটোম চার্ট
(সামনের দিক)

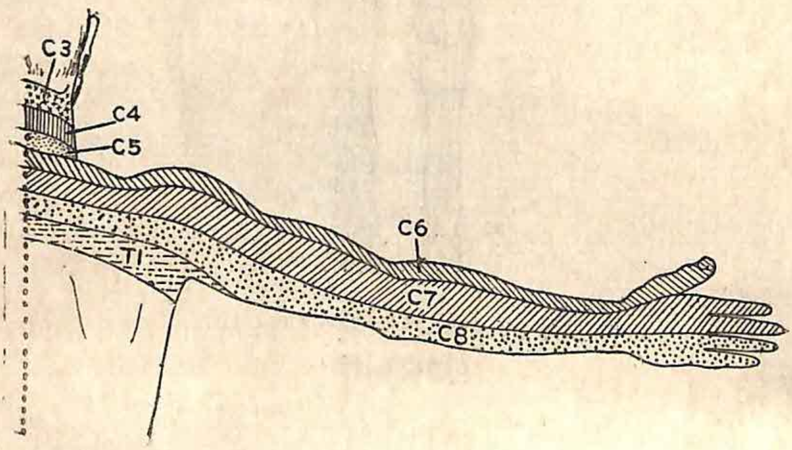


চিত্র ২ : শরীরের ডার্মাটোম চার্ট

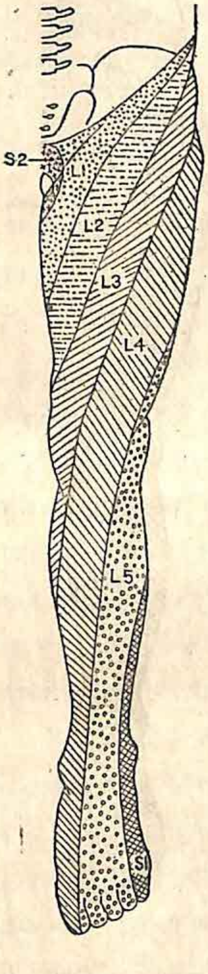
(পিছনের দিক)



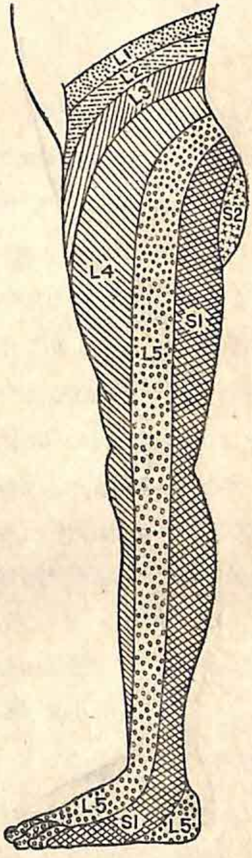
চিত্র ৩ : হাতের ডার্মাটোম চার্ট
(সামনের দিক)



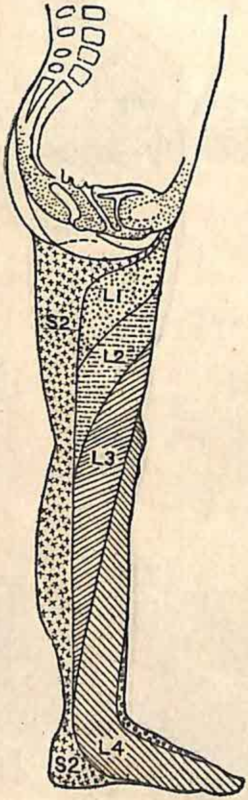
চিত্র ৪ : হাতের ডার্মাটোম চার্ট
(পিছনের দিক)



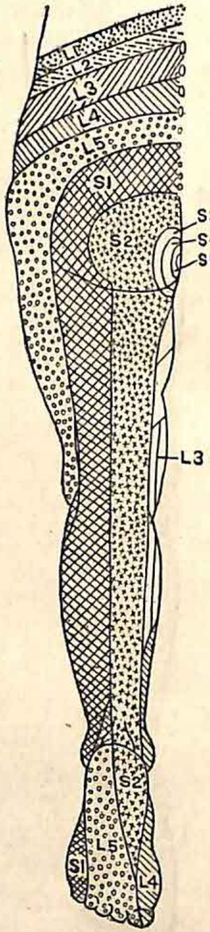
চিত্র ৫ : পায়ের ডার্মাটোম চার্ট
(সামনের দিক—
anterior aspect)



চিত্র ৬ : পায়ের ডার্মাটোম চার্ট
(বাইরের দিক—
lateral aspect)



চিত্র ৭ : পায়ের ডার্মাটোম চার্ট
(ভিতরের দিক—
medial aspect)



চিত্র ৮ : পায়ের ডার্মাটোম চার্ট
(পিছনের দিক—
posterior aspect)

২। B স্নায়ুতন্তু

এই স্নায়ুতন্তুগুলি সবই medullated। স্বয়ংক্রিয় (autonomic) preganglionic স্নায়ুতন্তুতে থাকে। এদের ব্যাস ১ থেকে ৩ μ পর্যন্ত হতে পারে।

৩। C স্নায়ুতন্তু

এগুলি non-medullated স্নায়ুতন্তু। এগুলি somatic এবং autonomic দুই স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যেই থাকে। Postganglionic motor এবং কিছু preganglionic fibre-এ এই C স্নায়ুতন্তু থাকে। এগুলি খুবই ছোট এবং এদের ব্যাস সাধারণতঃ ১ μ-এরও কম হয়।

ব্যথা বেদনা সাধারণতঃ C এবং A δ স্নায়ুতন্তুর মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়। C স্নায়ুতন্তু দিয়ে ব্যথা বেদনার অনুভূতি যায় প্রতি সেকেণ্ডে ২ মিটার কিন্তু A δ তন্তু দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ মিটার পর্যন্ত যেতে পারে। স্নায়ুতন্তু যত সরু হয় তাদের পরিবহন ক্ষমতা (conduction rate) তত কম। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ এখানে তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে। অত্যধিক ঠাণ্ডা স্নায়ুতন্ত্রের পরিবাহী ক্ষমতা অনেক কমিয়ে দেয়। শরীরের অক্সিজেনের অভাব ঘটলেও পরিবাহী ক্ষমতা কমে যায়। C স্নায়ুতন্তুগুলিকে অত্যধিক উদ্দীপিত করলে অনেক সময় রক্তচাপ কমে যেতে দেখা যায়।

স্নায়ুতন্তুকে অন্য আর একভাবেও শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। এখানে সমস্ত sensory স্নায়ুতন্তুকে 1, 2, 3 এবং 4—এই চার ভাগে ভাগ করা হয়। স্নায়ুতন্তু 1 আবার দুই ভাগে বিভক্ত—এরা 1 a এবং 1 b। স্নায়ুতন্তু 1 a সাধারণতঃ মাংসপেশীর spindle এবং annulospiral ending থেকে উদ্ভব হয় এবং স্নায়ু 1 b প্রধানতঃ golgi tendon organ থেকে বের হয়। এই 1 a এবং 1 b স্নায়ুতন্তু A α স্নায়ুতন্তুর সমগোত্র। স্নায়ুতন্তু 2 মোটামুটি মাংসপেশীর spindle, flower-spray ending, স্পর্শ এবং চাপ বা প্রেসার ইন্দ্রিয়ের জন্য উদ্ভূত এবং এরা A β এবং A γ স্নায়ুতন্তুর সমপর্যায়ের। স্নায়ুতন্তু 3 ব্যথা এবং তাপ গ্রাহক বা receptor থেকে উদ্ভূত এবং এটি A δ স্নায়ুতন্তুর পর্যায়ে পড়ে। স্নায়ুতন্তু 4 ব্যথা এবং অন্যান্য গ্রাহক থেকে উদ্ভব হয় এবং এটি dorsal root C স্নায়ুতন্তুর পর্যায়ে পড়ে।

ব্যথা বেদনার গ্রাহক (Pain receptors) :

আগেই বলা হয়েছে যে মুক্ত স্নায়ুপ্রান্তই ব্যথা বেদনার মূল গ্রাহক। এগুলি শরীরের সর্বত্র চামড়ায় এবং কিছু আভ্যন্তরীণ কোষেও থাকে। হাড়ের বহির্ভাগে periostium-এ, রক্তনালীর গাত্রে, হাড়ের সন্ধিস্থলে এবং মস্তিষ্কের falx এবং tentorium-এ এই মুক্ত স্নায়ুপ্রান্ত বেশী থাকে। আনুপাতিক হারে শরীরের অন্য আভ্যন্তরীণ অংশে ব্যথা অনুভূতিপ্রবণ স্নায়ুপ্রান্ত কম থাকে। অবশ্য অনেক বেশী কোষের ক্ষতি বা damage হলে এসব জায়গায় বিরামবিহীন বা aching ব্যথা হতে পারে। যে কোন উদ্দীপনা অতিরিক্ত মাত্রায় যে কোন গ্রাহক কেন্দ্রকে উত্তেজিত করলে ব্যথা হয়।

ব্যথা বেদনা হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্দীপক (stimuli) :

ব্যথা বেদনার জন্য উদ্দীপক জিনিষগুলি সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যদিও ব্যথা বেদনার গ্রাহকগুলি প্রধানতঃ একটি শ্রেণীর উদ্দীপক দিয়েই উত্তেজিত হয়, তবে এদের অনেকেই একটির বেশী উদ্দীপক দিয়েও উত্তেজিত হয়। উদ্দীপকগুলি নিম্নধরনের হতে পারে।

১। যান্ত্রিক বা mechanical

শরীরের পেশীসমূহে অত্যধিক টানে বা অত্যধিক ক্ষতিতে ব্যথা অনুভূতি হয়। এদের mechanosensitive ব্যথা বেদনার গ্রাহক বলে।

২। তাপীয় বা thermal

অত্যধিক ঠান্ডায় বা গরমেও ব্যথা অনুভূতি হয়। এদের thermosensitive ব্যথা বেদনার গ্রাহক বলা হয়।

৩। রাসায়নিক বা chemical

নানাধরনের রাসায়নিক পদার্থ যেমন ব্রাডিকাইনিন (bradykinin), সেরোটোনিন (serotonin), হিষ্টামিন (histamine) পটাশিয়াম, অম্লজাতীয় পদার্থ, প্রষ্টাগ্ল্যান্ডিন (prostaglandin), এসিটিল কোলিন (acetylcholine); প্রোটিওলাইটিক এনজাইম (proteolytic enzymes) ইত্যাদিও ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে। এদের chemosensitive ব্যথা বেদনার গ্রাহক বলা হয়। আরও কয়েকটি ব্যথাসৃষ্টিকারী জিনিষের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক) অম্লজাতীয় পদার্থ (বিশেষতঃ pH যাদের ৩ থেকে কম)

খ) ক্ষারজাতীয় পদার্থ (বিশেষতঃ pH যাদের ১১ থেকে বেশী)

গ) Substance P

ঘ) Hypotonic solutions

ঙ) Hypertonic solutions

চ) Plasma kinins

ছ) হিষ্টামিন

জ) 5-hydroxy tryptamine

ঝ) যে সব পদার্থ হিষ্টামিন নিঃসরণে সহায়তা করে

ব্যথা বেদনার গ্রাহকগুলি বেশীর ভাগ সময়েই উদ্দীপক জিনিষগুলির সংগে মানিয়ে নিতে পারে না। যদি ব্যথা বহুদিন ধরে চলতেই থাকে তখন অনেক ক্ষেত্রে ব্যথা বেদনার threshold কমে যায় এবং এর ফলে অল্পেই রোগী বেশী ব্যথা অনুভব করে—একে hyperalgesia বলে।

শরীরের কোন অংশ যদি মোটামুটি ৪৫° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার সংস্পর্শে আসে তবেই ব্যথা অনুভূত হয়। এই ব্যথা বাড়তেই থাকে যত বেশী কোষসমূহের ক্ষতি হতে থাকে। তাপ কতটা কোষসমূহ নষ্ট করতে পারে তারই উপর ব্যথা বেদনার কমবেশী নির্ভর করে। হাতে, পায়ে বা শরীরের কোন জায়গায় কেটে গেলে প্রত্যক্ষভাবে নার্ভের ক্ষতির জন্য এবং ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রাসায়নিক পদার্থের জন্য প্রভূত ব্যথা হয়।

রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যে কয়েকটি জিনিষ যেমন হিস্টামিন, সেরোটোনিন, অম্লজাতীয় পদার্থ ইত্যাদি মুক্ত স্নায়ুপ্রান্তকে যথেষ্ট ক্ষতি করে। খুব বেশী ক্ষতি করে প্রোটিওলাইটিক এনজাইমগুলি। অবশ্য ব্রাডিকাইনিন এবং প্রস্টা-গ্লান্ডিন স্নায়ুপ্রান্তকে কোন ক্ষতি না করেও যথেষ্ট ব্যথা সৃষ্টি করে। এই সব রাসায়নিক পদার্থ chemosensitive ব্যথা বেদনার গ্রাহকদের উদ্দীপিত করেই এবং অনেক সময় অন্য mechanosensitive এবং thermosensitive গ্রাহকদের threshold কমিয়ে দেয়।

শরীরের কোন অংশে যদি রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, তবে সে অংশে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয়। সেই অংশের বিপাকীয় হার যদি খুব বেশী হয় তবে অত্যন্ত তাড়াতাড়িই ব্যথা হয়। এই ব্যথার কারণ সম্যক এখনও বোঝা যায়

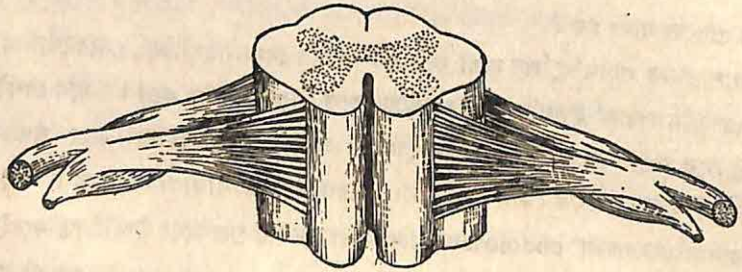
নি। তবে সেই অংশে যদি অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা করা হয় তবে ব্যথার উপশম ঘটে। অত্যধিক ল্যাকটিক এসিড এবং অন্য সব রাসায়নিক পদার্থ যেমন ব্রাডিকাইনিন, প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ইত্যাদিকে—এই ব্যথা সৃষ্টির কারণ হিসাবে অনেকে মনে করেন।

মাংসপেশীসমূহের টান অনেক সময়েই অত্যধিক ব্যথা সৃষ্টি করে। এটি যান্ত্রিক উপায়ে ব্যথা বেদনার গ্রাহককে উদ্দীপিত করে। আবার রক্ত চলাচলে বিঘ্ন হওয়ার জন্য নানারকম রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি হয় এবং এরাও ব্যথার উদ্রেক করে। মাংসপেশীসমূহে টান হওয়ার সময় বিপাকীয় হারও অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং এতেও আনুপাতিকভাবে শরীরের সে অংশে রক্তস্বল্পতা বা ischaemia বেশী হয়। এটিও ব্যথা হওয়ার অন্য একটি কারণ।

সুতরাং শরীরের কোন অংশে noxious stimuli দিলে সেই অনুভূতি এক বিশেষ গতিপথে মস্তিষ্কে যায় এবং সেখানেই ব্যথার বিশ্লেষণ হয়। এই ব্যথার গতিপথে পড়ে সুষুম্না কান্ড এবং এর সম্বন্ধে কিছু অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সুষুম্না কান্ড (Spinal cord) : (চিত্র-৯)

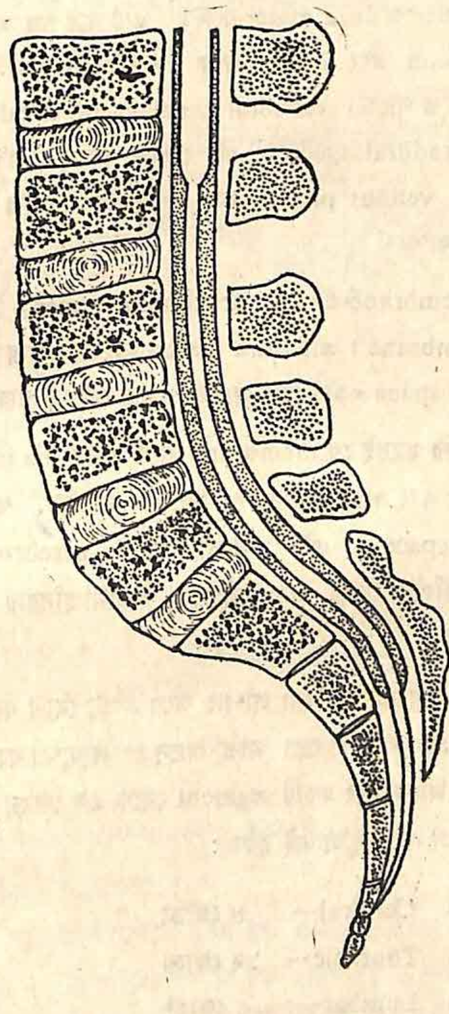
এটি আসলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ। এটি অ্যাটলাশ ভার্টিব্রার উপরের লেভেলে মস্তিষ্কের medulla oblongata-র অংশে যুক্ত থাকে এবং দ্বিতীয়



চিত্র ৯ : সুষুম্না কান্ডের সারভাইকাল অংশ

লাম্বার ভার্টিব্রার উপরের লেভেল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। মোটামুটি ৪৫ সেন্টি-মিটার লম্বা হয়। এটি vertebral canal-এর উপরের দুইতৃতীয়াংশে থাকে। সুষুম্না কান্ড নীচের দিকে conus medullaris-এ শেষ হয় এবং সেখান থেকে

filum terminale শেষ পর্যন্ত coccyx-এ শেষ হয় (চিত্র-১০)। শিশুকালে সুষুম্না কান্ড প্রায় পুরো vertebral canal ভরে থাকে। বয়স বাড়ার সংগে সংগে vertebral canal যত বাড়ে, সুষুম্না কান্ড তত বাড়ে না। সুতরাং যে



চিত্র ১০ : Vertebral canal-এর নীচের অংশ

স্পাইনাল নার্ভ শিশুকালে সমান্তরালভাবে বা আড়াআড়িভাবে বের হতো পরে পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে এগুলি অনেক বাঁকাভাবে বের হয়। লাম্বার এবং সেকরাল

নার্ভগুলি নীচের দিকে গোছাভাবে থাকে এবং তখন এক সংগে একে cauda equina বলে।

সুষুম্না কান্ড তিনটি membrane দিয়ে মোড়া থাকে। এর সব থেকে বাইরের membrane-কে dura mater বলে। এটি খুব শক্ত এবং উপরের দিকে foramen magnum এবং নীচের দিকে দ্বিতীয় সেকরাল ভার্টিব্রার নীচের বর্ডার পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। vertibral canal-এর হাড় এবং dura mater-এর মধ্যবর্তী স্থান extradural space। এই স্পেসে কিছু চর্বিজাতীয় জিনিষ, areolar tissue, venous plexus এবং স্পাইনাল নার্ভের anterior এবং posterior root থাকে।

এর পরের membrane-এর নাম arachnoid mater। এটি খুব স্বচ্ছ ধরনের সূক্ষ্ম membrane। এটি dura mater-এর গায়ে প্রায় জড়িয়েই থাকে। সুতরাং subdural space একটি ছোট্ট জায়গা—প্রায় বোঝাই যায় না।

সুষুম্না কান্ডের গায়েই যে membrane থাকে তাকে pia mater বলা হয়। এই dura mater এবং arachnoid mater-এর মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় subarachnoid space। এই স্পেসেই থাকে cerebrospinal fluid. স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়া দিতে হলে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ এখানেই ইঞ্জেকশন করা হয়।

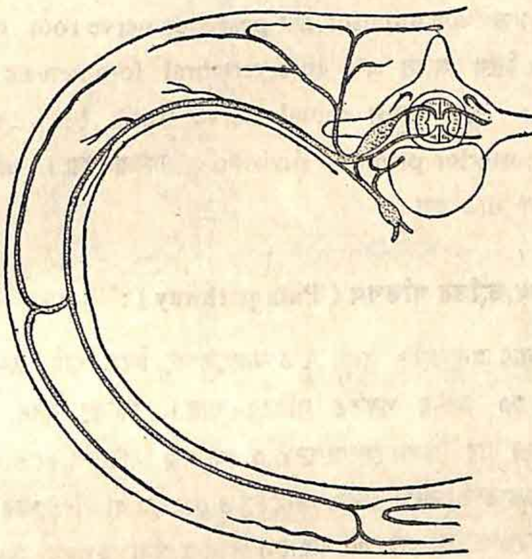
সুষুম্না কান্ডের সারভাইকাল এবং লাম্বার অংশ একটু মোটা ধরনের হয় কেননা এখান থেকেই হাতের এবং পায়ের নার্ভ আসে। সুষুম্না কান্ড মোট ৩১টি segment-এ বিভক্ত থাকে এবং একটি segment থেকে এক জোড়া স্পাইনাল নার্ভ বের হয়। স্পাইনাল নার্ভগুলি এই রকম :

১। Cervical— ৮ জোড়া
২। Thoracic— ১২ জোড়া
৩। Lumbar— ৫ জোড়া
৪। Sacral— ৫ জোড়া
৫। Coccygeal— ১ জোড়া

মোট—৩১ জোড়া

স্পাইনাল নার্ভ (Spinal nerve) : (চিত্র-১১)

সুষুম্না কান্ডের anterior এবং posterior nerve root এক সংগে হয়ে স্পাইনাল নার্ভ তৈরী হয়। সুতরাং segment অনুযায়ী মোট ৩১ জোড়া স্পাইনাল নার্ভ থাকে। এই স্পাইনাল নার্ভকে মিশ্র নার্ভ বলে, কেননা এতে motor এবং sensory উভয়েই থাকে।



চিত্র ১১ : থোরাসিক স্পাইনাল নার্ভ

Anterior root মস্তিষ্ক থেকে প্রান্তদেহে অনুভূতি আনে এবং এর মধ্যে নিম্নলিখিত ধরনের স্নায়ুতন্তু থাকে :

ক। মাংসপেশীসমূহের জন্য motor fibres

খ। Sympathetic preganglionic fibres। এটি সাধারণতঃ প্রথম থোরাসিক থেকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় লাম্বার সেগমেন্ট পর্যন্ত থাকে।

Posterior root সাধারণতঃ বড় হয়—অন্ততঃ anterior root-এর অনুপাতে। শরীরের সমস্ত অংশের এবং আভ্যন্তরীণ অংশের অনুভূতিও

posterior root-এ বাহিত হয়। Posterior root-এ একটি করে ganglion থাকে। এখানে চামড়ার ব্যথা, বেদনা, স্পর্শ, তাপ, মাংসপেশীর হাড়ের সন্ধি-স্থলের অনুভূতি এবং অন্যান্য (sympathetic) আভ্যন্তরীণ অনুভূতি প্রান্তদেশ থেকে সুষুম্না কান্ডের posterior root-এ আসে। Posterior spinal root-এ ৪০% non-medullated আর ৬০% medullated স্নায়ু-তন্তু থাকে।

সুষুম্না কান্ড থেকে anterior এবং posterior nerve root extradural space-এর মধ্য দিয়ে আসে এবং intervertebral foramen-এর কাছে এক সংগে যুক্ত হয়। এতে আসল spinal nerve trunk তৈরী হয় এবং পরে anterior ও posterior primary division-এ বিভক্ত হয়। এইগুলি পরে বিভিন্ন প্রান্তিক নার্ভ হয়।

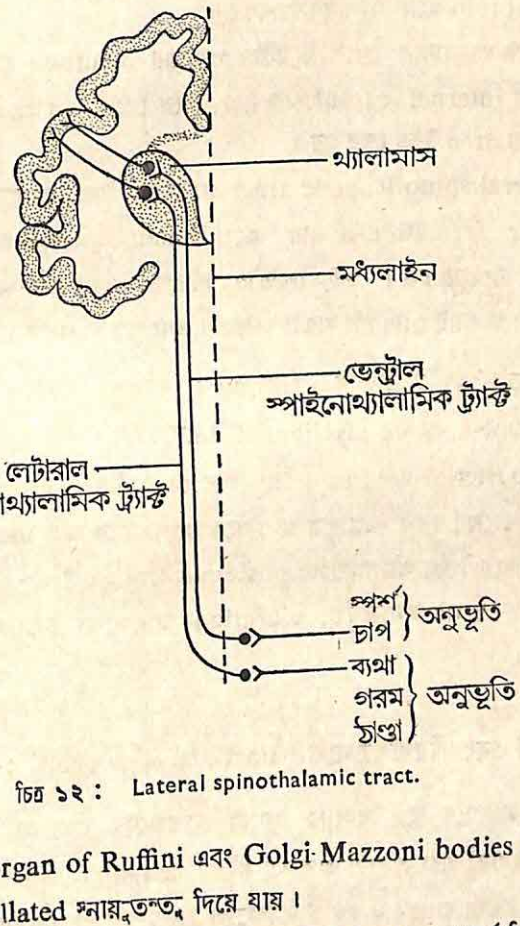
ব্যথা বেদনা অনুভূতির গতিপথ (Pain pathway) :

ব্যথা বেদনার অনুভূতি যখন A δ স্নায়ুতন্তু দিয়ে যায়, তখন সেকেন্ডে প্রায় ৬ থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত গতিতে যায়। কিন্তু যখন C টাইপের স্নায়ুতন্তু দিয়ে যায় তখন সেকেন্ডে ০.৫ থেকে ২ মিটার গতিতে যায়। এই দুই ধরনের স্নায়ুতন্তু দিয়ে ব্যথার অনুভূতি কেন্দ্রের বা মস্তিষ্কের দিকে যায়। যদি A δ স্নায়ুতন্তুকে ওষুধের সাহায্যে অথবা অন্য উপায়ে যেমন নার্ভকে compression করে অকেজো করা হয় বা ব্লক করা হয়, তবে pricking ব্যথা একেবারে চলে যায়। আবার যদি C টাইপের স্নায়ুতন্তুকে ব্লক করা হয় এবং A δ স্নায়ুতন্তু ঠিক থাকে তবে burning এবং aching ব্যথা দূরীভূত হয়। যাই হোক, এই দুই গতিতে—দ্রুত এবং ধীর গতিতে দুই রকম স্নায়ুতন্তু দিয়েই ব্যথা চামড়া বা প্রান্তদেশ থেকে মস্তিষ্কের দিকে যায়।

সুতরাং শরীরের কোন অংশে noxious stimulus দিলে দুইটি বিভিন্ন ধরনের ব্যথা অনুভূতি হতে পারে। প্রথমটি A δ স্নায়ুতন্তু দিয়ে বাহিত—এর ব্যথা খুব তীক্ষ্ন, বেশী এবং খুব ভালো বোঝা যায়। দ্বিতীয়টি C স্নায়ুতন্তু দিয়ে বাহিত। এই ব্যথা পরে আসে, খুব বেশী তীক্ষ্ম হয় না, অনেক বেশী স্থায়ী হয় এবং অনেকটা dull। দীর্ঘস্থায়ী উদ্দীপনা জাগালে দুই রকম ব্যথা একসংগে মিশে যায়—বিশেষ এক ধরনের ব্যথা আলাদা বোঝা যায় না,

অথবা সেখানকার নার্ভ অনুযায়ী একরকম ব্যথাই অনুভূত হতে পারে। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধে ছোট স্নায়ুতন্তুগুলি সহজেই ব্লক হয় এবং তার ফলে dull ব্যথা সহজেই উপশম করা যায়।

ব্যথা বেদনা সূক্ষ্ম non-medullated স্নায়ুতন্তু দিয়ে বাহিত হয়। ব্যথা বেদনার গ্রাহক—মুক্ত স্নায়ুপ্রান্ত, ঠান্ডার গ্রাহক—end organ of krause,



চিত্র ১২ : Lateral spinothalamic tract.

গরমের গ্রাহক—organ of Ruffini এবং Golgi-Mazzoni bodies। তাপের অনুভূতি medullated স্নায়ুতন্তু দিয়ে যায়।

ব্যথা বেদনার উদ্দীপনা বা impulse জাগালে sensory নার্ভ দিয়ে posterior root-এ যায় এবং সুষুম্না কান্ডে প্রবেশ করে। ব্যথা বেদনা এবং তাপের অনুভূতি এক সংগে tract of Lissauer তৈরী হয় এবং posterior horn cell-এ শেষ হয়। এটিই প্রথম neurone। Posterior horn cell থেকে

দ্বিতীয় পর্যায়ের neurone-এর আরম্ভ হয় এবং lateral spinothalamic tract-এর সৃষ্টি হয় (চিত্র-১২)। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের neurone বেশীর ভাগ সেই segment-এর বিপরীত দিকে cross করে এবং কিছু neurone একটি বা দুটি segment উপরে উঠে তবে cross করে। এই spinothalamic tract সুষুম্না কান্ডের lateral column-এ থাকে। উপরের দিকে medulla, pons এবং midbrain হয়ে থ্যালামাসে শেষ হয়।

আবার থ্যালামাস থেকে তৃতীয় পর্যায়ের neurone আরম্ভ হয়। এটি মস্তিষ্কের internal capsule-এর মধ্য দিয়ে গিয়ে cortex-এর postcentral gyrus-এর area 3তে শেষ হয়।

Lateral spinothalamic tract-এর থেকে কিছু স্নায়ুতন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে reticular formation-এ যায় এবং thalamocortical projection হয়ে মস্তিষ্কে বিস্তৃত হয়। এই দ্বিতীয় গতিপথ reticular system-এর সংগে যুক্ত থাকার জন্যই বোধ হয় শরীর সচেতন এবং সজাগ থাকে।

এছাড়াও একটি তৃতীয় pathway বা গতিপথ আছে। এটি posterior nerve root-এ বড় বড় myelinated স্নায়ুতন্তু দিয়ে তৈরী হয়। সুষুম্না কান্ডের posterior column দিয়ে গিয়ে medulla-র gracile এবং cuneate nuclei-তে শেষ হয়। এর পর অন্যদিকে cross করে এবং medial lemniscus-এর মধ্য দিয়ে গিয়ে থ্যালামাসের posterolateral nucleus-এ পৌঁছায়। এটি হাড়ের সন্ধিস্থলের অনুভূতি, vibration অনুভূতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য।

দ্রুতগামী এবং ধীরগতির ব্যথা (Fast and slow pain) :-

এই মতবাদে দুই ধরনের ব্যথার গতিপথের কথা বলা হয়। এর একটি অতি দ্রুতগামী এবং অন্যটি অত্যন্ত ধীরগতিতে যায়। শরীরের চামড়ায় ব্যথা উদ্দীপনা জাগালে প্রথমে একটি তীক্ষ্ণ ও জোরালো ধরনের ব্যথা অনুভূত হয় এবং সেই ব্যথা মোটামুটি স্থানীয় জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং তারপরে অন্য এক ধরনের ব্যথা অনুভূত হয়। সেই ব্যথা dull, aching এবং অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এই দুই ব্যথার প্রথমটি দ্রুতগামী (fast) ব্যথা এবং দ্বিতীয়টি ধীরগামী (slow) ব্যথা। মস্তিষ্ক থেকে যতদূরে এই

ব্যথার অনুভব হয় তত বেশী এই দুই ধরনের ব্যথা সুস্পষ্ট বোঝা যায়। মোটামুটিভাবে বলা হয় দ্রুতগামী ব্যথার জন্য A δ ধরনের স্নায়ুতন্তু দায়ী এবং ধীরগামী ব্যথার জন্য C ধরনের স্নায়ুতন্তুই দায়ী।

থ্যালামাস (Thalamus) :

ব্যথা বেদনার অনুভূতি প্রধানতঃ থ্যালামাসে হয়ে থাকে। থ্যালামাসের অনেক nuclei এই ব্যথা বেদনা অনুভূতির জন্য দায়ী। Ascending reticular formation-এর স্নায়ুতন্তু দুইভাবে থাকে—একটি থ্যালামাসের intralaminar nuclei-এর সংগে জড়িত এবং অন্যটি hypothalamus পর্যন্ত যায়। Spinothalamic tract থ্যালামাসের lateral nucleus-এ শেষ হয় আবার posterior column-এর স্নায়ুতন্তুও থ্যালামাসে শেষ হয়। সুতরাং সমস্ত অনুভূতির স্নায়ুতন্তুই থ্যালামাসে যায়।

Cerebral cortex-এর সমস্ত sensory area যদি পরীক্ষামূলকভাবে নষ্ট করে দেওয়া হয়, তবুও ব্যথা অনুভূতি একেবারে নষ্ট হয় না। যদি থ্যালামাস এবং নীচের কেন্দ্রগুলি ঠিক থাকে তবে ব্যথা অনুভূতি মোটামুটি ঠিক থাকে। তবুও cerebral cortex-এর ব্যথা অনুভূতির ক্ষেত্রে অবদান অনেক। এখানেই ব্যথা অনুভূতির সঠিক মান নির্ণয় হয় এবং ঠিক জায়গায় নির্দেশিত হয়। বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা cerebral cortex-এ দিলে অল্প কিছু ব্যথা অনুভূতি হতে পারে।

ব্যথা বেদনার সীমাবদ্ধতা :

ঠিক কতখানি জায়গায় ব্যথা হবে তা নির্ভর করে কতখানি স্পর্শ গ্রাহকে (tactile receptor) উদ্দীপনা ঘটেছে তার উপর। উদ্দীপনার তারতম্যেও কিছুটা নির্ভর করে। সূচ ফোটানো (pricking) ব্যথা সাধারণতঃ A δ স্নায়ুতন্তু দিয়েই যায় এবং মোটামুটি উদ্দীপনার জায়গাতেই ব্যথা অনুভূতি হয়। কিন্তু জ্বালা করা (burning) এবং aching ব্যথা C স্নায়ুতন্তু দিয়ে বাহিত হয় এবং অনেক জায়গা জুড়ে ব্যথার ব্যাপ্তি থাকে। বস্তুতপক্ষে এই ধরনের স্নায়ুতন্তু থ্যালামাস এবং hind brain-এ অত্যন্ত অগোছালোভাবে বিন্যস্ত থাকে।

সূচ ফোটানো ব্যথার গতিপথ :

সূচ ফোটানো বা pricking ব্যথা থ্যালামাসের ventrobasal complex-এ শেষ হয় এবং এখানেই tactile বা স্পর্শ অনুভূতিও শেষ পর্যন্ত আসে। এখান থেকে থ্যালামাসের অন্য জায়গায় এবং sensory cortex-এ ব্যথা অনুভূতি যায়। Sensory cortex ব্যথা অনুভূতিকে ঠিকমত জায়গায় নির্দেশিত করে।

জ্বালা করা ব্যথার গতিপথ :

জ্বালা করা (burning) ব্যথা এবং aching ব্যথা গতিপথে থ্যালামাস এবং brain stem-এর reticular formation-এর সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। এই reticular formation-এর সাহায্যেই cerebral cortex এবং মস্তিস্কের অন্য জায়গায় যেমন hypothalamus-এর সংগে ব্যথা বেদনার স্নায়ুতন্ত্র জড়িত এবং সক্রিয় থাকে। এর ফলে এই জ্বালা করা বা aching ব্যথা সমস্ত মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলে এবং প্রয়োজনে শারীরিক কুফলের প্রতিরোধ এবং রক্ষা করার চেষ্টা করে। এই ব্যথায় রোগী ঘুম থেকে জেগে ওঠে, রোগী নিজের রোগ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয়। সুতরাং এই সব ব্যথা একটি রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিতে পারে।

এই জ্বালা করা ব্যথা এবং aching ব্যথা অনেক জায়গা জুড়ে হতে পারে এবং অনেক সময়েই এই ব্যথা অসহনীয় হয়ে ওঠে।

আভ্যন্তরীণ ব্যথা বেদনা (Visceral pain) :

এই আভ্যন্তরীণ ব্যথা বেদনা সাধারণতঃ sympathetic নার্ভ দিয়েই অনুভূতি হয়। Sympathetic স্নায়ুতন্ত্র প্রথম থোরাসিক থেকে তৃতীয় লাম্বার সেগমেন্ট পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এদের connector cell সুষুম্না কাণ্ডের lateral horn cell-এ থাকে। আভ্যন্তরীণ ব্যথা অনুভূতি sympathetic chain এবং white rami communicans হয়ে posterior root ganglion-তে যায়। সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ অংগপ্রত্যংগের sympathetic supply নিম্নলিখিত ধরনের :

হৃৎপিণ্ড এবং এওর্টা : থোরাসিক ১ থেকে ৫

পিত্তস্থলী : থোরাসিক ৪ থেকে ১০

প্যানক্রিয়াস : থোরাসিক ৬ থেকে ১০
লিভার : থোরাসিক ৬ থেকে ১০
ক্ষুদ্রান্ত্র : থোরাসিক ৮ থেকে ১১
সীকাম, এপেনডিক্স : থোরাসিক ১০ থেকে ১২
কিডনী : থোরাসিক ১১ থেকে লাম্বার ২
জরায়ু : থোরাসিক ১১ থেকে লাম্বার ২

বেশীর ভাগ আভ্যন্তরীণ অংগপ্রত্যংগ থেকে ব্যথা বেদনা C ধরনের স্নায়ুতন্তু দিয়েই বাহিত হয়। এগুলি sympathetic নার্ভ দিয়েই সুষুম্না কান্ডে যায় এবং সেখান থেকে anterolateral spinothalamic tract-এ অন্যান্য বহির্ভাগীয় ব্যথা বেদনার স্নায়ুতন্তুর সংগে মস্তিষ্কে যায়।

কিছু আভ্যন্তরীণ ব্যথার স্নায়ু—সাধারণতঃ বৃহদান্ত্রের শেষাংশ, মলনালী এবং মূত্রস্থলীর স্নায়ু sacral parasympathetic নার্ভ দিয়েই সুষুম্না কান্ডের ভিতর যায়। Pharynx, শ্বাসনালী (trachea) এবং উপর খাদ্যনালীর (oesophagus) ব্যথা অনুভূতি glossopharyngeal এবং vagus নার্ভ দিয়েই বাহিত হয়। আবার diaphragm এবং খাদ্যনালীর নিম্নাংশের ব্যথা অনুভূতি phrenic নার্ভ দিয়ে যায়।

আভ্যন্তরীণ অংগপ্রত্যংগের ব্যথা বেদনা অনেক সময়েই অন্য জায়গায় নির্দেশিত (referred) হয়। ঠিক যে জায়গায় অংগটি আছে সে জায়গায় ব্যথা না হতেও পারে। ভ্রূণতত্ত্ব অনুযায়ী সেই অংগ (organ) ভ্রূণ সময়ে যে জায়গায় অবস্থিত ছিল সেই dermatome segment-এ ব্যথা অনুভূত হয়। এই কারণে হৃৎপিন্ডের ব্যথা তৃতীয় সারভাইকাল থেকে পঞ্চম থোরাসিক পর্যন্ত dermatome segment-এ নির্দেশিত হয়—যেহেতু হৃৎপিন্ড ভ্রূণ সময়ে গলা এবং বুকের উপরদিকেই অবস্থিত থাকে।

আভ্যন্তরীণ ব্যথা বেদনার কিছু স্নায়ু সোজাসুজি স্পাইনাল নার্ভ দিয়ে যায়। বিশেষতঃ পেরিটোনিয়াম, প্লুরা (pleura) এবং পেরিকার্ডিয়ামের (pericardium) বাইরের আবরণী থেকে। কিডনীর স্নায়ু দুই রকমই হয়—visceral এবং parietal। এই সব দুই রকমের স্নায়ু থাকার জন্য কিছু কিছু organ-এর ব্যথা বেদনা দুই ধরনের হতে পারে। এটি খুব ভালোভাবে বোঝা

যায় appendix-এর ক্ষেত্রে। এখানে সোজাসুজি appendix-এর কাছাকাছি পেরিটোনিয়ামের জায়গায় ব্যথা হয় এবং নির্দেশিত (referred) ব্যথা নাভি-কুণ্ডলীর কাছে হতে দেখা যায়।

সাধারণ বহির্ভাগের বা চামড়ার ব্যথার সংগে এই আভ্যন্তরীণ ব্যথার প্রভেদ অনেক। কোন আভ্যন্তরীণ অংগের স্থানীয় সামান্য ক্ষতি হলে রোগী খুব একটা বেশী ব্যথা অনুভব করে না। কিন্তু অনেকটা জায়গা জুড়ে যদি ব্যথা বেদনার স্নায়ুপ্রান্তকে উদ্দীপিত করা হয় তবে অনেক বেশী ব্যথা সৃষ্টি হয়। মানবদেহের আভ্যন্তরীণ organ-গুলির এই ব্যথা বেদনা ছাড়া আর কোন রকমের অনুভূতি নেই। এই ব্যথা বেদনার প্রকারভেদ অনেক আভ্যন্তরীণ প্রদাহ, অসুখবিসুখ এবং অন্যান্য শারীরিক প্রতিক্রিয়া সঠিক রোগ নিরূপণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

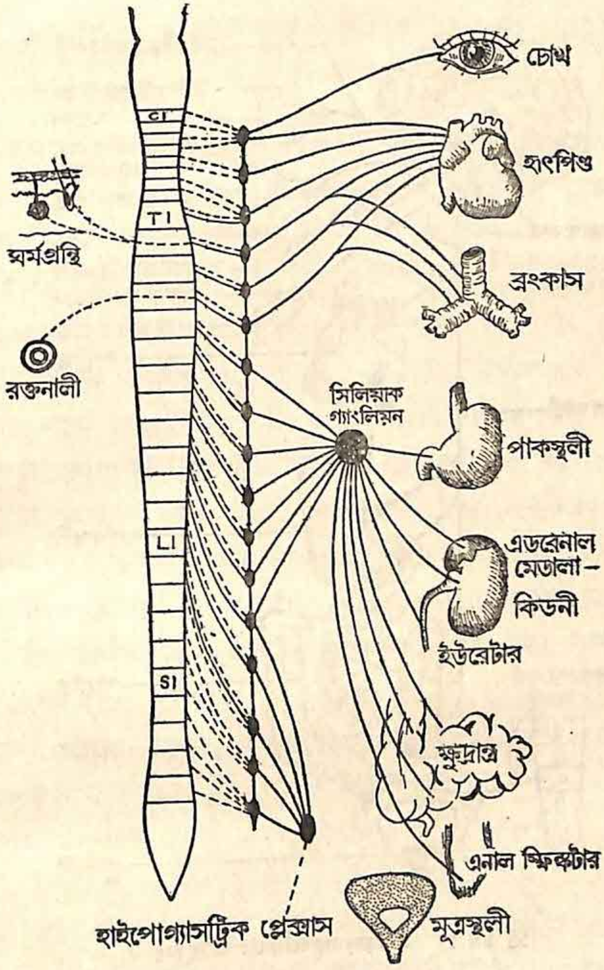
এই আভ্যন্তরীণ ব্যথা বেদনা নানা কারণে হতে পারে। তাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়া বা ischaemia : শরীরের কোন অংশে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে সে জায়গায় নানারকমের অম্লজাতীয় বিপাকীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়, নানারকমের কোষ অপজাত (tissue degeneration) পদার্থ যেমন ব্রাডিকাইনিন, প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ইত্যাদি বের হয়। এগুলি বেশীর ভাগই ব্যথা সৃষ্টিকারী।

২। কোন রাসায়নিক পদার্থ যদি দুর্ঘটনাক্রমে পেটে বা বুকের মধ্যে যায় তবে ব্যথার সৃষ্টি হয়। অপারেশনের সময় এরকম হতে পারে। পাকস্থলীতে ক্ষত হলে বা পাকস্থলীতে perforation হলে পাকস্থলীর রস বাইরে বেরিয়ে পেটে ব্যথা করতে পারে।

৩। শরীরের hollow viscus-এ অনেক সময় পেশী সংকোচন বা spasm হতে পারে এবং সেক্ষেত্রেও প্রচন্ড ব্যথা অনুভূত হয়। সাধারণতঃ পাকস্থলী, অন্ত্র, পিত্তনালী, ureter ইত্যাদিতে এই সংকোচন হতে পারে। এই সংকোচনে ব্যথা বেদনার স্নায়ুপ্রান্ত উদ্দীপিত হয়, রক্ত চলাচল ব্যাহত হয় এবং এতে বিপাকীয় হারও বেড়ে যায়।

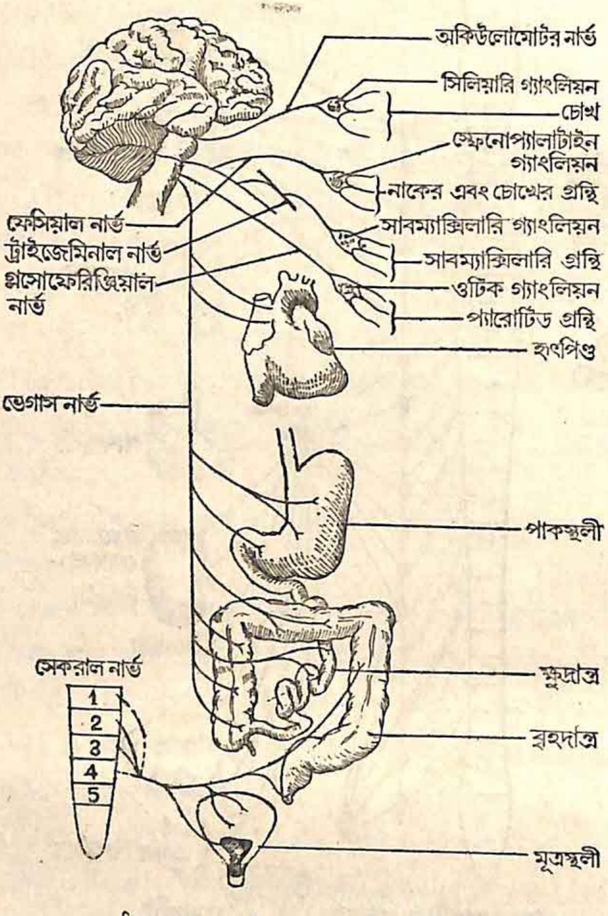
৪। শরীরের hollow viscus যেমন অন্ত্র ইত্যাদি যদি খুব বেশী প্রসারিত হয়, তবে স্নায়ুতন্ত্রের উপর চাপ পড়ে এবং ব্যথা অনুভূত হয়।



চিত্র ১৩ : Sympathetic স্নায়ুতন্ত্র

আবার এতে স্বাভাবিক রক্ত চলাচলে বিঘ্ন হতে পারে এবং ischaemia হতে পারে।

মানবদেহের সমস্ত অংগ-প্রত্যংগের মধ্যে লিভার কোষে এবং ফুসফুসের alveoli একেবারেই অনুভূতিহীন। তবে লিভারের বাইরের আবরণী (capsule) এবং পিত্তনালী খুবই ব্যথাপ্রবণ। Bronchus এবং parietal pleura-তে ব্যথা হতে পারে।



চিত্র ১৪ : Parasympathetic স্নায়ুতন্ত্র

Sympathetic এবং parasympathetic স্নায়ুতন্ত্র ১৩ এবং ১৪নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

বিশেষ কয়েকপ্রকার আভ্যন্তরীণ (visceral) ব্যথা বেদনা

হৃৎপিণ্ডজনিত ব্যথা :

করোণারী থ্রম্বোসিসে অথবা এনজাইনা পেকটোরিস (angina pectoris) অসুখে হৃৎপিণ্ডের রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। এতে রোগী বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে। এতে referred বা নির্দেশিত ব্যথাও হয়। ঠিক হৃৎপিণ্ডের জায়গায় এটি সীমাবদ্ধ থাকে না। তৃতীয় সারভাইকাল থেকে পঞ্চম থোরাসিক পর্যন্ত segment-এ এই ব্যথার ব্যাপ্তি ঘটতে পারে। রোগীর কণ্ঠ, চোয়াল পর্যন্ত, সামনের sternum, বুকের বামদিকে, উপরিভাগে, বাম হাতের ভিতরের দিকে এবং হাতের শেষ দুই আঙুলে পর্যন্ত ব্যথা হতে পারে। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের বামদিকই ক্ষতিগ্রস্থ হয় বেশী, তাই শরীরের বামদিকেই উপসর্গ বা ব্যথা বেশী হয়। কিন্তু ডানদিকে বা উভয়দিকেই ব্যথা হতে পারে। ব্যথা উদ্দীপক impulse sympathetic নার্ভ দিয়ে মধ্য সারভাইকাল গ্যাংলিয়া হয়ে stellate ganglion এবং প্রথম চার বা পাঁচ থোরাসিক গ্যাংলিয়া দিয়ে যায়। অবশেষে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম থোরাসিক স্পাইনাল নার্ভ দিয়ে সুষুম্না কাণ্ডে আসে।

অনেক সময়েই সোজাসুজিভাবে হৃৎপিণ্ডের জায়গায় বুকের sternum-এর নীচে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। এটি ঠিক কি কারণে হয় তা বোঝা কঠিন। তবে পেরিকার্ডিয়ামের বহিঃআবরণী আক্রান্ত হলে এই parietal ব্যথা হতেই পারে। আবার অনেক সময় বুকের মধ্যে 'চেপে ধরা' ব্যথা হয়। এটির কারণও দুর্বোধ্য তবে এটিও প্রতিবর্তী ক্রিয়া (reflex action) হিসাবে মাংসপেশী, শ্বাসনালী এবং রক্তনালী সংকোচনের ফলে হতে পারে। তাছাড়াও এসময় অত্যধিক লালা নিঃসরণ (salivation), বেশী প্রস্রাব ইত্যাদি হতে পারে।

হৃৎপিণ্ডজনিত প্রচণ্ড ব্যথা সাধারণভাবে ischaemic ব্যথা বটে, তবে অন্যান্য কারণে বিপাকীয় 5 hydroxy tryptamine, polypeptide ইত্যাদি ক্ষরণের ফলে এবং বিশেষতঃ P factor-এর জন্যই এত ব্যথা হয়।

লিভারের ব্যথা :

আসলে লিভারের কোন ব্যথা অনুভূতি নেই। তবে parietal পেরিটো-নিয়ামে প্রদাহ ঘটলে ব্যথা হতে পারে। হৃৎপিণ্ডের অসুখে (congestive

cardiac failure) খুব তাড়াতাড়ি রক্তনালী প্রসারণ ঘটলে অনেক সময় ব্যথা হয়, তবে ধীরে ধীরে প্রসারণ ঘটলে ব্যথা হওয়ার কথা নয়।

কিডনীর ব্যথা :

কিডনীর প্রদাহে বা পাথুরী হলে ব্যথা হতে পারে। কিডনীর বহির্ভাগে somatic স্নায়ুতন্ত্রের জন্য ব্যথা হয়। আবার নির্দেশিত ব্যথা পেটের সামনের দিকে ও নাভির নীচে হতে পারে।

Ureter-এর ব্যথা :

Ureter-এর মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে মোচড় দেওয়া তীক্ষ্ন ব্যথা হয়। একে renal colic বলে।

অগ্ন্যাশয় বা Pancreas-এর ব্যথা :

এর প্রদাহে প্রচন্ড ব্যথার সৃষ্টি হয়। অগ্ন্যাশয়ের এনজাইম অগ্ন্যাশয় এমন কি পারিপার্শ্বিক অন্য organ-এরও ক্ষতি সাধন করে। Parietal পেরিটোনিয়ামেও প্রদাহ হতে পারে। এসবের ফলে খুবই প্রচন্ড এবং জ্বালা করা ব্যথা হয়—বিশেষতঃ পিঠের দিকে।

প্লীহার ব্যথা :

যদি parietal পেরিটোনিয়াম, diaphragm বা কাছাকাছি অন্য organ আক্রান্ত হয় তবেই ব্যথা অনুভূত হয়।

Biliary এবং পিত্তস্থলীর ব্যথা :

এই ব্যথা সাধারণতঃ পেটের উপরিভাগে সীমাবদ্ধ থাকে। এটি burning ধরনের তবে অনেক সময় সংকোচনের জন্য মোচড় দেওয়া তীক্ষ্ন ব্যথা অনুভূত হয়। ডানদিকের hypochondrium-এ এই ব্যথা হয়। এর ব্যথা ডানদিকের scapula-র অগ্রভাগে নির্দেশিত হয়। এটি sympathetic নার্ভের দ্বারাই বাহিত হয় এবং সুষুম্না কান্ডের নবম থোরাসিক সেগমেন্ট দিয়ে যায়।

খাদ্যনালীর (oesophagus) ব্যথা :

এর ব্যথা নানা কারণে হতে পারে—প্রদাহের ফলে, রাসায়নিক কারণে, জীবানু সংক্রমণে, অত্যধিক প্রসারণের ফলে ইত্যাদিতে। নীচের পাকস্থলীর দিকে খাদ্য-

নালীর প্রদাহে ব্যথা হৃৎপিন্ড পর্যন্ত যেতে পারে। যদিও হৃৎপিন্ডের সংগে এই ব্যথার কোন সংযোগ নেই। উপরের দিকের খাদ্যনালীতে প্রদাহ ঘটলে pharynx, গলার নীচের দিকে, হাতে এবং বুকে ব্যথা অনুভব হতে পারে। সাধারণভাবে অত্যধিক অম্বলে রোগীর 'বুক জ্বালা' ব্যথা হতে পারে।

Appendicitis-এর ব্যথা :

এই ব্যথা খুবই বেশী ধরনের হয়। প্রথমদিকে নাভির কাছাকাছি আরম্ভ হয় —পরে পেটের ডানদিকের নীচের quadrant-এ সীমাবদ্ধ থাকে। ডানদিকের rectus মাংসপেশী শক্ত বা rigid হয়ে পড়ে এবং সেখানে চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়। ম্যাকবার্ণি পয়েন্টে চাপ দিলে খুবই ব্যথা হয়।

পাকস্থলীর ব্যথা :

পাকস্থলীর প্রদাহে বুকে এবং পেটের উপরদিকে জ্বালা ধরনের ব্যথা হতে পারে। পাকস্থলীর জারক রসের অত্যধিক অম্লতায় পাকস্থলীতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে এবং সেখান থেকে অত্যধিক ব্যথা হতে পারে।

মূত্রস্থলীর ব্যথা :

এই ব্যথা অনেক সময় কুঁচকী (groin) এবং অন্ডকোষের দিকে নির্দেশিত হতে দেখা যায়।

জরায়ুর ব্যথা :

এতে বহির্গাত্রীয় (parietal) এবং আভ্যন্তরীণ (visceral) দুই রকমের ব্যথাই হতে পারে। ঋতুস্রাবের অসুখে (dysmenorrhoea) সাধারণতঃ মোচড় দেওয়া (cramping) ব্যথা হয়। জরায়ু, fallopian tube এবং broad ligament-এ একসংগে প্রদাহ হলে বা tuboovarian mass বা টিউমার হলে ব্যথা parietal নার্ভ দিয়ে যায় এবং কোমরে এবং পিঠে ব্যথার সৃষ্টি হয়। এ ব্যথা খুবই তীক্ষ্ন, কিন্তু মোচড় দেওয়া ব্যথা নয়।

নির্দেশিত ব্যথা (Referred pain) :

শরীরের কোন একটি অংশে ব্যথা সৃষ্টি হলে দূরের অন্য কোন অংশে সেই ব্যথা অনুভূত হতে পারে—একে নির্দেশিত বা referred ব্যথা বলে। এটি

সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ visceral ব্যথার ক্ষেত্রেই হয়। এই নির্দেশিত ব্যথা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। কেননা এই নির্দেশিত ব্যথা দিয়েই অনেক অসুখবিসুখ সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হতে সাহায্য করে। এমন অনেক আভ্যন্তরীণ অসুখ আছে, যার এই নির্দেশিত ব্যথা ছাড়া আর অন্য কোন উপসর্গ হয় না।

এই নির্দেশিত ব্যথা ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয় সে সম্বন্ধে নানারকমের মতবাদ প্রচলিত আছে। তবে সব থেকে প্রচলিত মত এই রকম : আভ্যন্তরীণ ব্যথার স্নায়ু সাধারণতঃ সুষুম্না কান্ডে synapse হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের neurone-এর সংগে। এখানেই শরীরের চামড়া থেকে ব্যথাবাহী স্নায়ু এসে মেশে। যখন আভ্যন্তরীণ ব্যথা বেদনার উদ্দীপনা হয়, তখন কিছু চামড়ার ব্যথা পরিবাহী স্নায়ুও উদ্দীপিত হয় এবং সেই চামড়ায় ব্যথা অনুভূত হয়। রোগীও তখন অনুভব করে যে ব্যথা সেই চামড়ার কাছাকাছি থেকেই উদ্ভূত।

আবার অনেক সময় ব্যথার পরবর্তী ক্রিয়ায় বা reflex action-এ মাংসপেশীর সংকোচন ঘটায় এবং সেখানেই ব্যথা সৃষ্টি হয়। কিডনী বা ureter-এর প্রদাহে অনেক সময়েই পিঠের (lumbar) মাংসপেশীতে টান ধরে এবং ব্যথা হয়। এই মাংসপেশীর টান বা খিঁচুনীতে অনেক সময়ে কোমরেও ব্যথা হয়। গলা, মাথা এবং মুখের মাংসপেশী সংকোচনের ফলে কোন কোন সময় মাথাধরা বা মাথাব্যথা হতে পারে।

মানসিক ব্যথা (Psychological pain) :

শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্য, ভয়ভাবনা, মানসিক চাপ ইত্যাদিতে অনেক সময় মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অল্প ব্যথাই তখন তার কাছে বড় মনে হয় এবং নানাধরনের ব্যথা অনুভব করে। এমনও হতে পারে—হয়তো সে ব্যথার কোন অস্তিত্বই নেই। দুশ্চিন্তা ব্যথা অনুভূতিকে বাড়িয়ে তোলে। দীর্ঘস্থায়ী বিশেষতঃ ক্যানসারজনিত ব্যথা খুবই দুঃসহ, সন্দেহ নেই। তবুও রোগী যখন তার অবস্থার কথা বুঝতে পারে তখন ব্যথা আরও অসহনীয় হয়ে ওঠে। যে রোগী প্রথম থেকেই মানসিক রোগাক্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত—তাদের শারীরিক ব্যথা সাধারণের চেয়ে বেশীই হয়।

হিষ্টেরিয়া রোগাক্রান্ত রোগী প্রায়ই ব্যথা বেদনার অনুভূতি অনেক বাড়িয়ে

বলে। তাদের আবেগ, উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা, অনুভূতি—সবই অন্য ধরনের। অনেক সময় এতে রোগ নির্ণয় এবং নিরাময় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

এ কথা অবশ্যই সত্য যে প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব মানসিক সত্তা আছে। তাদের কিছু তারতম্যও হয়। কিন্তু খুব বেশী পরিবর্তন হলেই মানসিক বিকৃতি বা psychosis বলা হয়। এই মানসিক বিকৃতিতে ব্যথা বেদনার অনুভূতিরও রকমফের হয়।

যে কোন ব্যথায় বিশেষতঃ দীর্ঘস্থায়ী ব্যথায় মানসিক কারণ অবশ্যই থাকে। তবে তা নির্ভর করে রোগীর ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক অবস্থা এবং সর্বোপরি তার নিজস্ব শারীরিক অসুস্থতার উপর। অনেক রোগী সত্যিকারের ব্যথাকে তার মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক কারণে বিশেষ আমল দেয় না এবং ইচ্ছেমত ব্যথা অনুভূতিকে কমিয়ে ফেলে বা সহ্য করে। যোগাভ্যাসে এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে অনেক ব্যথাই সেরে যেতে পারে।

ব্যথা বেদনার নিয়ন্ত্রণ

ব্যথা বেদনা মানুষের নিজস্ব অনুভূতি। এই অনুভূতি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের হয়। এক লোকের কাছে যেটা খুবই ব্যথাকর, অন্য লোকের কাছে হয়তো ততটা ব্যথাকর নয়। আবার একই লোক এখন যে ব্যথা অনুভব করে, অন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থায় হয়তো ততটা ব্যথা অনুভব করে না। ব্যথার প্রতিবর্তী ক্রিয়া (reflex) হিসাবে মানসিক এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়। কিছু প্রতিবর্তী ক্রিয়া সুষুম্না কান্ডেই সংঘটিত হয়—এমন কি ব্যথা মস্তিষ্কে অনুভব করার অনেক আগেই এটি হতে পারে। ব্যথা অনুভব করার আগেই 'withdrawal' ক্রিয়া হতে দেখা যায়। ব্যথার মানসিক প্রতিক্রিয়া নানা ধরনের হতে পারে। রোগীর মনঃকষ্ট, কান্না, অবসাদ, বমি, মাংসপেশীসমূহে উদ্দীপনা এবং টান ইত্যাদি হতে পারে। তবে সব ব্যথাতেই এসব হয় না, আবার সব লোকেরই সমভাবে এই সব প্রতিক্রিয়া হয় না।

ব্যথা বেদনা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন রকমের মতবাদ আছে। এদের মধ্যে কয়েকটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মস্তিষ্ক এবং সুষুম্না কান্ডে ব্যথা নিয়ন্ত্রণ :

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মস্তিষ্কে এবং সুষুম্না কান্ডের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জায়গায় বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা জাগালে ব্যথা বেদনা কমে যায়, এমন কি ব্যথার পুরোপুরি উপশম হয়। মস্তিষ্কের তৃতীয় ventricle-এর কাছাকাছি জায়গায়, brain stem-এ periaqueductal gray area এবং midline raphe nuclei-তে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা ব্যথা বেদনা নাশ করে। সুষুম্না কান্ডের dorsal horn-এ substantia gelatinosa-তে যেখানে ব্যথা প্রথম গৃহীত হয়, সেখানেই বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা কাজ করে এবং ব্যথা বেদনার গতিপথকে রুদ্ধ করে। Aδ এবং C উভয় ব্যথা অনুভূতিবাহী নার্ভের উপরই এটি কাজ করে, কিন্তু অন্য অনুভূতির ক্ষেত্রে কিছু প্রতিক্রিয়া হয় না। তবে reticular formation এবং থ্যালামাসের intralaminar nucleus-কে অবদমিত করে এবং মস্তিষ্কে অনুভূতি প্রেরণ কমায় বা বন্ধ করে।

Descending Pathway :

মানবদেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বিশেষতঃ cerebral cortex এবং থ্যালামাস থেকে ব্যথা অনুভূতি আসার সময়, সুষুম্না কান্ডে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন করতে পারে। Substantia gelatinosa এই ব্যথা অনুভূতিকে অবদমন অথবা বর্জন করতে পারে।

মস্তিষ্কের Opiate System :

মস্তিষ্কের কয়েকটি জায়গায় বিশেষতঃ তৃতীয় ventricle-এর periventricular area-তে এবং brain stem-এর periaqueductal gray area-তে মরফিন বা মরফিনতুল্য জিনিষের জন্য specific neuronal membrane receptor substance থাকে। তাছাড়াও মরফিনের তুল্য জিনিষ মস্তিষ্কের এই সব ব্যথানাশকতন্ত্রে সাধারণভাবেই নিহিত থাকে। এই মরফিনতুল্য জিনিষগুলিই হলো enkephalins এবং endorphins এবং এদের মস্তিষ্ক থেকেই বিশ্লেষণ করা গেছে। মস্তিষ্কের যে সব জায়গা ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করে, সেসব জায়গাতেই এদের পাওয়া যায়। Enkephalin পাওয়া যায় periventricular জায়গায়, periaqueductal gray area-তে, brain stem-এর midline raphe

nuclei-তে, সুষুম্না কান্ডের dorsal horn-এর substantia gelatinosa-তে এবং থ্যালামাসের intralaminar nuclei-তে। আর endorphin খুব বেশী পাওয়া যায় hypothalamus, thalamus এবং pituitary গ্রন্হিতে। কিন্তু সুষুম্না কান্ডে কখনই endorphin পাওয়া যায় না।

বর্তমানে এটুকু বোঝা গেছে যে এন্ডার্ফিন এবং এনকেফালিন মস্তিষ্ক থেকেই নিঃসৃত হয় এবং neurotransmitter হিসাবে কাজ করে। মস্তিষ্কের ব্যথানাশক জায়গায় কাজ করে ব্যথা উপশম ঘটায়।

এনকেফালিন খুবই তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকলে এর ইঞ্জেকশন দিলে খুব ভালো ফল পাওয়া যায় না। এন্ডার্ফিন সে দিক থেকে খুবই উপযোগী এবং এটি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না। ব্যথা উপশমের এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এন্ডার্ফিন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ব্যথা সৃষ্টিকারী পদার্থসমূহ (Pain-producing substances):

Pain producing substance সাধারণতঃ একটি polypeptide এবং এর কার্যকারিতা ব্রাডিকাইনিনের মত। ব্রাডিকাইনিন শরীরের ত্বকে লাগালে ফোস্কা পড়ে এবং সেখানে ব্যথা হয়। শরীরের চামড়ায় অনেক ধরনের proteolytic enzyme থাকে এবং সেই চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত হলে তবেই সেগুলি কার্যকরী হয়। রক্ত ভেঙে গেলে পটাশিয়াম বের হয়, সুতরাং কোন ফোস্কায় haemolysate লাগালে প্রচন্ড ব্যথার সৃষ্টি হয়। 5-hydroxytryptamine অনেক সময় ব্যথার উদ্রেক করে। এটি ব্রাডিকাইনিন এবং পটাশিয়ামের ব্যথা উদ্রেককারী (algogenic) কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে দেয়। এসিটিল কোলিন খুব বেশী dilution-এ চামড়ায় দিলেও বেশ ব্যথা অনুভূত হয়।

প্রদাহের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কোষে প্রষ্টাগ্ল্যান্ডিন E_2 (Prostaglandin E_2) তৈরী হয়। এটি প্রত্যক্ষভাবে ব্যথার স্নায়ুতন্তুকে উদ্দীপিত করে না। কিন্তু এটি ব্রাডিকাইনিন এবং 5-hydroxytryptamine-এর ব্যথা উদ্রেককারী ক্ষমতাকে খুব বেশী প্রভাবিত করে।

ব্যথা অনেক সময় ওষুধ দিয়ে কমানো হয় বিশেষতঃ এসিটিল স্যালিসেলিক এসিড এবং ইন্ডোমেথাসিন প্রয়োগে। এই দুই ওষুধই প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরী হতে

দেয় না। কেননা এরা প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন synthetase নামক এনজাইমকে কার্যকরী হতে দেয় না। সুতরাং ঐ জাতীয় ওষুধ অপ্রত্যক্ষভাবে ব্যথা বেদনা নিরাময় করে, কেননা এতে পেশীর প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন লেভেল অত্যন্ত কমে যায় এবং তার প্রদাহজনিত ব্যথা উদ্রেককারী জিনিষগুলির কার্যকারিতা অনেক কমে যায়।

Substance P :

এই substance P একটি neurotransmitter জাতীয় জিনিষ। Dorsal horn nucleus যখন কোন বাইরের প্রভাবে সক্রিয় হয়, তখনই substance P নিঃসৃত হয়। এই substance P ব্যথা সৃষ্টির সহায়ক হয়। মরফিন বা এনকেফালিন এই substance P নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে। তার ফলে ব্যথা উপশম ঘটে। কিন্তু আগে থেকে রোগীকে naloxone দেওয়া থাকলে ব্যথা উপশম হয় না।

Enkephalin এবং Substance P :

সুষুম্না কাণ্ডে dorsal horn nuclei যখন উদ্দীপিত হয় তখন substance P নিঃসরণ হয় এবং ব্যথা অনুভূতি বাড়তে থাকে। কিন্তু সে সময় substantia gelatinosa থেকে এনকেফালিনও তৈরী হয় এবং substance P-এর কার্যকলাপকে ব্যাহত করে। Dorsal column-এর বড় low threshold myelinated primary afferent নার্ভগুলিকে উদ্দীপিত করলেও অনেক সময় interneurone-এর জায়গা থেকে এনকেফালিন নির্গত হয় এবং ব্যথা উপশম ঘটায়। ঠিক এই কারণেই transcutaneous electrical stimulation এবং dorsal column stimulation করে ব্যথা উপশম করা হয়।

Gate control মতবাদ :

Melzack এবং Wall-এর এই মতবাদে বলা হয় যে বড় এবং ছোট উভয় স্নায়ুতন্তুই target cell বা প্রথম কেন্দ্রীয় transmission কোষের উপর কাজ করে। এটি আবার substantia gelatinosa-র কোষের উপরও কাজ করে। এই substantia gelatinosa-র কোষ target cell-কে অবদমিত করে রাখে এবং এই কোষগুলিই ব্যথা বেদনার অনুভূতি কতটা যাবে এবং আদৌ যাবে কি না তা নিরূপন করে। এখানেই ব্যথা অনুভূতি যাবার gate বা দরজা। বড় নার্ভ

এই substantia gelatinosa-র কোষগুলিকে উদ্দীপিত করে এবং ছোট স্নায়ুতন্তুগুলি এগুলিকে অবদমিত করে। যখন ছোট স্নায়ুতন্তু দিয়ে সুষুম্না কাণ্ডে অনবরত impulse আসতে থাকে, তখন এই gate বা দরজা খোলাই থাকে। তার ফলে বড় নার্ভ দিয়ে impulse আসাযাওয়া করতে পারে। কিন্তু যখন বড় নার্ভ দিয়ে impulse এসে target cell-কে উদ্দীপিত করে তখন negative feedback mechanism-এ ব্যথা অনুভূতি যাওয়ার দরজা অন্ততঃ খানিকটা বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ব্যথার অনুভূতিও অনেকটা সীমিত হয়ে পড়ে। এইভাবে দুই ধরনের স্নায়ুতন্তু সুষুম্না কান্ডে ব্যথা বেদনার synaptic transmission কোন সময় বাড়ায়, কোন সময় কমায়।

সুতরাং ব্যথা বেদনার অনুভূতির সবসময়েই একটি ভারসাম্য বজায় থাকে এবং একে অপরকে অবদমিত করে রাখে। যতক্ষণ বেশী tactile উদ্দীপনা থাকে, ব্যথা অনুভূতির gate বা দরজা বন্ধই থাকে। আবার tactile উদ্দীপনা না থাকলে ব্যথা বেদনা ভালোভাবেই যেতে পারে।

এই মতবাদে আরও বলা হয় যে এই gate বা দরজা সুষুম্না কাণ্ডের সব লেভেলেই থাকে—শুধুমাত্র presynaptic দিকেই নয়। এই দরজা post synaptic লেভেলে এমনকি মস্তিষ্কতেও থাকতে পারে। এই gate-এর নিয়ন্ত্রণ শুধু যে প্রান্তদেশ বা periphery থেকেই আসে তা নয়, মস্তিষ্কের অন্য কেন্দ্র এবং cortical ও subcortical supraspinal neurone-ও তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কিন্তু এই মতবাদ এখন আর অনেকে ঠিকমত মেনে নেন না এবং এর বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। তবে এটি ঠিক যে সুষুম্না কাণ্ডের dorsal horn-এ এমন একটি system আছে—যেখানে ব্যথা বেদনার অনুভূতি ঠিকমত একত্র হয় এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই মতবাদের ফলে ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে দুইটি বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। এদের একটি transcutaneous stimulation এবং অপরটি dorsal column stimulation। এই দুই পদ্ধতিই খুব ভালো-ভাবে ব্যথা বেদনার উপশম ঘটায়।

ব্যথা বেদনার মাপ নির্ণয় (Assessment of pain) :

ব্যথা বেদনার অনুভূতি রোগীর নিজস্ব ব্যাপার। সেই অনুভূতি একেক জনের একেক রকমের হয়—অন্যের পক্ষে সেটি বোঝা সম্ভব নয়। সুতরাং

কতটা ব্যথা হচ্ছে তা নির্ণয় করা কঠিন। চিকিৎসকের পক্ষেও এই ব্যথা মাপা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। অনেক সময় ব্যথা আনুষংগিক উপসর্গ যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরনধারণ (vital capacity এবং peak flow rate) নির্ণয় করে ব্যথা সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। কিন্তু এতে সঠিক ব্যথা বোঝা যায় না।

রোগীকে ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে হবে যে ব্যথার পরিমাণ তাকেই ঠিক করতে হবে, ব্যথা কম কী বেশী তা তাকেই নিরূপণ করতে হবে। নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে সঠিক বলতে হবে—

১। ব্যথা আছে কি নেই

২। অল্প ব্যথা

৩। মাঝামাঝি ব্যথা, অথবা

৪। ভীষণরকমের ব্যথা

যদিও এতে রোগীকেই ব্যথার মাপ নির্ণয় করতে দেওয়া হয়, তবুও এ দিয়ে ব্যথার কিছুটা বিচার বিবেচনা করা যায়।

আর এক পদ্ধতিতে ব্যথার পরিমাপ করা যায়। রোগীকে ১০ সেণ্টিমিটার দীর্ঘ একটি লাইন দেখিয়ে বলা হয় যে এর একদিকে 'কোন ব্যথা নেই' এবং তারপর ব্যথা বাড়তে বাড়তে অন্যদিকে 'ভীষণ ব্যথা'। এখন রোগীকে সেই লাইন দেখিয়া ঠিকমত বলতে হবে কতটা ব্যথা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে বার বার পরীক্ষা করলে রোগীর ব্যথা সম্বন্ধে একটি আন্দাজ পাওয়া সম্ভব। এটি তুলনা করলে বোঝা যায় রোগীর ব্যথা কমছে অথবা বাড়ছে। ওষুধে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে কিনা তাও বোঝা যায়।

অনেক সময় বিভিন্ন ঘনত্বে পটাশিয়াম সলিউশন চামড়ায় লাগানো হয় এবং দেখা হয় কোন ঘনত্বে ত্বকে ফোস্কা পড়েছে। এতে ব্যথার পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। এ ছাড়া শরীরের চামড়া বিভিন্ন ধরনের আলো ফেলে অথবা দাঁতের গোড়ায় বিভিন্ন মানের বৈদ্যুতিক প্রবাহে উদ্দীপিত করেও ব্যথা নির্ণয় করা যায়।

ব্যথার অন্যান্য উপসর্গ দিয়েও ব্যথার পরিমাপ বোঝা যেতে পারে। বমি বমি ভাব, বমি, রক্তচাপ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের পরিবর্তন, মুখের হাবভাব ইত্যাদি দিয়েও ব্যথা সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়।

তাপ বিকিরণ (thermal radiation) দিয়েও ব্যথা বেদনার পরিমাপ করা যায়। শরীরের চামড়ায় সাধারণভাবে ৪৩° থেকে ৪৭° সেণ্টিগ্রেড তাপ প্রয়োগ করলে মানুষ ব্যথা অনুভব করে। সেই ব্যথা সহ্য করতে বা adapt করতে মানুষের অসুবিধা হয়। অবশ্য ৩৭° সেন্টিগ্রেড তাপের জল যদি চামড়ায় হঠাৎ প্রয়োগ করা হয় তবেও মানুষ ব্যথা মনে করতে পারে, পরে অল্প সময়েই সেই ব্যথা চলে যায়।

প্রেসার Algometer দিয়েও ব্যথা বেদনার পরিমাপ করা যেতে পারে। এই Algometer-এ একটি ০·৫ সেণ্টিমিটার ব্যাসের ধাতুনির্মিত সিলিণ্ডার থাকে। তার মধ্যে স্প্রিং দেওয়া থাকে। শরীরের চামড়ায় লম্বভাবে লাগানো হয় এবং তারপর শরীরের চামড়ায় ধীরে ধীরে চাপ বা প্রেসার বাড়ানো চলতে থাকে, যতক্ষণ না রোগী ব্যথা অনুভব করে। সাধারণতঃ মানুষ এই algometer-এ ২ কিলোগ্রাম প্রেসার দিলে ব্যথা অনুভব করে।

Hyperalgesia :

কিছু কিছু অসুখে শরীরের বিশিষ্ট অংশে ব্যথা অনুভূতির তারতম্য ঘটতে পারে। সাধারণতঃ ব্যথা অনুভূতির এই বৃদ্ধি দুই ধরনের হতে পারে—তার একটি primary hyperalgesia এবং অপরটি secondary hyperalgesia। যে জায়গায় প্রদাহ বা ক্ষত হয় তার আশেপাশে অল্প উদ্দীপনাতেই রোগী স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী ব্যথা অনুভূতি পায়—একেই primary বা মুখ্য hyperalgesia বলে। আক্রান্ত জায়গায় যেখানে কোষসমূহে ক্ষতি হয়েছে সেখানে শিরা-উপশিরা খুবই প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং সেই ক্ষতিগ্রস্ত কোষসমূহ থেকে কিছু জিনিষ নিঃসৃত হয়ে স্বাভাবিক ব্যথার সৃষ্টি করে। কিন্তু তার আশেপাশের জায়গায় যেখানে কোষসমূহ মোটামুটি ঠিক থাকে সেখানে প্রান্তিক নার্ভসমূহ থেকে নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যেমন proteolytic enzymes ইত্যাদি নিঃসৃত হতে থাকে। এই সব proteolytic এনজাইম নানা ধরনের kinin নিঃস্বরণে সাহায্য করে। এই kinin যদিও নিজেরা ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু ব্যথা পরিবাহী স্নায়ুতন্তুতে pain threshold অনেক কমিয়ে দিতে পারে।

Secondary (গৌণ) hyperalgesia অন্য এক ধরনের ব্যথা অনুভূতি।

শরীরের যে স্থানে প্রদাহ বা ক্ষত হয় সেখানে বাস্তবিকপক্ষে pain threshold খুবই বেশী থাকে এবং রোগী একটি দীর্ঘস্থায়ী অস্বস্তিকর এবং প্রচন্ড ধরনের ব্যথা পায়। এই ব্যথা আক্রান্ত জায়গার অনেক দূরে শরীরের অন্য জায়গাতেও হতে দেখা যায়। সেই ব্যথা কিন্তু primary বা মুখ্য hyperalgesia-র মত বেশী স্থায়ী হয় না। এর কারণ সম্বন্ধে বলা হয় যে আক্রান্ত জায়গা থেকে উদ্দীপনা অন্য গতিপথে গিয়ে এই অনুভূতির সৃষ্টি করে। এই central facilitation অথবা ব্যথা অনুভূতির অন্য গতিপথ যে কোন লেভেলে—স্পাইনাল লেভেলে, থ্যালামাসে অথবা মস্তিষ্কের cortex লেভেলে হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রদাহজনিত বিভিন্ন ব্যথা

প্রদাহজনিত ব্যথা :

শরীরের যে কোন স্থানে প্রদাহ বা inflammation হলে সে স্থানে ব্যথা অনুভূত হয়। এই ব্যথার সংগে অবশ্য আরও উপসর্গ থাকে যেমন সে স্থান গরম হয়ে ওঠা, লাল হয়ে ওঠা এবং ফুলে ওঠা। এই প্রদাহ যে কোন কোষে বা পেশীতে হতে পারে। প্রদাহ অনেক কারণেই হতে দেখা যায় :

১। সাধারণ আঘাতে, কেটে গেলে অথবা পেশীতে অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হলে প্রদাহ হতে দেখা যায়।

২। এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ আছে যেগুলি শরীরে প্রদাহের সৃষ্টি করে। নানা ধরনের অম্লজাতীয় বা ক্ষারজাতীয় পদার্থ, ফেনল এই ধরনের প্রদাহ করে। শরীরের বিভিন্ন পদার্থ যেমন পিত্তরস বা প্রস্রাব অন্য কোন পেশী বা কোষের সংস্পর্শে এলে প্রদাহ সৃষ্টি করে।

৩। অত্যধিক তাপ, ultraviolet আলো এবং সব রকমের ionising radiation প্রদাহের সৃষ্টি করে।

৪। নানা ধরনের জীবানু, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, এমনকি কৃমির সাহায্যেও শরীরে বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ হয়।

৫। অত্যধিক তাপে, পুড়ে গিয়ে শরীরের প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং প্রচন্ড ব্যথার সৃষ্টি করে।

৬। অত্যধিক ঠান্ডায় শরীরের ক্ষত সৃষ্টি করে এবং প্রদাহ (frost bite) হয়।

৭। বৈদ্যুতিক শকে শরীরে প্রদাহ হতে পারে।

৮। শল্যচিকিৎসাজনিত কাটা ছেঁড়াতেও প্রদাহের সৃষ্টি হয়।

এই সব প্রদাহে ব্যথা সৃষ্টি নানা কারণেই হতে পারে। অত্যধিক ফুলে উঠে সেই স্থানের পেশীতে অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করেও ব্যথা সৃষ্টি হয়। সেই স্থানের প্রান্তিক নার্ভগুলিও এর ফলে বিশেষভাবে উদ্দীপিত হয়। আবার

সেখানকার নিঃসরিত রস বা exudate-এর অম্লতা, অত্যধিক পটাশিয়াম এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ যেমন 5-hydroxytryptamine এবং bradykinin ব্যথা সৃষ্টির সহায়ক হয়।

এই সব প্রদাহে ব্যথা, ফোলা, লাল হওয়া এবং গরম হওয়া ছাড়াও আরও উপসর্গ হতে পারে। সেই স্থান মোটামুটি অকেজো হয়ে পড়ে। শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। মাথাব্যথা হয়, ক্ষুধা কমে যায় এবং শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে।

প্রদাহ নানাভাবে ভাগ করা যেতে পারে :

১। Serous প্রদাহ—যখন প্রদাহজনিত নিঃসরিত রস প্রধানত serous অর্থাৎ রক্তের serum-এর মত। Pleural effusion সাধারণতঃ এই ধরনের প্রদাহ।

২। Fibrinous প্রদাহ—যখন প্রদাহজনিত রস প্রধানতঃ fibrin দিয়ে তৈরী থাকে। ডিফ্‌থেরিয়া, শুষ্ক (dry) প্লুরিসি এবং নিউমোনিয়া মোটামুটি এই ধরনের প্রদাহ।

৩। Purulent প্রদাহ—যখন প্রদাহের ফলে সেখানে পুঁজ জমে যায়। যে কোন ফোঁড়াতেই এই ধরনের প্রদাহ হতে পারে।

৪। Catarrhal প্রদাহ—এটি সাধারণতঃ mucous membrane এবং অল্পস্বল্প প্রদাহ। এখানকার স্থানীয় mucous কোষ থেকে অত্যধিক mucus বের হয় এবং তার সংগে কিছু শ্বেত কণিকা এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া epithelial cell থাকে।

৫। Membranous প্রদাহ—এই ধরনের প্রদাহে একটি পর্দার মত পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই পর্দা সাধারণতঃ নষ্ট হয়ে যাওয়া কোষসমূহ, নিঃসরিত রস, fibrin ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হয়। ডিফ্‌থেরিয়া রোগে এই ধরনের প্রদাহ হতে পারে।

ফোঁড়া (Abscess) :

যে কোন ধরনের ফোঁড়ায় অত্যধিক ব্যথা অনুভূত হয়। সাধারণভাবে শরীরের একটি বিশেষ স্থানে পুঁজ জমে ফোঁড়ার সৃষ্টি হয়। এই পুঁজে নষ্ট হয়ে যাওয়া disintegrated কোষসমূহ এবং অত্যধিক রক্তের শ্বেতকণিকা বিশেষতঃ neutrophil থাকে। এই ফোঁড়ায় তরল পুঁজ থাকার জন্য fluctuate করে এবং শেষদিকে ফেটে যাওয়ার জন্য একটি বিশেষ দিকে point করতে পারে।

ফোঁড়ার উপসর্গ নানা ধরনের হয়, স্থানীয় জায়গা অত্যধিক লাল হয়, ফুলে থাকে, গরম হয়ে থাকে এবং অসহ্য দপদপ করা ব্যথাও হতে পারে। এর সংগে জ্বরও হতে পারে। শরীরের সে স্থানের কার্যক্ষমতা থাকে না। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে এবং অস্বস্তিতে কষ্ট হয়।

শরীরের যে কোন জায়গায় ফোঁড়া হতে পারে। ফোঁড়া যদি খুব বড় হয় তবে অনেক পারিপার্শ্বিক অংগপ্রত্যংগে চাপ সৃষ্টি করে এবং অন্যান্য উপসর্গ আনতে পারে। গলার বড় ফোঁড়ায় নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হতে পারে যদি কণ্ঠনালীতে চাপ সৃষ্টি করে। আবার খাদ্যনালীতে চাপ সৃষ্টি করলে খাবার খেতে অসুবিধা হতে পারে।

খুব বেশী জীবানু সংক্রমণ ঘটলে অনেক সময় pyemia এবং septicaemia ঘটতে পারে। তাতে অত্যধিক জ্বর হতে দেখা যায়, রোগীর নাড়ীর গতি দ্রুত হতে থাকে, রক্তচাপ কমে যেতে পারে, রোগীর shock হতে পারে এবং এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

শরীরের খুব গভীরে যদি ফোঁড়ার সৃষ্টি হয় তবে অনেক সময় সব উপসর্গ ঠিক বোঝা যায় না। দীর্ঘস্থায়ী ফোঁড়া হলে রোগী দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, ওজন কমে যেতে থাকে।

ফোঁড়ার প্রথমদিকে গরম compress করলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। ব্যথানিবারক ওষুধ এবং সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসকের পরামর্শমত অপারেশন করে পুঁজ বের করে দিতে হবে।

ফুসকুড়ি (Boils) :

এটিও এক ধরনের ফোঁড়া। সাধারণভাবে ছোট গোলাকার চামড়ার উপরিভাগে, লোমের গোড়ায়, অথবা ঘাম নিঃসরণকারী (sebaceous) গ্রন্থির প্রদাহ থেকেই এই boil বা furuncle হয়। নানা ধরনের জীবানুর মধ্যে staphylococcus aureus বিশেষভাবে এই প্রদাহের কারণ। পেছনের buttock বা পাছায়, কোমরে অথবা গলায় এই ধরনের প্রদাহ বেশী দেখা যায়।

এই ধরনের ফোঁড়ার ঠিক মাঝখানটিতে বিশেষ পুঁজ থাকে না—একটু শক্ত মত থাকে আবার তার আশেপাশের জায়গাটিও মোটামুটি শক্ত indurated থাকে। এতে খুবই ব্যথা থাকে, অনেক সময় চাপ দিলেও ব্যথা (tender) অনুভূত

হয়। লাল এবং শক্ত হয়ে ওঠে। ঠিক মাঝখানে লোমের গোড়ায় পুঁজ জমা দেখা যেতে পারে। সাধারণতঃ ৩৬ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মাঝখানে নরম হতে থাকে এবং পরে সেখান থেকে পুঁজ বের হতে থাকে। পরে slough বেরিয়ে যায় এবং সেখানটি সেরে ওঠে।

এই অসুখের সংগে অন্য কোন অসুখের যোগ আছে কিনা দেখা দরকার। ডায়াবিটিশ, কিডনীর অসুখ, লিউকেমিয়া অথবা পুষ্টির কোন অভাব আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং প্রয়োজনমত তারও চিকিৎসা করা দরকার।

এই অসুখে রোগীকে স্বাস্থ্যবিধি ভালো করে বোঝাতে হবে। শরীরের চামড়া ভালোভাবে পরিষ্কার করা শেখানো দরকার। ফুসকুড়ির জায়গায় শুষ্ক তাপের compress করলে উপকার পাওয়া যায়। ঠিকমত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। পুঁজ বের হলে ঠিকমত dressing করা দরকার। প্রয়োজনে শল্য-চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

নাকে অথবা উপরের ঠোঁটে যদি এই ধরনের ফুসকুড়ি হয় তবে যথেষ্ট আশংকার কারণ থাকে। কেননা এখান থেকে শিরারক্তে বাহিত হয়ে জীবানু সংক্রমণ মস্তিষ্কে যেতে পারে এবং এতে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। এসব ক্ষেত্রে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ আরম্ভ করে দিতে হবে।

ব্যথা বেদনার জন্য ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। অল্প গরম সেঁক এসব ক্ষেত্রে খুবই আরামদায়ক হয়।

কার্বাংকল (Carbuncle) :

এতে চামড়ার অনেকটা জায়গা জুড়ে অনেকগুলি লোমের গোড়ায় (follicular) প্রদাহের সৃষ্টি হয়। একটিমাত্র nodule-এর বদলে অনেকটা জায়গা জুড়ে লাল হয়ে ওঠে, শক্ত indurated হয় এবং প্রচন্ড ব্যথার সৃষ্টি করে। এই সংক্রমণের জায়গা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, ফুলে ওঠে। এক বা দু-সপ্তাহের মধ্যে জায়গাটি নরম হতে থাকে এবং পুঁজ দেখা যায়। অনেকগুলি জায়গায় পুঁজ বের হবার মুখ ওঠে।

এতে রোগীর জ্বর হতে পারে, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে। অত্যধিক ব্যথা-বেদনা হতে থাকে। এসব ক্ষেত্রে রোগীর ডায়াবিটিশ বা কিডনীর কোন অসুখ আছে কিনা দেখা একান্ত দরকার।

এসব ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া দরকার। ঠিকমত গরম সেঁক দেওয়া দরকার। প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসার দরকার হতে পারে।

এরিসিপেলাস (Erysipelas) :

এটি চামড়ার একটি বিশেষ ধরনের প্রদাহ সাধারণতঃ streptococcus pyogenes দিয়েই সংক্রমিত হয়। এতে রোগীর প্রচন্ড জ্বর হয়, toxic হয়ে পড়ে।

রোগীর কাঁপ দিয়ে জ্বর আসে, ১০২°-১০৩° ফাঃ পর্যন্ত জ্বর হতে পারে। রোগীর পুরো শরীরে ব্যথা হয়, মাথাব্যথাও হয়। মাথাব্যথা এত প্রচন্ড ধরনের হতে পারে যে অনেক সময় মস্তিষ্কের অসুখ বলে ভ্রম হতে পারে। রোগী ভুল বকতে পারে। আক্রান্ত চামড়া লাল হয়ে ওঠে, ফুলে ওঠে, খুব যন্ত্রণা অনুভূতি হয়। চামড়ায় অল্পস্বল্প ফোস্কা দেখা দিতে পারে। আস্তে আস্তে অনেকটা জায়গা জুড়ে অসুখ সংক্রমিত হতে থাকে এবং আক্রান্ত জায়গা প্রদাহের ফলে ফুলে ওঠে। মুখে হলে গোটা মুখ এবং চোখ দুটিও ফুলে ওঠে।

এই অসুখ হাতে বা পায়েও হতে পারে। Lymphangitis হওয়ার জন্য লাল লাল ডোরা দাগ দেখা দিতে পারে। রোগী খুবই কাহিল হয়ে পড়ে। রোগী যদি বৃদ্ধ বয়সের হয়, মদ্যপানে আসক্ত হয় অথবা অন্য কোন অসুখ থাকলে রোগীর অবস্থা বড়ই সংগীন হয়ে পড়ে।

এই অসুখের চিকিৎসায় রোগীকে একটি ভালো ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস যুক্ত পরিবেশে সুশ্রুষা করা দরকার। Icthammol মলম লাগালে অনেক সময় উপকার হয়। মুখে হলে চোখের যাতে ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। মাঝে মাঝে ব্যথানিবারক ওষুধ দিতে হবে। এই অসুখে septicaemia, orbital cullulitis ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সুতরাং প্রথম থেকেই অধিক যত্ন নেওয়া উচিত।

আঙুলহাড়া (Paronychial whitlow) :

এতে নখের গোড়ায় প্রদাহ হয়। যে কোন রকমে নখের গোড়ায় জীবানু সংক্রমণ ঘটলে নখের পাশে লাল হয়ে ওঠে, অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয় এবং কিছুটা ফুলে ওঠে। যখন পুঁজ জমে তখন হলদে রঙের দাগ দেখা যায়।

এই অসুখে গোড়ার দিকে পেনিসিলিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া দরকার। দরকার হলে শল্যচিকিৎসায় নখের গোড়া কেটে পুঁজ বের করে দিতে

হবে। জীবানুমুক্ত ভালো dressing করাও দরকার। দীর্ঘস্থায়ী আঙুলহাড়ায় শল্যচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। এই অসুখেও রোগীর আক্রান্ত নখে ভীষণ যন্ত্রণা হয়, সেক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ব্যথানিবারক ওষুধ খাওয়া দরকার। যদি ব্যথা প্রচন্ড রকমের হয় এবং রাত্রে ঘুমেরও ব্যাঘাত করে তবে শল্যচিকিৎসায় পুঁজ বের করে দেওয়াই উচিত।

হারপিস সিমপ্লেক্স (Herpes simplex) :

এই অসুখ ভাইরাস দিয়ে সংক্রমিত হয়। রোগের প্রথমদিকে একটু সর্দি-কাশি, অল্প জ্বর, হজমের গন্ডগোল ইত্যাদি হতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাবের সময়ও হতে পারে।

সাধারণতঃ লাল লাল ফোস্কা শরীরের একদিকে বা দুইদিকেই হতে দেখা যায়। তবে বিশেষ কোন ব্যথা থাকে না। এই ফোস্কাগুলির কিছু কিছু ফেটে যেতেও পারে। ঠোঁটে, মুখে, গালে, কানে, নাকে এবং পাছাতেও এ ধরনের অসুখ হতে দেখা যায়।

মোটামুটি ১০ থেকে ১৪ দিনের মাথায় এই অসুখ এমনিতেই সেরে যায়। বিশেষ কোন ওষুধ লাগে না তবে অন্য কোন বীজানু দিয়ে সংক্রমণ যাতে না হয় তার দিকে যথেষ্ট নজর রাখা দরকার।

হারপিস জস্টার (Herpes zoster) :

এটিও ভাইরাস সংক্রান্ত অসুখ। Varicella ধরনের ভাইরাস posterior nerve root-এ সংক্রমিত হয়ে থাকে এবং তার সংগে সেই নার্ভসংশ্লিষ্ট চামড়াও সংক্রমিত হয়। সাধারণতঃ অন্য কোন সংক্রমণ, neurosyphilis, Hodgkins disease বা অন্য কোন ওষুধ প্রয়োগের পর এই হারপিস জোষ্টার দেখা যায়। তবে বেশীর ভাগ সময় অন্য কোন কার্যকারণ বোঝা যায় না।

সাধারণতঃ একদিকে চামড়ায় লাল লাল ফোস্কা দেখা যায়, এর সংগে অন্য lymph nodeগুলিও ফুলে ওঠে। রোগী অত্যন্ত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। রোগীর ফোস্কা হওয়ার আগে থেকেই ব্যথা অনুভূত হতে থাকে। এই ব্যথা সব থেকে বেশী বোঝা যায় যখন ফোস্কাগুলি মিলিয়ে যেতে থাকে। আবার মিলিয়ে যাবার পর দু'এক মাসও ব্যথা থেকে যেতে পারে।

ফোস্কাগুলি আস্তে আস্তে কালো হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে এবং পরে খোলসের মত পড়ে যায়। Scab পড়ে যাওয়ার পর চামড়ায় কিছুদিন দাগ থেকে যায়।

কয়েক ধরনের বিশিষ্ট হারপিস জষ্টার খুবই কষ্টদায়ক। Trigeminal নার্ভের প্রথম ডিভিশন অর্থাৎ ophthalmic নার্ভ যদি আক্রান্ত হয়, তবে অনেক সময় চোখের কষ্ট হয় এবং এতে cornea-তে সাদা দাগ পড়ে যেতে পারে। এতে চোখের দৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ট্রাইজেমিনাল নার্ভের দ্বিতীয় ডিভিশন আক্রান্ত হলে সংশ্লিষ্ট চামড়া ছাড়াও রোগীর palate-এও সংক্রমণ ঘটতে পারে। আবার তৃতীয় ডিভিশন আক্রান্ত হলে মুখের মধ্যে, জিভের সামনের দুই-তৃতীয়াংশে এবং চিবুকে ফোস্কা দেখা দিতে পারে। Facial নার্ভের geniculate ganglion আক্রান্ত হলে কানের পিছনে, মুখের মধ্যে এবং জিভের পিছনের এক-তৃতীয়াংশে ব্যথা এবং ফোস্কা দেখা দেয়। এতে অনেক সময় facial palsyও দেখা দিতে পারে। Glossopharyngeal নার্ভের petrous ganglion আক্রান্ত হলে রোগীর pharynx সংক্রমিত হয়।

এই অসুখের আলাদা কোন বিশেষ চিকিৎসা নেই। রোগীকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে। ভালো আলো বাতাসযুক্ত ঘরে সুশ্রুষা করতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ দেওয়া দরকার। অন্য কোন ধরনের বীজানু সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পেতে প্রয়োজনমত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। চোখ আক্রান্ত হলে চোখে হোমাট্রোপিন দেওয়া হয় এবং বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়।

পোকার কামড় (Insect bites and stings) :

নানা রকমের পোকার কামড় যথেষ্ট ব্যথা বেদনার সৃষ্টি করে। মৌমাছি, ভীমরুল, বোলতা এবং পিঁপড়ের কামড় অনেক সময় ভয়ংকর ধরনের allergic বিক্রিয়া করতে পারে। স্থানীয় কামড়ের জায়গায় অন্য বীজানু সংক্রমণও ঘটতে পারে এবং তার থেকে septicaemia পর্যন্ত হতে পারে। তার ফলে মৃত্যু ঘটাও বিচিত্র নয়। মশার কামড়ে streptococcal septicaemia হতে পারে।

এই সব পোকার বিষে অনেক ধরনের পদার্থ থাকে। এদের মধ্যে কিছু haemolytic—এগুলি রক্তে নানারকম বিক্রিয়ায় রক্তকণিকাকে ভেঙে ফেলে। কিছু neurotoxic—এগুলি নার্ভের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে, আবার কিছু

irritant—এগুলি স্থানীয় কোষে ব্যথা বেদনার সৃষ্টি করে। বোলতা বা ভীমরুল মুখে কামড়ালে অল্প সময়ের মধ্যেই মুখ ফুলে যায়, অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়, চোখ পর্যন্ত ফুলে ঢাকা পড়ে যায়। রোগীর কথা বলতে, ঢোঁক গিলতে কষ্ট হয়। Oedema gloties হলে রোগীর শ্বাসকষ্ট হয়।

এই সব কামড়ে antihistaminic ক্রীম ব্যবহার করা যায়। Antihistaminic গ্রুপের ওষুধ মুখেও খাওয়ানো হয়। মৌমাছির হুল ফুটে থাকলে এটি বের করে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়। বোলতা এবং পিঁপড়ের হুলে অ্যামোনিয়া দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। অম্লজাতীয় বিষে অ্যামোনিয়া, ক্ষারজাতীয় সাবান বা মেথিলিন ব্লু দেওয়া হয় আর ক্ষারজাতীয় বিষে vinigar দেওয়া হয়। Anaphylactic reaction হলে সংগে সংগে এড্রেনালিন ইঞ্জেকশন দেওয়া দরকার।

পুড়ে যাওয়া (Burns) :

আমাদের দেশে মানুষের পুড়ে যাওয়ার ঘটনা নিতান্ত কম নয়। এতে রোগী কী পরিমাণ যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়, কত প্রাণ যে বিনষ্ট হয়, কত লোক যে পঙ্গু হয়ে পড়ে তার ইয়ত্তা নেই। এই পুড়ে যাওয়া দুর্ঘটনাক্রমে হতে পারে আবার আত্মহত্যার কারণেও হতে পারে। খোলা আগুন থেকে বা গরম জল বা পানীয় বা এসিড থেকে পুড়ে যেতে পারে। রান্না করার সময়, প্রদীপ বাতি ইত্যাদি থেকে কাপড় চোপড়ে, মশারীতে আগুন লাগার ঘটনা বেশ ঘটে। শীতকালে গরম কাপড় চোপড়ে বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ে আগুন লাগা খুবই সাধারণ ব্যাপার। বড় দুর্ঘটনায় বাড়ীতে আগুন লাগলে অল্প সময়ে অনেক লোকের প্রাণনাশ হতে পারে।

ইলেকট্রিকে পুড়ে যাওয়ার ঘটনাও বেশ ঘটে। এসিড, এলকেলি এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থেও শরীর পুড়ে যেতে পারে। আলকাতরা, ফুটন্ত পিচ ইত্যাদিতে পুড়ে যায়। বয়লার বা ফার্ণেশে কাজ করার সময়ও পুড়ে যেতে পারে। ষ্টোভ বা গ্যাস সিলিন্ডার থেকেও অনেক সময় বিপত্তি ঘটে। দেওয়ালী এবং নানা উৎসবে বাজি পোড়ানোর সময় আগুন ধরে যাওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বেশী। বাজি এবং বারুদের গুদামে বিস্ফোরণ অতি ভয়ংকর ব্যাপার।

একটি বন্ধ ঘরে আগুন লাগলে বাতাসের অক্সিজেন নিঃশেষিত হয়ে যায়। অত্যধিক ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়। এই অবস্থায় কার্বন মনোক্সাইড এবং আরও

অনেক বিষাক্ত গ্যাস ঘরে জমতে থাকে। মানুষ অনেকক্ষণ এই ধোঁয়া এবং বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যে থাকলে শরীরে আগুন না লাগলেও মৃত্যু ঘটতে পারে। অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়।

অনেকক্ষণ গরম ধোঁয়া শ্বাসের সংগে নিতে থাকলে শ্বাসনালীতে প্রদাহ হয়, অত্যধিক যন্ত্রণা অনুভূত হয়, শ্বাসনালী ফুলে ওঠে, নষ্ট হয়ে যায়—এমন কি ফুসফুস পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নাক, মুখ, গলা, শ্বাসনালী, ফুসফুস কোন কিছুই রেহাই পায় না। শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে পড়ে—দম বন্ধ হয়ে রোগী মারা যেতে পারে। ফুসফুস এবং শ্বাসনালীতে অত্যধিক secretion হয়, রোগী ভালোভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, কথা বলতে কষ্ট হয়, ঢোঁক গিলতে এমন কি কাশতেও ভীষণ কষ্ট হয়।

পুড়ে যাওয়া রোগীর গুরুত্ব বুঝতে গেলে প্রথমতঃ জানতে হবে শরীরের কতখানি জায়গা পুড়ে গেছে এবং কতটা গভীর পর্যন্ত পুড়েছে। সারা শরীরের surface area যদি ১০০ ভাগ ধরা হয়—তাহলে প্রত্যেক হাত শতকরা ৯ ভাগ হিসেবে ১৮ ভাগ, প্রত্যেক পা শতকরা ১৮ ভাগ হিসেবে ৩৬ ভাগ, পেট ও বুকের সামনের দিক শতকরা ১৮ ভাগ, পেছনের দিক শতকরা ১৮ ভাগ, মাথা শতকরা ৯ ভাগ এবং গুহ্যদেশ শতকরা ১ ভাগ। এইভাবে শরীরের কতটা পুড়েছে তার শতকরা হিসাব করা হয়।

মোটামুটিভাবে শরীর পুড়ে গেলে শরীরে জলের ভাগ কমে যায়, নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, রক্তচাপ কমে যায়—রোগীর shock হয়। শিশুদের এবং বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃতভাবে কম পুড়ে গেলেও ফল মারাত্মক হতে পারে। ঠিক সময়ে ঠিক মত চিকিৎসা না করলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

পুড়ে যাওয়া রোগীর প্রচন্ড ব্যথা যন্ত্রণা হয়। রোগী ভয়ে ভাবনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। রোগীর প্রাথমিক দিকটি কাটিয়ে উঠলে পোড়া জায়গাগুলি দূষিত হয়ে ওঠে। শরীরে রক্তাল্পতা ঘটে। পোড়া জায়গাগুলি একেবারে সেরে উঠলেও পরে পেশীতে টান বা contracture হতে পারে। এতে কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী একেবারে পংগু হয়ে যায়।

পুড়ে যাওয়া রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ হওয়া উচিত দেখা মাত্র। কোন রকম সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এমন কি প্রাথমিক চিকিৎসা পুড়ে যাওয়ার ঘটনাস্থল থেকেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন লোক যদি আগুন লাগা ঘরে আটকে পড়ে—

তৎক্ষণাৎ তাকে আলো বাতাসযুক্ত ভালো জায়গায় সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তারও আগে রোগীর নাক, মুখ, গলা ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে—যাতে রোগী সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারে। ভেজা কাপড় দিয়ে ধোঁয়া ময়লা পরিষ্কার করা যেতে পারে। তারপর প্রথমেই দেখা উচিত রোগীর নাড়ী আছে কিনা—শ্বাস নিচ্ছে কিনা—রোগীর জ্ঞান আছে কিনা।

যদি শ্বাস না নেয় তাহলে কৃত্রিমভাবে শ্বাস নেওয়াতে হবে—mouth to mouth অথবা mouth to nose ventilation করে। রোগীর ঘাড়টি একটু পিছেনের দিকে বাঁকিয়ে ধরে চোয়ালটি সামনের দিকে টেনে রাখলে সাধারণভাবে শ্বাসনালী বাধামুক্ত থাকে।

যদি রোগীর হৃৎস্পন্দন না থাকে—external cardiac massage দিয়ে অচল হৃৎপিন্ডকে আবার চালু করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এই সব তাৎক্ষণিক চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরী এবং অনেক সময়ই রোগীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়।

এসব ছাড়াও প্রাথমিক চিকিৎসায় রোগীর পোড়া কাপড় জামা সরিয়ে নিতে হবে। জনতার ভিড় থেকে রোগীকে সরিয়ে এনে ভালো জায়গায় শোয়াতে হবে। মোটামুটিভাবে প্রথমদিকে রোগীর পোড়া জায়গা পরিষ্কারের চেষ্টা না করাই উচিত। কোন রাসায়নিক জিনিষে পুড়ে গেলে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেললে অনেক সময় উপকার হয়। পিচ, আলকাতরা ইত্যাদি শরীর থেকে পরিষ্কার না করাই উচিত। এ সময় কোনরকম ক্রীম, লোশন, মলম বা ব্যান্ডেজ দেওয়া উচিত নয়।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগী অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলে রোগীর পোড়া জায়গার যত্ন নেওয়া উচিত। রোগীকে শিরাপথে fluid এমনকি রক্ত বা প্লাজমা দিতে হবে। পোড়া জায়গায় যাতে জীবানু সংক্রমণ না হয় তার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক মলমও পোড়া জায়গায় দেওয়া যেতে পায়ে। টিটেনাস প্রতিরোধের জন্য টীকা অবশ্যই দিতে হবে। রোগীকে ব্যথা বেদনা থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যথা উপশমকারী ওষুধ যেমন মরফিন, পেথিডিন দিতে হবে। রোগীকে উপযুক্ত খাদ্য দিতে হবে যাতে যথেষ্ট ক্যালোরি, জল এবং ভিটামিন পায়।

সবশেষে বক্তব্য এই যে আগুনে যাতে না পোড়ে তার জন্য সাবধান হওয়া দরকার। আগুন না হলে মানুষের চলে না, কিন্তু আগুন যাতে কোন ক্ষতি না

করে তা সব সময়েই মনে রাখা উচিত। আগুন লাগতে হলে তিনটি জিনিষ একান্ত দরকার—দাহ্যবস্তু, তাপ এবং অক্সিজেন। এদের মধ্যে একটি জিনিষকে সরিয়ে রাখতে পারলেই আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে না। জ্বলন্ত কাপড়-চোপড় খুলে ফেললেই ভালো নতুবা কোন গরমের কম্বল চাপা দিলে আগুন তাড়াতাড়ি নিভে যায়। কড়াইতে গরম তেল বা ঘি হঠাৎ জ্বলে উঠলে তার উপর থালা বা চাটু চাপা দিলে আগুন নিভে যায়।

সাধারণভাবে অসাবধানতা, অজ্ঞতাই আগুনে পোড়ার কারণ। ছেলেমেয়েদের আগুন থেকে সব সময়েই সাবধানে রাখা উচিত। বাজি পোড়ানোর সময় বাচ্চাদের সামলে রাখা উচিত। রান্না করার সময় কাপড়ে বা শাড়ীতে যাতে আগুন না লাগে তার জন্য আটোসাঁটো পোষাকই ঐ সময় পরা উচিত। সিন্থেটিক কাপড় ঐ সময় না পরাই ভালো কেননা ঐ সব কাপড় অত্যন্ত সহজদাহ্য। সিগারেট, বিড়ি খেয়ে জ্বলন্ত টুকরো কখনোই যেখানে সেখানে ফেলা উচিত নয়। স্টোভ, হ্যাজাক, গ্যাস সিলিন্ডার খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। এসিড, অ্যালকেলি ইত্যাদি রাসায়নিক জিনিষ খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। বাড়ীর বৈদ্যুতিক তার ভালো মিস্ত্রী দিয়ে করানো উচিত—এতে যেন কোন ত্রুটি না থাকে। জনসাধারণের পুড়ে যাওয়া রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার।

Spasmodic torticollis :

এটি একটি স্নায়ুতন্ত্রের অসুখ। এই অসুখে ঘাড়ের অগভীর এবং গভীর মাংসপেশীসমূহে এক ধরনের টান ধরে এবং তার ফলে রোগীর মাথা একদিকে বেঁকে থাকে। এই অসুখ সাধারণভাবে মধ্যবয়স্ক এবং বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে বেশী হয়, তবে সব বয়সেই এটি হতে পারে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই অসুখ বেশী হয়। মাংসপেশীতে প্রদাহ হলে, মস্তিষ্ক বিকৃতি থাকলে, খিঁচুনি বা epilepsy থাকলে, মানসিক শক পেলে, বহুদিনের অসুস্থতায় এই অসুখ বেশী হতে দেখা যায়। অত্যধিক ঠান্ডাতেও এটি হতে পারে। Lethergic encephalitis রোগেও এই ধরনের torticollis হতে পারে। হিস্টেরিয়া রোগেও এমন হতে পারে।

এই অসুখ খুব ধীরে ধীরে রোগীকে আক্রমণ করতে পারে, আবার অনেক সময় হঠাৎ ঘাড় বেঁকে যেতে পারে। অসুখের প্রথমদিকে মাংসপেশীর এই

অস্বাভাবিক টানে ঘাড় বেঁকে যায়। মাথাও একপাশে বেঁকে যায়, মুখ অন্যদিকে ঘোরাতে পারে না। ঘোরাবার চেষ্টা করলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। খুব বেশী আক্রান্ত হলে উপরের হাতের মাংসপেশীসমূহে, মুখের এবং shoulder-এর মাংসপেশীসমূহে টান ধরতে পারে। আবার অনেক সময় দুইদিকের মাংসপেশীসমূহে টান ধরে—একে retrocollic spasm বলে। যদি clonic এবং tonic spasm হয় তবে মাথায় jerking movement হতে দেখা যায়। রোগীর ক্লান্তিতে এবং উত্তেজনায় এই অসুখের প্রকোপ বাড়ে। এই সব spasm-এর সংগে যন্ত্রণাও বাড়তে থাকে। এই ধরনের অসুখে cramp, aching ব্যথা এবং তীক্ষ্ন neuralgic ব্যথাও অনুভূত হয়।

এই অসুখ খুবই ভয়ংকর, রোগীকে কাহিল করে ফেলে। রোগীকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া দরকার—শুইয়ে রাখা উচিত। রোগীকে মাঝে মাঝেই phenobarbitone অথবা chloral hydrate অথবা ব্রোমাইড দিয়ে রাখতে হয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে জন্মগত কারণে torticollis হতে দেখা যায়। এতে steruomastoid মাংসপেশীতে টান থাকে এবং তার ফলে ঘাড় একদিকে বেঁকে থাকে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ডানদিকে হতে দেখা যায়। জন্মের সময় এই মাংসপেশীতে আঘাত লাগে—ছিঁড়ে যায়। সেখানে রক্ত জমে এবং পরে মাংসপেশীতে contracture হয়। শল্যচিকিৎসা tenotomy করলে এটি নিরাময় সম্ভব। তবে চিকিৎসার দেরী হলে অনেক সময় শিশুর মুখের বিকৃতি ঘটতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়
নাক কান গলার ব্যথা

নাকের মধ্যে ফোঁড়া (Boils in the nose) :

নাকের মধ্যকার লোমের গোড়ায় staphylococcus দ্বারা সংক্রমণ হলে এই ধরনের ছোট ফোঁড়া হতে পারে। অনেক সময় একটার পর একটা লোমকূপে এই সংক্রমণ ঘটতে পারে। এতে ব্যথা অত্যন্ত বেশী হয়, কেননা এখানকার ত্বক perichondrium-এর সংগে যুক্ত থাকে এবং প্রদাহের ফলে খুব তাড়াতাড়ি অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করে।

এই ধরনের প্রদাহ খুবই বিপদের কারণ হতে পারে কেননা এর থেকে facial vein মারফত মস্তিষ্কের cavernous sinus আক্রান্ত হতে পারে এবং এমন কি মৃত্যু ঘটাতেও পারে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে গরম সেঁক দেওয়া যেতে পারে এবং তার সংগে সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে কখনও ফোঁড়াকে ফাটাবার বা কাটাকুটি করা উচিত নয়। তবে এসব প্রদাহ সাধারণতঃ সাইনাস বা দাঁতের থেকেই জীবাণু সংক্রমণ হয়—তাই সেসবের পূর্ণ চিকিৎসা করা বিধেয়।

সাইনুসাইটিস : সাইনাসের প্রদাহ (Sinusitis) :

প্রধানতঃ নাকের মধ্য থেকে জীবাণু সংক্রমণ হয়েই সাইনাস আক্রান্ত হয়। তবে যে কোন কারণে সাইনাসের aeration এবং drainage-এর গণ্ডগোল হলেই এই ধরনের প্রদাহ ঘটতে পারে। এই প্রদাহে সাইনাসের মধ্যে অত্যধিক secretion হতে থাকে এবং অনেক সময় ভিতরে পুঁজের সৃষ্টি হয়। সাইনাসের মধ্যকার ciliary activity একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। অনেকদিন ধরে এই অসুখ চলতে থাকলে সাইনাসের mucous membrane খুবই পুরু হয়ে পড়ে, ফুলে ওঠে এবং ক্রমশঃ submucous tissue এবং হাড় পর্যন্ত আক্রান্ত হতে থাকে। সাধারণতঃ একদিকের এক সাইনাস অথবা দুইদিকের দুই সাইনাস

আক্রান্ত হয়। তবে একসংগে সব সাইনাসই আক্রান্ত হতে পারে, তখন তাকে বলে প্যানসাইনুসাইটিস (Pansinusitis)।

ম্যাক্সিলারী (maxillary) সাইনাস, ফ্রন্টাল (frontal) সাইনাস, স্ফেনয়ডাল (sphenoidal) সাইনাস এবং এথময়ডাল (ethmoidal) সাইনাস—সর্বত্রই এইভাবে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে।

এই সব সাইনুসাইটিসে খুবই মাথার যন্ত্রণা হয় এবং অনেক সময় আক্রান্ত সাইনাসের জায়গায় ব্যথা অনুভূত হয়। এর সংগে জ্বর হয়, নাড়ীর গতি বেড়ে যায়। আক্রান্ত সাইনাসের জায়গায় উপর থেকে চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে। নাক পরীক্ষা করলে অনেক সময় পুঁজ বের হতে দেখা যেতে পারে। আশেপাশের জায়গাতেও শোথ বা ফোলা (oedema) থাকতে পারে।

ফ্রন্টাল সাইনুসাইটিসে বেশী ব্যথা হয় সাইনাসের নীচের দিকে এবং চোখের উপরের দিকে। সেখানে চাপ দিলেও ব্যথা অনুভূত হয়। রোগী আলো সহ্য করতে পারে না এবং দেখারও অসুবিধা হয়। এথময়ডাল মাথাধরার ক্ষেত্রে চোখের পিছনের দিকে ব্যথা হয়, নাকের পাশে চাপ দিলে রোগী ব্যথার কথা বলে। ম্যাক্সিলারী সাইনুসাইটিসে উপরের পাটির দাঁতে ব্যথা হতে থাকে। Canine fossa-তে বেশী চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়। ম্যাক্সিলার পেছনের দিকে ব্যথা থাকে। স্ফেনয়ডাল মাথাব্যথায় রোগী বলে যেন মাথার ভিতর ব্যথা হচ্ছে এবং এই ব্যথা এত বেশী হয় যে রোগীর ঘাড়ে, গলায় এমন কি কানের পিছনেও ব্যথা প্রসারিত হতে থাকে।

এই সব সাইনুসাইটিসের প্রথমদিকে ঠিকমত চিকিৎসা না করলে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ে এবং সাইনাসের মধ্যে পুঁজ জমতে থাকে। প্রয়োজনে x'ray করে এই সব সাইনাসের অসুখ ঠিকমত নির্ণয় করতে হয়। আবার অনেক সময় অসুখ নির্ণয়ের জন্য diagnostic puncture করারও দরকার হতে পারে।

সাইনুসাইটিসের চিকিৎসা :

সাইনাসের ciliary activity সব চেয়ে দরকারী এবং কোন কারণে এটি নষ্ট হয়ে গেলে সাইনাসের মধ্যে secretion জমতে থাকে, বীজানু সংক্রমণ হয় এবং পুঁজের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত শল্যচিকিৎসায় সে পুঁজ বের করে দেওয়ার দরকার হয়। সুতরাং এই সব সাইনাসের মুখ যেন সব সময়েই খোলা থাকে,

সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। Ciliary activity-কে ভালোভাবে উজ্জীবিত রাখতে হবে এবং secretion যাতে অনায়াসে বের হয়ে যেতে পারে তাও দেখতে হবে।

নাক যাতে বন্ধ হয়ে না যায়, নাকে congestion যাতে না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগীকে একটি আলোবাতাসযুক্ত উষ্ণ আবহাওয়ায় রাখলে ভালো হয়। নাকে মাঝে মাঝে ephedrine (নর্মাল স্যালাইনে ১ থেকে ২%) দেওয়া উচিত। ব্যথা বেদনার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ দিতে হবে। স্থানীয় জায়গায় গরম সেঁক দিলে রোগী খুবই আরাম পায়। Sulphonamide অথবা উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে।

সাইনুসাইটিসের প্রথম অবস্থায় শল্যচিকিৎসা বিশেষ দরকার হয় না। তবে যদি কোন রকমেই অসুখ না সারে, ব্যথা বা মাথাধরা যদি খুবই ভয়ংকর ধরনের হয় তবে শল্যচিকিৎসকের পরামর্শ নিতেই হবে। তবে তার সংগে পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া অবশ্যকর্তব্য।

ম্যাক্সিলারী সাইনাসের ক্ষেত্রে প্রায়শই অপারেশনের দরকার হয়, বিশেষতঃ দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের ক্ষেত্রে এবং সাইনাসের মধ্যে পুঁজ জমে গেলে। ফ্রন্টাল সাইনুসাইটিসের ক্ষেত্রেও মাঝে মধ্যে অপারেশন লাগে।

মুখের যন্ত্রণা :

মুখের যন্ত্রণা নানা কারণেই হতে পারে। এর সংগে মাথাব্যথা থাকতে পারে। অনেক সময়ই এটি সাইনাসের প্রদাহ থেকে হয়। তবে সব সময়েই রোগীর দাঁত, কান, নাক এবং গলা ভালোভাবে পরীক্ষা করা উচিত। সাইনাস বা nasopharynx-এ কোন টিউমার বা ক্যানসার হলে প্রথমদিকে তার একমাত্র উপসর্গ থাকে নির্দেশিত (referred) ব্যথা।

নির্দেশিত ব্যথা হারপিস পরবর্তী neuralgia থেকে হতে পারে। রোগীর মাথর সামনে (fronal) অথবা পিছনে (occipital) অত্যধিক ব্যথা বেদনা প্রায়শই দেখা যায়। তার সংগে ফাইব্রোসাইটিস (fibrositis), ঘাড়ের osteo-arthritis, থাকলে এই মাথাব্যথা আরও বেড়ে যায়। মাইগ্রেনজনিত মাথাব্যথা, anterior ethmoidal neuralgia-জনিত মাথাব্যথা, ট্রাইজেমিনাল নিউর‍্যাল-জিয়া ইত্যাদি পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

টনসিলের প্রদাহ (Acute tonsillitis) :

টনসিলের প্রদাহ অনেক কারণেই হতে পারে। হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা লাগলে এবং রোগীর স্বাভাবিক resistance কোন কারণে কমে গেলে নানা ধরনের ভাইরাস এবং বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটতে পারে।

টনসিলের প্রদাহে প্রথমদিকে রোগী গলায় অস্বস্তিকর জ্বালা অনুভব করে এবং প্রচণ্ড রকমের ব্যথা হয়। এই ব্যথা বেশী বোঝা যায় রোগীর ঢোক গেলার সময়। রোগীর মনে হয় যেন গলা চেপে ধরেছে। রোগীর গলায় অত্যধিক secretion হয় সেগুলি যত গিলে ফেলার চেষ্টা করে ততই ব্যথায় কাতর হয়। আশেপাশের জায়গা—pharynx-এ পর্যন্ত প্রদাহ হয়। আশেপাশের lymph গ্ল্যাণ্ডগুলিও বড় হয় এবং চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়। রোগীর জ্বর হয়।

গলার দুইদিকের দুই টনসিল ফুলে ওঠে, লাল হয়ে পড়ে, এর সংগে pharynx-ও লাল হয়, uvula বা আলজিভ ফুলে বড় হয়ে পড়ে। শেষদিকে টনসিলের গায়ে নানা ধরনের নোংরা debris জমতে দেখা যায়। এ সময়ে রোগী কোন খাবার খেতে গেলেই যন্ত্রণা অনুভব করে, ফলে রোগী নিজের লালা পর্যন্ত খেতে পারে না। অনেক সময় টনসিলের গায়ে পর্দার মত (membrane) দেখা যেতে পারে।

ঠিক সময়ে পর্যাপ্ত চিকিৎসা না করলে টনসিলের পিছনে ফোঁড়া (peritonsillar abscess) হতে পারে। শ্বাসনালীতে অত্যধিক ফোলার জন্য (laryngeal oedema) রোগীর শ্বাস নিতেও কষ্ট হতে পারে।

টনসিলাইটিসের চিকিৎসা :

রোগীকে পরিপূর্ণ বিশ্রামে রাখা দরকার। রোগীকে নরম খাদ্য অথবা তরল পানীয় অথচ পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে। সালফোনামাইড অথবা উপযুক্ত অ্যাণ্টি-বায়োটিক ওষুধ দিতে হবে, যাতে আনুষংগিক আর কোন বীজানু সংক্রমণ না ঘটে বা নতুন কোন উপসর্গ দেখা না দেয়।

রোগীকে গরম বা উষ্ণ অ্যাণ্টিসেপটিক সলিউশনযুক্ত জলে কুলকুচা বা girgle করতে দিলে উপকার পাওয়া যায়। অনেক ধরনের অ্যান্টিসেপটিক লজেন্স পাওয়া যায়, সেগুলিও রোগীকে ব্যবহার করতে দেওয়া যায়। উষ্ণ বাইকার্বোনেট

সলিউশনের স্প্রে দিলেও ভালো উপকার হতে পারে। জ্বরের জন্য জ্বরনিবারক ওষুধ এবং ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধও দিতে হবে। সাধারণভাবে ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে প্রদাহ কমে যায় এবং মোটামুটিভাবে টনসিল আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

তবে বার বার প্রদাহ হতে থাকলে দীর্ঘস্থায়ী (chronic) প্রদাহে পরিণত হতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসার সাহায্যে টনসিল দুটি বাদ দেওয়াই শ্রেয়।

Peritonsillar abscess :

সাধারণতঃ টনসিলের প্রদাহের পরবর্তী খারাপ উপসর্গ হিসাবে এই ধরনের ফোঁড়া টনসিলের পাশে এবং পিছনের দিকে হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে staphylococcus অথবা streptococcus জীবানু দিয়েই সংক্রমিত হয়।

এ ক্ষেত্রে রোগীর গলায় প্রচন্ড ব্যথা হয়। চোয়ালের পিছনের lymph গ্ল্যান্ডগুলি বড় হয়। টিপলে ব্যথা লাগে। রোগীর মুখ খুলতে কষ্ট হয় এবং শেষদিকে মুখ খুলতেই পারে না। রোগী কথা বললেও কষ্ট হয়। রোগী ঢোঁক গিলতে পারে না, মুখ দিয়ে লালা ঝরতে থাকে। রোগীর pharynx, আলজিভ লাল হয়ে ওঠে এবং ফুলে ওঠে। টনসিলের পিছনে ফোঁড়া হওয়ার জন্য টনসিল যেন সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে। রোগীর জ্বর থাকে।

এই সব রোগীকে খুব সাবধানে চিকিৎসা করা উচিত। ঠিক মত girgle করানো দরকার। অ্যান্টিসেপটিক সলিউশনযুক্ত স্প্রে করলেও উপকার হয়। প্রথম থেকে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিয়ে যেতে হবে। ব্যথার জন্য ব্যথা উপশমকারী ওষুধও দিতে হবে। তরল পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে। শল্যচিকিৎসার সাহায্যে পুঁজ বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

পরে উপযুক্ত সময়ে টনসিলের অপারেশন করানোও দরকার। অবশ্য অনেক সময় উপযুক্ত অ্যানেস্থিসিয়ার ব্যবস্থা থাকলে peritonsillar ফোঁড়া drain করার সময়ই টনসিল অপারেশন করা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে পুরো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ আগে থেকেই রোগীকে দেওয়া দরকার এবং পরেও দিয়ে যেতে হবে।

Retropharyngeal abscess :

সাধারণভাবে pharynx-এর পেছনদিকে retropharyngeal lymph গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ থেকেই ফোঁড়া হয়। এটি অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও হতে দেখা যায় এবং সেক্ষেত্রে এটি pharynx-এর নীচের দিকে হতে দেখা যায়। অবশ্য পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উপরের দিকে এবং মোটামুটি soft palate-এর উপর লেভেলে হতে দেখা যায়।

এই সব রোগীর গলায় ব্যথা হয়, ঢোঁক গিলতে কষ্ট হয়। Pharynx-এর উপরের দিকে এই ফোঁড়া হলে নাক বন্ধ হয়ে যায় আবার নীচের দিকে হলে শ্বাসনালীতে অবরোধ সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণতঃ streptococcus দিয়েই এই সংক্রমণ হয়। রোগীর জ্বর হয়।

এই অসুখের চিকিৎসায় যথোপযুক্ত অ্যাণ্টিবায়োটিক দিতে হবে। ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ দিতে হবে। শল্যচিকিৎসার সাহায্য নিতে হবে।

কানের perichondritis :

কানের cartilage-এর আবরণী বা perichondrium-এর প্রদাহ অনেক কারণে হতে পারে। কোন আঘাত লেগে যদি রক্ত জমে যায় সেখানে জীবানু সংক্রমণ হলে অথবা অন্য কোন injury হলেও এ ধরনের প্রদাহ হতে পারে। এই প্রদাহে কান বড় হয়ে যায় এবং বেশ মোটা ধরনের হয়ে পড়ে। লাল এবং বেশ চকচকে হয়ে পড়ে। এতে রোগীর প্রচণ্ড ব্যথা বা যন্ত্রণা হয়।

এই অসুখের চিকিৎসায় গরম সেঁক দেওয়া হয়। অনেক সময় ম্যাগনেশিয়াম সালফেটের প্রলেপ দিলে উপকার হয়। উপযুক্ত অ্যাণ্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া দরকার। তবে ফোঁড়া হয়ে গেলে অর্থাৎ ভেতরে পুঁজ জমলে তা অপারেশন করে বের করে দেওয়া উচিত।

কানের furunculosis :

কানের মধ্যকার লোমের গোড়ায় এই প্রদাহ হতে পারে। সাধারণতঃ staphylococcus দিয়েই এই সংক্রমণ ঘটে। এই প্রদাহে যথেষ্ট ব্যথা হয়, কেননা কানের চামড়া এবং perichondrium খুবই কাছাকাছি থাকে এবং সময় বিশেষে perichondrium-ও আক্রান্ত হতে পারে।

গরম সেঁক দিলে রোগী আরাম অনুভব করে। অ্যান্টিবায়োটিক দিতেই হয়। সাধারণতঃ এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। তবে পুঁজ হয়ে গেলে তা বের করার ব্যবস্থা করা দরকার।

External meatus-এর furunculosis হলেও অত্যন্ত ব্যথা হয়। এই ব্যথা মাথায়, চোয়ালে, গলায় এবং কাঁধেও প্রসারিত হতে পারে। সামনের দিকে প্রদাহ হলে কানের tragus ফুলে ওঠে, পেছনের দিকে হলে mastoid process ফুলে ওঠে। এই সব জায়গায় চাপ দিলেও অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয়।

কানের erysipelas :

কানের subepithelial tissue-তে streptococci দ্বারা সংক্রমণ হলে এই অসুখ হয়। কান লাল হয়ে ওঠে, ফুলে ওঠে। মুখে এবং মাথার দিকেও এই সংক্রমণের বিস্তার ঘটে। পরে ছোট ছোট ফোস্কা দেখা যায়। অত্যন্ত ব্যথা হয় এবং অনেক সময় জ্বর হয়। সাধারণতঃ ঠিকমত পেনিসিলিন দিয়েই এই অসুখের চিকিৎসা করা হয়।

কানের হারপিস (Herpes) :

কানের চারপাশে হারপিস জস্টার হতে পারে। এটি সাধারণতঃ জলবসন্ত ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়। এতে geniculate এবং অন্যান্য মস্তিষ্কস্থিত নার্ভের গ্যাংলিয়া আক্রান্ত হয়। ফেসিয়াল নার্ভ এবং অডিটরি নার্ভও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আক্রান্ত হতে দেখা যায়, তবে অন্য নার্ভেও হতে পারে।

এই সব ক্ষেত্রে ছোট ছোট ফোস্কা দেখা দেয়। সে সব জায়গা ঠিকমত শুকনো রাখলে তাড়াতাড়ি সেরেও যায়। তবে ফোস্কা হওয়ার আগে বা পরেও neuralgia-র প্রচণ্ড ব্যথা হতে দেখা যায়। তার জন্য যথেষ্ট ব্যথানিবারক ওষুধ দেওয়া হয়।

Otitis externa :

এতে কানের external canal-এ জীবাণু সংক্রমণ ঘটে এবং drum membraneও আক্রান্ত হতে পারে। নানা ধরনের জীবাণু যেমন haemolyticus

streptococcus, staphylococcus aureus, pseudomonas pyocyaneus, এমনকি কিছু fungus দ্বারাও এই ধরনের সংক্রমণ ঘটতে পারে। অনেক সময় এই সংক্রমণ খুবই ভয়ংকর ধরনের হয়। সাধারণভাবে কানের চামড়ার কাটাছেঁড়া থেকেই এর উদ্ভব ঘটে। অনেক রোগীর বিশেষ কোন পদার্থের অ্যালার্জি থেকেও এই অসুখ হতে পারে।

রোগ নির্ণয় খুব একটা কঠিন নয়। কেননা এতে আক্রান্ত জায়গায় প্রদাহ দেখা যায়, লাল হয়ে যায়, ফুলে ওঠে, চাপ দিলে ব্যথা হয় এবং অনেক সময় রস গড়াতে থাকে। রোগীর কানে অসহ্য ব্যথা হয়। কানের মধ্যে সাধারণতঃ অনেক ময়লা জমে থাকে। কানের সামনের গ্ল্যান্ডগুলিও বড় হয় এবং চাপ দিলে ব্যথা পায়।

এতেও গরম সেঁক দিলে রোগী খুবই আরাম বোধ করে এবং ব্যথা কমে। একটু গজে গ্লিসারিণ মিশ্রিত ichthyol দিয়ে ভালোভাবে সেঁক দিলে উপকার হয়। যথোপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ দিতে হবে। Neomycin এবং soframycin এসব ক্ষেত্রে বিশেষ উপযুক্ত এবং এর সংগে hydrocortisone দিলে ভালো হয়। অনেক সময় এই সব ওষুধের ক্রীম স্থানীয় জায়গায় লাগালেও উপকার হয়। ব্যথা বেদনা কমে যাওয়ার পর রোগীর কান ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

দীর্ঘস্থায়ী এই অসুখে কানের meatus খুব সরু হয়ে যেতে পারে এবং রোগীর শোনার গন্ডগোল হতে পারে। সেক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসার দরকার হয়।

কানে wax :

কানের এই wax আসলে কানের চামড়ার মধ্যকার গ্রন্থির নিঃসরিত রস। এটি সাধারণভাবে লোকের উপকারই করে কেননা এতে বাইরের কোন জিনিষ ধুলোবালি কানের মধ্যে ঢুকলে বেরিয়ে যেতে সাহায্য হয়। কিছু কিছু লোকের এই wax বেশী জমে, তবে যারা ধুলোবালির পারিপার্শ্বিকে কাজ করে তাদেরই কানে বেশী wax হয়।

এই wax বেশী জমলে কানে নানান উপসর্গ দেখা দিতে পারে। খুব যন্ত্রণা হতে পারে, কানে শোনার গন্ডগোল হতে পারে। কানে নানা ধরনের আওয়াজও হতে পারে। স্নানের সময় বা অন্য কোন কারণে কানে জল ঢুকলে এই

wax ফ্লে ওঠে এবং এতে external meatus একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এর একমাত্র চিকিৎসা—চিকিৎসকের সাহায্যে কান থেকে wax বের করে দেওয়া। যদি wax খ্ব শক্ত হয় তবে বের করার দ্ই বা তিন দিন আগে থেকে কানে সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট সলিউশন অথবা অলিভ তেল দেওয়া হয়। এতে wax নরম হয়ে যায় এবং syringing করে বের করা সহজ হয়। যদি খ্ব তাড়াতাড়ি শক্ত wax বের করতে হয় তবে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোজেন পারোক্সাইড দিলে স্মবিধা হয়।

Myringitis bullosa :

কানের tympanic membrane-এ ভাইরাস ঘটিত প্রদাহে এই ধরনের অস্খ হয়। সাধারণতঃ ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগার সময় এটি হতে দেখা যায়। Drum-এ রক্তজমা ফোস্কা হয় এবং meatus-এর গাত্রেও এটি বিস্তার লাভ করতে পারে। এতে প্রচণ্ড ধরনের ব্যথা বা যন্ত্রণা হয়। রোগী কোন কাজ করতে পারে না, ঘ্মুতেও পারে না। রোগীকে অথর্ব করে দেয়। ফোস্কা যদি ফেটে যায় তবে তার থেকে sero-sanguineous রস বের্তে থাকে। আবার অনেক সময় ফোস্কা শ্কিয়ে যেতে দেখা যায়। এর সংগে ভাইরাসজনিত labyrinthitis অথবা meningo-encephalitis পর্যন্ত হতে পারে।

এর চিকিৎসায় পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে যাতে অন্য কোন জীবান্ দ্বারা আর সংক্রমণ না ঘটে।

Acute otitis media :

Middle ear cleft-এর গাত্রাবরণীর প্রদাহ অনেক কারণেই হতে পারে। স্ট্রেপ্টোককাস, স্ট্যাফাইলোককাস, হিমোফিলাস এবং নিউমোককাস জীবান্ দিয়েই এই প্রদাহ স্ষ্টি হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে Eustachian টিউব থেকেই জীবান্ সংক্রমণ হয়। Nasopharynx-এ প্রদাহ থাকলে এবং শিশ্দের ক্ষেত্রে adenoid থাকলে, সাধারণ সর্দিতে, নাকের সাইনাসে জীবান্ সংক্রমণ থাকলে, টন্সিলে প্রদাহ থাকলে middle ear-এ জীবান্ সংক্রমণ সহজেই ঘটে। অবশ্য

অনেক সময় কানের drum-এ যদি আগে থেকেই ফুটো থাকে তবে বাইরে থেকেও জীবানু সংক্রমণ ঘটতে পারে।

এই অসুখে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। রোগী প্রথমেই অত্যন্ত ব্যথার কথা বলে। এই middle ear-এ অল্প সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি অনেক প্রদাহজনিত রস নিঃসরণ হলে প্রচন্ড যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। এই ব্যথা খুবই তীক্ষ্ন ধরনের হয় এবং কানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। রোগের প্রথমদিকে এই ব্যথা খুব একটা অন্যদিকে বিস্তার লাভ করে না।

রোগী সেই কানে শুনতে পায় না। অবশ্য যখন অনেক secretion জমে তখনই এই শোনার গন্ডগোল হয়, নতুবা প্রথমদিকে রোগী শুনতে পায়। অসুখ যতই বাড়তে থাকে সেই অনুপাতে রোগীর শোনারও গন্ডগোল হতে থাকে এবং শেষপর্যায়ে রোগী একেবারেই শুনতে পায় না।

রোগীর কানের drum যখন ফুটো হয়ে যায়, নষ্ট বা necrosis হয়ে যায় তখন কান থেকে রস গড়াতে থাকে। এই ফুটো হলে drum membrane-এর চাপ চলে যায় এবং রোগীর ব্যথা যন্ত্রণারও যথেষ্ট লাঘব ঘটে। রসে অনেক সময় ছিটে-ফোঁটা রক্ত থাকতে পারে এবং পরে এটি একেবারে পুঁজে পরিণত হয়।

রোগীর মাথা ঝিমঝিম করে, মাথা ঘোরে, জ্বর হয়, নাড়ীর গতি দ্রুত থাকে এবং রোগী কাহিল হয়ে পড়ে। রোগীর mastoid process-এর উপর চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে।

চিকিৎসা :

রোগীকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া দরকার। ভালো আলোবাতাসযুক্ত পারি-পার্শ্বিক অবস্থায় রাখা উচিত। ব্যথা উপশমের জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ দিতে হবে। অনেক সময় ব্যথানিবারনের জন্য কানে ফোঁটা ওষুধও দেওয়া হয় এবং এতেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। নাকের মধ্যে ephedrine ওষুধের ফোঁটা দিলে Eustachian tube-এর মুখ খোলা থাকে এবং টিউবের patency ঠিক থাকে। নাকের congestion কমে যায়। অ্যান্টিসেপটিক ওষুধ মিশ্রিত steam inhalation দিলেও বিশেষ উপকার হয়। রোগীকে পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে।

অনেক সময় এই সব চিকিৎসায় আপনা থেকেই এই অসুখ সেরে যায় তবে

কোন কারণে যদি অসুখের serverity না কমে, রোগীর যন্ত্রণা যদি অত্যধিক হয় তবে tympanic membrane-এ অত্যধিক চাপ কমানোর জন্য অপারেশন—myringotomy করার দরকার হতে পারে। এতে ভিতরকার চাপ কমে যাবে এবং রোগীর ব্যথা বেদনাও কমে যাবে। অবশ্য অনেক সময় আপনা থেকেই tympanic membrane-এ ফুটো হয়ে যেতে পারে এবং সেখান দিয়ে রস, পুঁজ ইত্যাদি বের হতে থাকে। সেক্ষেত্রেও আনুষংগিক চিকিৎসায় রোগ নিরাময় ঘটে।

সাধারণভাবে myringotomy অপারেশন করতে হলে অনেক ভেবেচিন্তে করা হয়। রোগীর কানের ব্যথা যদি কোন ওষুধেই কমানো না যায়, যদি কানে শোনা দিন দিন খারাপের দিকে যেতে থাকে, রোগীর middle ear-এ যদি অত্যধিক পুঁজ জমে যায় এবং তার জন্য রোগী যদি কাহিল (toxic) হয়ে পড়ে অথবা কানের drum যদি অত্যধিক ফুলে ওঠে এবং chemotherapy করেও কাজ না হয়, তবে myringotomy অপারেশন করাই শ্রেয়।

Acute mastoiditis :

Acute otitis media-র complication হিসাবে mastoid area-তেও প্রদাহ ঘটতে পারে। সাধারণতঃ কমবয়সী ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেই এই অসুখ বেশী দেখা যায়। Mastoid-এর মধ্যে বীজানু সংক্রমণের ফলে এই প্রদাহ হয় এবং সেখানকার গাত্রের lining membrane খুবই congested হয়ে পড়ে, ফুলে ওঠে, অত্যধিক secretion হয়। সেই নিঃসৃত secretion ঠিকমত বেরিয়ে আসতে পারে না। এর ফলে হাড়েরও ক্ষয় শুরু হতে থাকে। অত্যধিক ক্ষয় হলে mastoid-এর ভিতর একটি গর্তের সৃষ্টি হয়। সেই গর্তে পুঁজ জমতে থাকে। সংক্রমণ খুবই বেশী ধরনের হলে সেই সংক্রমণ মস্তিষ্কের মধ্যেও বিস্তার লাভ করতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর জীবনসংশয় হয়। অবশ্য দু'-একটি ক্ষেত্রে এই পুঁজ বাইরের দিকে এসে periosteum-এর নীচে ফোঁড়ার সৃষ্টি করতে পারে।

এই mastoiditis-এর আগেভাগেই রোগীর acute otitis media থাকে। এই অসুখে রোগীর খুবই যন্ত্রণা হয়। কানের tympanic membrane-এ প্রদাহের ফলে ফুটো হয়ে গেলে অথবা myringotomy অপারেশনের পর প্রাথমিকভাবে

ব্যথা কমে যায় কিন্তু mastoiditis থাকলে সেই ব্যথা খানিকটা থেকেই যায়। তবে সেই ব্যথা সাধারণতঃ মাস্টয়েডের জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু খুব বেশী ধরনের সংক্রমণ ঘটলে ব্যথা ভয়ংকর ধরনের হতে পারে এবং মাথার আশেপাশের জায়গাতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কানের মধ্য দিয়ে খুব বেশী রস গড়াতে দেখা যায়, তবে aditus-এ খুব বেশী ফোলা থাকলে রস বের হতে পারে না এবং মাস্টয়েডে সেই রস জমতে থাকে এবং বেশী পুঁজের সৃষ্টি হয়। এই সবের সংগে রোগীর দেহের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে—জ্বর হয়, নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়। তবে যদি সংক্রমণ মস্তিষ্কেও ছড়িয়ে পড়ে তবে নাড়ীর গতি অস্বাভাবিক রকমের কম হতে পারে। রোগী সেই কানে ভালো শুনতে পায় না। রোগী অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ে।

এই আক্রান্ত মাস্টয়েডের জায়গায় চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে এবং অনেক সময় সেখানে ফোলা থাকতেও দেখা যায়। ঠিকমত রোগ নির্ণয়ের জন্য একটি x'ray করা দরকার।

চিকিৎসা :

এই সব রোগীকে যথোপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। রোগীকে সব সময় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ দিতে হবে। জ্বর হলে তাপমাত্রা কমানোর জন্যও ওষুধ দিতে হবে। তবে এতে যদি নিরাময় সম্ভব না হয় তবে শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। বিশেষতঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে অপারেশন করতেই হয়। যেমন—যদি subperiosteal abscess হয়; acute oitis media-র চিকিৎসায় myringotomy করার পরেও যদি বার বার ব্যথা ফিরে আসে; যখন কান দিয়ে discharge বের হয় না অথচ ব্যথা বেড়েই চলে; যখন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া সত্ত্বেও কান থেকে অধিক পরিমাণ পুঁজ বের হতেই থাকে; যদি দিন দিন কানে শোনা কমে যেতেই থাকে; যদি চিকিৎসা সত্ত্বেও মাথাব্যথা বেড়েই চলে, যখন মস্তিষ্কজনিত নানান উপসর্গ যেমন ঝিমুনি, papilloedema ইত্যাদি দেখা দেয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ধরনের মাস্টয়েড অপারেশন করলে মাস্টয়েডের মধ্যকার জমা রস, পুঁজ ইত্যাদি বের হয়ে যেতে পারে। জীবাণুঘটিত focus বের হয়ে যায়। জীবাণু সংক্রমণ আর বাড়তে পারে না এবং রোগীর শ্রবণশক্তি মোটামুটি বজায় রাখা যায়।

অনেক ধরনের mastoiditis হতে পারে। Zygomatic mastoiditis হলে কানের গহ্বরের সামনে এবং উপরের দিকে ফোলা দেখা যায়। সেখানে চাপ দিলেও ব্যথা অনুভূত হয়। প্রদাহ খুব বেশী ধরনের হলে পুঁজ চোখের পিছনের দিক পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে।

Bezold's mastoiditis হলে পুঁজ নীচের দিকে গলার মাংসপেশীর মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পারে। এর ফলে sternomastoid মাংসপেশীর মধ্য দিয়ে পুঁজ এসে গলায় ফোঁড়ার সৃষ্টি হতে পারে। গলায় লাল ধরনের ফোলা দেখা দেয়। চাপ অত্যন্ত বেড়ে যায় অত্যধিক ব্যথাও হয়। শল্যচিকিৎসায় এর চিকিৎসা করা দরকার। বিধিমত অ্যান্টিবায়োটিক দিতেও হবে।

Acute laryngitis :

অত্যধিক ঠান্ডা লেগে, ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে অথবা অন্য কোন অসুখের আনুষংগিক উপসর্গ হিসাবে কন্ঠনালীতে প্রদাহ হতে পারে। এতে প্রথমদিকে রোগীর গলার স্বর বসে যায় এবং এমন কি কথা বলতে পারে না। রোগীর গলায় প্রচন্ড ব্যথা হয়। Vocal cord এবং তার আশেপাশে লাল congested হয়ে থাকে, ফুলে থাকে। রোগীর অনেক সময় মনে হয় গলায় যেন বাইরে থেকে কেউ চেপে ধরেছে। রোগীর কথা বলতে, ঢোঁক গিলতে কষ্ট হয়। রোগীর কাশি থাকে এবং কাশতেও বেশ কষ্ট হয়। রোগীর নাক দিয়ে সর্দি বের হতে থাকে। রোগীর জ্বর হয়।

Streptococcus pyogenes দিয়ে সংক্রমণ হলে উপসর্গ খুবই ভয়ংকর হতে পারে। অত্যধিক ফোলার জন্য oedema glottis হলে রোগী শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। রোগীর অবস্থা সংগীন হয়ে পড়ে। রোগী toxic হয়ে পড়ে। টাইফয়েড, জলবসন্ত, ডিফথেরিয়া, erysipelas, নিউমোনিয়া ইত্যাদি অসুখের আনুষংগিক উপসর্গ হিসাবে অনেক সময় কন্ঠনালীর প্রদাহ দেখা দেয়।

এই সব অসুখে রোগীকে বিশ্রামে রাখা উচিত। রোগীকে কথা বলতে নিষেধ করা হয়। রোগীকে আলোবাতাসযুক্ত ঘরে রাখা দরকার। ঘরের বাতাস একটু উষ্ণ এবং আর্দ্র (moist বা humid) হলে ভালো হয়। রোগীকে টিংচার বেনজয়েন-যুক্ত বাষ্প শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে দিলে প্রভৃত উপকার পাওয়া যায়। অ্যান্টিসেপটিক সলিউশনযুক্ত গরম জলের ভাপ দিলেও চলে।

এ দিয়ে girgle করলেও আরাম পাওয়া যায়। বাইরে থেকে গলায় গরম সেঁক দেওয়া যায়। অত্যধিক কাশি থাকলে, কাশির ওষুধ দেওয়া হয়। ব্যথার জন্যও sedative ওষুধ দেওয়া হয়। যথোপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রথম থেকেই দেওয়া উচিত।

তবে oedema glottis হলে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হতে থাকলে এবং রোগী toxic হয়ে গেলে tracheostomy করার দরকার হয়। ডিফথেরিয়া হলে অ্যান্টিটক্সিন এবং পেনিসিলিন আলাদা করে দিতে হবে। অন্য অসুখ থাকলে যেমন টাইফয়েড বা নিউমোনিয়া থাকলে, তার আলাদা চিকিৎসা করতে হবে।

রোগীর শ্বাসকষ্ট থাকলে, শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে অক্সিজেন দিতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শমত অনেক সময় steroid ওষুধও দেওয়া যেতে পারে। রোগীর যত্নপরিচর্যা সুচারুভাবে করা দরকার এবং সবসময় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা দরকার।

চতুর্থ অধ্যায়

চোখের ব্যথা

চোখের আঞ্জিনা (Hordeolum ; Stye) :

চোখের পাতার zeis গ্রন্থির প্রদাহ থেকে এই stye হয়। এই প্রদাহের স্থানীয় জায়গায় পুঁজ জমে। রোগের প্রথমদিকে এই গ্রন্থি একটু ফুলে ওঠে, শক্ত হয়ে পড়ে। এতে অত্যন্ত ব্যথা বা যন্ত্রণা হয়। সেই চোখের পুরো পাতা বা eyelid ফুলে উঠতে পারে। যখন পুরোমাত্রায় ফোঁড়ার সৃষ্টি হয় তখন সেই পুঁজ বের না হওয়া পর্যন্ত ব্যথা থাকে। অনেক সময় একটি বা পর পর কয়েকটি জায়গায় এই ধরনের প্রদাহ হতে পারে।

সাধারণতঃ স্ট্যাফাইলোককাস জীবানু দিয়ে এর সংক্রমণ ঘটে। যেসব রোগীর body resistance কম থাকে তাদেরই এই ধরনের প্রদাহ যেমন ফোঁড়া, কার্বাঙ্কল, acne ইত্যাদি হতে দেখা যায়। ডায়াবিটিস রোগীদেরও এই ধরনের stye প্রায়শই দেখা যায়।

অসুখের প্রথমদিকে গরম সেঁক দিলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। চোখের অ্যান্টিবায়োটিক মলমও চোখে দেওয়া হয়। অনেক সময় ফোঁড়া ফেটে নিজে থেকে পুঁজ বেরিয়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই শল্যচিকিৎসার দরকার হতে পারে। বার বার stye হতে থাকলে রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে হবে। ডায়াবিটিস থাকলে তার পর্যাপ্ত চিকিৎসা করতে হবে।

Hordeolum internum :

এটি চোখের meibomian গ্রন্থির প্রদাহ থেকেই হয়। এতেও স্থানীয় আক্রান্ত গ্রন্থিতে পুঁজ জমতে দেখা যায়। এটি stye-এর মত বেশী ক্ষেত্রে হয় না। সাধারণতঃ chalazion-এ জীবানু সংক্রমণ থেকে এই ধরনের প্রদাহ ঘটে। এই প্রদাহ কিন্তু খুবই ভয়ংকর ধরনের হতে পারে। চোখের পাতা উল্টে ধরলে হলদে রঙের পুঁজের জায়গা বোঝা যায়। অনেক সময় এটি নিজে

থেকেই ফেটে যায়, conjunctivaতেও ফেটে যেতে পারে। চামড়া দিয়ে এই ধরনের ফোঁড়া ফেটে যাওয়া খুব একটা দেখা যায় না।

এ ক্ষেত্রে গরম সেঁক দেওয়া উচিত। চোখে অ্যান্টিসেপটিক চোখের মলম দেওয়া উচিত। পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। তবে ফোঁড়ায় incision দিয়ে পুঁজ বের করে দিতে হলে chalazion-এর মত incision দেওয়া হয় এবং ভালোভাবে কুরে কুরে (scrape) বের করে দেওয়া হয়।

Trichiasis :

চোখের পাতার চুল যখন ভেতরের দিকে বেঁকে গিয়ে চোখের cornea-তে ঘর্ষণ করে তখন তাকে trichiasis বলে। Trachoma, spastic entropion ইত্যাদি অসুখে চোখের পাতার চুল এইভাবে ভেতরের দিকে বেঁকে যায়। চোখ পুড়ে গেলে, আঘাত লাগলে, অপারেশনের পরে চোখের পাতায় প্রদাহের পরেও এমন হতে পারে।

চোখের মধ্যে বাইরের জিনিষ পড়লে যে সব উপসর্গ দেখা দেয় এখানেও সেই সব উপসর্গ দেখা দেয়, যেমন চোখ কর কর করে, লাল হয়ে ওঠে, ব্যথা হয়, চোখ দিয়ে জল পড়ে। অনেকদিন এই অবস্থা চলতে থাকলে বার বার cornea-তে ঘর্ষণের ফলে চোখে corneal ulcer এবং পরে cornea-তে সাদা opacity হতে পারে। তাতে চোখের দৃষ্টিশক্তি আংশিক বা সম্পূর্ণ লোপ পেতে পারে।

এই অসুখের চিকিৎসায় যে সব চুল ভেতরের দিকে চলে গেছে সেগুলি তুলে ফেলতে হয়। কয়েক সপ্তাহ পর পর এই চুল তুলে দিতে হয়। সম্পূর্ণ নিরাময়ের জন্য diathermy বা electrolysis করার দরকার হয়। অনেক সময় entropion ঠিক করার জন্য সঠিক শল্যচিকিৎসা করা হয়।

Acute conjunctivitis :

এতে চোখের conjunctiva-তে প্রদাহ হয়। এই প্রদাহ অনেক ধরনের হতে পারে—যেমন catarrhal, mucopurulent, purulent অথবা membranous। Staphylococcus aureus অথবা albus অথবা koch-weeks bacillus, pneumococcus, বিভিন্ন ভাইরাস ইত্যাদির সংক্রমণেই এই ধরনের প্রদাহ ঘটে।

এই অসুখ যে কোন বয়সে স্ত্রী-পুরুষ সবারই হতে দেখা যায়। সাধারণতঃ কোন আঘাতে, অত্যধিক ঠাণ্ডা লেগে, সাধারণ সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদিতে চোখের এই প্রদাহ হয়।

Conjunctiva-র এই প্রদাহে চোখ চুলকায়, চোখে যেন কিছু পড়েছে এই রকম কর্ কর্ করে। চোখ লাল হয়, চোখ দিয়ে জল পড়ে। সকালের দিকে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়। চোখে দেখতে অসুবিধা হয়। রোগী আলোর দিকে তাকাতে পারে না। সাধারণতঃ চোখে বিশেষ ব্যথা হয় না তবে কর্ণিয়া আক্রান্ত হলে চোখে ব্যথা হয়।

Mucopurulent অথবা purulent ধরনের প্রদাহে চোখ অত্যধিক লাল হয়ে ওঠে, চোখের পাতা ফুলে ওঠে। Conjunctiva-র ঠিক নীচে ছোট ছোট রক্তক্ষরণ হতে পারে। চোখের থেকে পুঁজমিশ্রিত রস বেরুতে থাকে। রোগীর জ্বরও হতে পারে।

এই সব conjunctivitis-এর চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রথমদিকেই নজর দিতে হয় যাতে অন্য চোখে সংক্রমণ না ঘটে। আক্রান্ত চোখ বার বার পরিশ্রুত জলে অথবা নর্মাল স্যালাইন দিয়ে পরিষ্কার করে ধুতে হয়।

সালফাসিটামাইড অথবা অ্যাণ্টিবায়োটিক চোখের ফোঁটা ব্যবহার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কখনোই চোখে ব্যাণ্ডেজ করা উচিত নয়। চোখে কালো চশমা পরা দরকার।

এই অসুখের পরবর্তী উপসর্গ হিসাবে iritis অথবা marginal ulcer হতে পারে। সেক্ষেত্রে চোখে ব্যথা হতে পারে।

Cornea-র প্রদাহ (Keratitis) :

এতে চোখের cornea-তে প্রদাহ ঘটে। এটি কখনও suppurative হয়, কখনও বা non-suppurative ধরনের হয়। সাধারণতঃ গণোবক্কাস অথবা ডিফথেরিয়া জীবাণু সংক্রমণ হয়। অনেক সময় চোখে আঘাত লেগেও এই প্রদাহ ঘটতে পারে। বাইরে থেকে ধুলোবালি বা অন্য কিছু পড়ে কর্ণিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এই অসুখে চোখে বেশ ব্যথা হয়। কখনও এটি চোখেই সীমাবদ্ধ থাকে, আবার অনেক সময় কপালের দিকে নির্দেশিত ব্যথাও থাকতে পারে। চোখ দিয়ে

জল পড়ে, চোখ আলো সহ্য করতে পারে না। রোগীর সেই চোখে দেখতেও অসুবিধা হয়। অনেক সময় চোখ লালও হতে পারে। কর্ণিয়া তার স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে, অন্য রকম দেখতে হয়। চোখে fluorescein ফোঁটা দিলে কর্ণিয়ার ক্ষত সবুজ গত ভালোভাবে দেখা যায়।

এই কর্ণিয়ার ক্ষত পর্যাপ্ত চিকিৎসা না করলে পরবর্তী সময়ে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। চোখের কর্ণিয়াতে সাদা দাগ হয়ে গেলে দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। আবার অনেক সময় কর্ণিয়াতে ফুটোও হয়ে যেতে পারে।

এর চিকিৎসা হিসাবে প্রথমেই দেখা উচিত কী কারণে চোখের কর্ণিয়ায় প্রদাহ ঘটেছে। সেটা বোঝা গেলে তার থেকে রেহাই পেতে হবে। চোখ ভালোভাবে নর্মাল স্যালাইন দিয়ে পরিষ্কার করা দরকার। অ্যান্টিসেপটিক অথবা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের ফোঁটা চোখে বার বার দিতে হবে। এতে অ্যাট্রোপিন ফোঁটা সব সময়েই দেওয়া হয়। তাতে চোখের সিলিয়ারি মাংসপেশীর বিশ্রাম ঘটে এবং iritis-জনিত উপসর্গ থেকে রোগী রেহাই পায়।

যদি চিকিৎসায় কোন কাজ না হয়, যদি চোখের মধ্যকার প্রেসার অত্যধিক বেড়ে যায়, চোখে অত্যধিক ব্যথা অনুভূত হয় তবে paracentesis করাই বাঞ্ছনীয়। চোখের সামনের চেম্বারে যদি পুঁজ জমে থাকে তবে paracentesis করে বের করে দেওয়া হয়।

এ ছাড়াও রোগীকে কালো চশমা পরতে দেওয়া ভালো। মাঝে মাঝে গরম সেঁক দিলেও উপকার পাওয়া যায়। চোখে কখনই ব্যান্ডেজ বেঁধে রাখা উচিত নয়। এ ছাড়াও প্রয়োজনবোধে thermocautery অথবা electrocautery করার দরকার হতে পারে।

চোখের হারীপস জস্টার :

এই অসুখে gasserian ganglion জলবসন্তের মত ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। এই ভাইরাস ট্রাইজেমিনাল নার্ভের অফথালমিক ডিভিসনের নানান স্নায়ুতে সংক্রমিত হয়। এই সব নার্ভসংশ্লিষ্ট চামড়ায় এবং চোখেও ছোট ছোট ফোস্কা দেখা দেয়। অনেক নার্ভ বিশেষতঃ সুপ্রাঅরবিটাল নার্ভ, সুপ্রাট্রকলীয়ার নার্ভ, ইনফ্রাট্রকলীয়ার নার্ভ আক্রান্ত হয়। ইনফ্রাঅরবিটাল নার্ভেও এই

অসুখ হতে পারে। সাধারণতঃ একদিকেই এই অসুখ হয়। তবে দৈবাৎ দুই দিকেও হতে পারে।

প্রথমদিকে রোগীর জ্বর হয়, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে। ফোস্কা ওঠার আগেই প্রচন্ড নিউর‍্যালজিক ব্যথা শুরু হয়। ফোস্কা বের হবার পর অনেক সময় ব্যথা কমে যায়। আবার অনেক সময় ফোস্কা সেরে যাবার পরেও এই ধরনের প্রচন্ড ব্যথা মাসের পর মাস চলতে থাকে। চোখের পাতার চামড়া এবং অন্যান্য জায়গাও লাল হয়ে ওঠে, ফুলে ওঠে। ফোস্কায় অনেক সময় পুঁজ জমে যায়। সেই ফোস্কা থেকে রক্তক্ষরণ হতেও দেখা যায়। সেরে যাবার পর ছোট ছোট গর্ত এবং সাদা দাগ থেকেই যায়।

প্রথমদিকে ফোস্কা ওঠা পর্যন্ত ২ বা ৩ সপ্তাহ লাগতে পারে। স্থানীয় চামড়ায় বিশেষ সাড় থাকে না। তার পরে চোখের নানান উপসর্গ দেখা দেয়। কর্ণিয়াতে ছোট ছোট দাগ দেখা দেয়, সেখানে ক্ষত হতে থাকে। কর্ণিয়াতে প্রদাহ দেখা দেয়। কর্ণিয়াতে সেসময় কোন সাড় থাকে না। চোখে iridocyclitis হয়, সেজন্যও প্রচন্ড চোখে ব্যথা হয়। এর সংগে optic neuritis এবং পরে scleritis পর্যন্ত হয়। অনেক সময় oculomotor, trochlear, abducent এবং facial নার্ভ পর্যন্ত আক্রান্ত হতে পারে।

এই অসুখের চিকিৎসা করা খুবই কঠিন এবং নিরাময় ঠিকমত সম্ভব নাও হতে পারে। প্রচন্ড ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ দিতে হবে। ব্যথা উপশমের জন্য pituitrin অথবা dihydro ergometrine দিলে উপকার হতে পারে। স্থানীয় জায়গায় অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগানো যেতে পারে। রোগীর চোখে এট্রোপিন দিতেই হবে। Hydrocortisone মলমও অনেক সময় দেওয়া হয়। রোগীকে বিশ্রাম দিতে হবে। রোগীকে ভালোভাবে ওষুধের সাহায্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে ভালো হয়।

রোগীর ফোস্কাগুলি খুব যত্ন সহকারে পরিষ্কার করে দিতে হবে। সালফা পাউডার দিয়ে ভালোভাবে dressing করারও দরকার হয়। শেষ পর্যায়ে deep x-ray therapy করা যেতে পারে। তবে এই অসুখের পরিণাম মোটের উপর ভালো নয়।

Acute Iritis :

এতে চোখের iris-এ প্রদাহ হয়। এর সংগে ciliary bodyতেও প্রদাহ হতে পারে। এই অসুখে প্রদাহজনিত exudate চোখের সামনের চেম্বারে চলে আসে। সেই exudate-এ অনেক সময় পুঁজ বেশী থাকে, আবার অনেক সময় রক্তও (hyphemia) থাকতে পারে। আবার fibrinous exudate-ও হতে পারে।

এই প্রদাহে চোখে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। সাধারণতঃ ট্রাইজেমিনাল নার্ভের থেকেই ব্যথা হয়। চোখ ছাড়াও কপালে, মুখে, দাঁতেও এই ব্যথা নির্দেশিত হতে পারে। এই ব্যথা রাত্রের দিকে অসহ্য হয়ে ওঠে। চোখ লাল হয়ে ওঠে। আক্রান্ত চোখের দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়, কেননা সামনের চেম্বারে exudate জমা থাকে এবং অক্ষিতারকা ছোট হয়ে থাকে। চোখ দিয়ে জল গড়াতে দেখা যায় এবং রোগী বেশী আলো সহ্য করতে পারে না ।

এই অসুখে কর্ণিয়া মোটামাটি ঠিকই থাকে, তবে সামনের চেম্বার খুব ঘোলাটে দেখায়। অক্ষিতারকা ছোট থাকে। Iris তার রঙের স্বাভাবিকত্ব হারায়। Ciliary bodyর কাছে চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়।

এই iritis-এর চিকিৎসা খুবই জরুরী। ব্যথ্যর জন্য নানাধরনের ব্যথা উপশমকারী ওষুধ যেমন অ্যাসপিরিন, কোডোপাইরিন ইত্যাদি দেওয়া হয়। মরফিন দেওয়া উচিত নয় কেননা এতে pupil আরও ছোট হয়ে যায়। চোখে গরম সেঁক দিলে চোখের congestion কমতে সাহায্য হয়। এট্রোপিন ফোঁটা বা মলম হিসাবে চোখে দিতে হবে। এতে চোখের pupil বড় হয়ে থাকে। অনেক সময় কর্টিশোন দেওয়া হয়। সালফোনামাইড বা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে।

সামনের চেম্বারে exudate বের করে দেওয়ার জন্য অনেক সময় paracentesis করার দরকার হয়। সিফিলিস, গণোরিয়া, যক্ষ্মা বা বহুমূত্র রোগের উপসর্গ হিসাবে এই iritis হলে আসল অসুখের পর্যাপ্ত চিকিৎসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। রোগীর খাওয়া-দাওয়ার দিকে ভালো নজর রাখতে হবে। রোগীর চোখেরও বিশ্রাম দরকার। পড়াশোনা বা সামনে দেখার কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখাই শ্রেয়।

Acute cyclitis :

চোখের ciliary body-তে প্রদাহের ফলে এই অসুখ হয়। এই প্রদাহের সংগে কিছু না কিছু iris-এ প্রদাহ থাকেই। অনেক অসুখের উপসর্গ হিসাবে বিশেষতঃ সিফিলিস, গণোরিয়া, টিউবারকিউলোসাস বা বহুমূত্র রোগে এই অসুখ দেখা দেয়। কর্ণিয়ার ক্ষত ফুটো হয়ে অথবা চোখের আঘাতেও এই iridocyclitis হতে পারে।

এই প্রদাহ দুই ধরনের হতে পারে। প্রদাহজনিত exudate যদি serous হয়, তবে তাকে serous cyclitis বলে। আবার exudate যদি খুব বেশী fibrinous হয়, তবে তাকে plastic cyclitis বলে।

এই iridocyclitis-এ চোখ লাল হতে পারে, চোখে ব্যথা হয়। চোখের সামনে কালো দাগ ভাসতে থাকে—রোগীর এমন মনে হয়। রোগীর আক্রান্ত চোখের দৃষ্টিশক্তিও ব্যাহত হয়। চোখে চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে। চোখের aqueous এবং vitreous আর ঠিক স্বচ্ছ থাকে না। এই অসুখের প্রথমদিকে চোখের মধ্যকার প্রেসার বেড়ে যেতে পারে আবার শেষদিকে প্রেসার কমে যায়। প্রথম পর্যায়ে কর্ণিয়া স্বচ্ছ থাকলেও পরে কর্ণিয়া hazy হয়ে পড়ে। ঠিক মত চিকিৎসা না হলে রোগীর আক্রান্ত চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এই iridocyclitis-এর চিকিৎসায় চোখে গরম সেঁক দেওয়া যেতে পারে। রোগীর চোখে এট্রোপিন ফোঁটা বা মলম হিসাবে দিতে হয়। Cortisone দেওয়া যেতে পারে। অ্যাণ্টিবায়োটিক ওষুধও দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে ব্যথা-নিবারক ওষুধও লাগাতে পারে। চোখের পরিপূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া দরকার। আনুষংগিক অসুখ থাকলে যেমন সিফিলিস, গণোরিয়া, যক্ষ্মা বা বহুমূত্র রোগের পর্যাপ্ত চিকিৎসা হওয়াও দরকার।

প্যানঅফথ্যালমাইটিস (Panophthalmitis) :

একই সময়ে চোখের সব জায়গাতেই প্রদাহ হলে এই প্যানঅফথ্যালমাইটিস হয়। অনেক কারণেই এই ধরনের প্রদাহ হতে পারে। চোখে কোন আঘাত লাগলে, injury হলে, চোখে কোন ক্ষত হলে, কর্ণিয়াতে ফুটো হয়ে গেলে, এই ধরনের প্রদাহ হতে পারে। শরীরের অন্য কোন জায়গায়

পায়। মাঝে মাঝে মাথাব্যথা করে। এই সময়ে চোখের মধ্যকার প্রেসার কিন্তু বেড়ে ৪০ মিলিমিটার পারদচাপের মত হতে পারে। বেশী ভয়-ভাবনায়, strain হলে বা অত্যধিক পরিশ্রমে এই প্রেসার আরও বেড়ে যেতে পারে এবং উপসর্গও বাড়তে পারে। বিশ্রাম এবং ঘুমে এই প্রেসার কিছুটা কমে যায় এবং এতে রোগের কিছুটা উপশম হয়।

এই সময়ে পর্যাপ্ত চিকিৎসা না হলে উপসর্গ বাড়তেই থাকে। চোখ লাল হয়ে ওঠে, অত্যন্ত যন্ত্রণা হতে থাকে। যন্ত্রণা হঠাৎ আরম্ভ হয় এবং ট্রাইজেমিনাল নার্ভের গতিপথেই হতে দেখা যায়। কর্ণিয়া ফুলে যাওয়ায় দৃষ্টিশক্তিও ব্যাহত হয়। রোগীর চোখের পাতাও ফুলে যেতে পারে। কর্ণিয়া এবং conjunctiva-তেও ফোলা থাকে। চোখের সামনের চেম্বার খুবই অগভীর থাকে, অ্যাংগেলও খুব সরু থাকে। অক্ষিতারকা প্রসারিত হয়ে পড়ে। Intraocular প্রেসার অত্যধিক বেড়ে যায়। চোখ পাথরের মত শক্ত হয়ে পড়ে। সিলিয়ারি বডি, আইরিশ, করয়েড, রেটিনা, অপটিক নার্ভ—এ সবেই atrophy বা degeneration হয় এবং তার ফলে রোগী অন্ধ হয়ে পড়ে। রোগী এসময় খুবই কাহিল হয়ে পড়ে। জ্বর হতে পারে, অত্যধিক যন্ত্রণায় বমি হতে পারে। রোগীর নাড়ীর গতিও দ্রুত হয়ে পড়ে।

এই অসুখের পরবর্তী উপসর্গ হিসাবে কর্ণিয়াতে ক্ষত হতে দেখা যায়, প্যানঅফথ্যালমাইটিস হয় এবং শেষে চোখ একেবারে শুকিয়ে যায় অর্থাৎ phthisis bulbi হয়।

এই ভয়ংকর অসুখের প্রথমদিকেই যথার্থ রোগ নির্ণয় করা একান্ত দরকার এবং সংগে সংগে পর্যাপ্ত চিকিৎসা করা দরকার যাতে চোখের মধ্যকার প্রেসার যথা-সম্ভব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে আসে। এটিকে সবসময়ই অত্যন্ত জরুরী বলে বিবেচনা করা উচিত।

প্রথমেই রোগীর চোখে eserine $\frac{1}{2}$ থেকে ১% দিতে হবে—প্রথমে ৫ মিনিট অন্তর প্রথম আধ ঘণ্টায় এবং তারপর আধ ঘণ্টা ছাড়া ছাড়া যতক্ষণ না রোগীর অক্ষিতারকা ছোট হয়ে আসে। রোগীর রক্তচাপ বেশী থাকলে কমানো দরকার—প্রয়োজনে তার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। রোগীকে যন্ত্রণা কমানোর জন্য অ্যাসপিরিন, মরফিন, পেথিডিন ইত্যাদি দিতে হবে। গরম সেঁক চোখে দিলে রোগী অত্যন্ত আরাম বোধ করে। চোখের মধ্যকার প্রেসার কমানোর জন্য অনেক

ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়, যেমন শিরাপথে hypertonic গ্লুকোজ, acetazolamide tablet ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব চিকিৎসায় যদি intraocular প্রেসার কমে তবে চোখের যন্ত্রণা কমে যায় এবং আস্তে আস্তে কর্ণিয়াও স্বাভাবিক হয়ে আসে। এই সময় টোনোমিটার দিয়ে প্রেসার দেখা উচিত নয়, কেননা এতে কর্ণিয়াতে আঘাত লাগতে পারে। কিন্তু এতেও যদি প্রেসার না কমে, তবে বাধ্য হয়েই শল্যচিকিৎসা করতে হয়। সেক্ষেত্রে iridectomy করা হয়—এতে সংগে সংগে প্রেসার কমে যায় এবং তার ফলে ব্যথাও নিরাময় হয়।

Acute retrobulbar neuritis :

এই অসুখে চোখের পিছনে optic নার্ভের প্রদাহ ঘটে এবং এই প্রদাহ optic chiasma পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। অনেক অসুখের সংগে এই ধরনের neuritis দেখা যায় যেমন disseminated sclerosis, methyl alcohol অথবা thalium acetate বিষক্রিয়ায়, neuromyelitis optica ইত্যাদি। তবে স্থানীয় uveitis এবং retinitis বিস্তার লাভ করেও অপটিক নার্ভে প্রদাহ করতে পারে।

এই অসুখের উপসর্গ হঠাৎ দেখা দেয়। রোগী চোখে হঠাৎ বেদনা অনুভব করে এবং হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। রোগীর চোখে চাপ দিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। রোগী চোখ এদিক ওদিক ঘোরালেও ব্যথা পায়। রোগীর চোখে আলো ফেললে অক্ষিতারকা প্রসারিতই থাকে—ছোট হয় না। রোগীর মাথার যন্ত্রণাও হতে থাকে।

অনেক সংক্রামক অসুখে যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, measles, mumps ইত্যাদিতে, ডায়বিটিস অসুখে, গর্ভাবস্থায়, রক্তাল্পতায়, ভিটামিনের অভাবে ইত্যাদিতে অপটিক নার্ভের এই neuritis হতে পারে।

এই অসুখে রোগের কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা করা বিধেয়। Mercury, iodides এবং salicylates অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। A C T H ব্যবহার করাও হয়। Hydroxycobalamine অনেক সময় detoxicating agent হিসাবে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

পঞ্চম অধ্যায়
দাঁতের ব্যথা

দাঁতের বিভিন্ন অসুখে অনেক সময় ব্যথার সৃষ্টি হয়। দাঁতের ঠিক মাঝখানে ভিতরে pulp cavity থাকে। তার চারপাশে dentine। তারপর cement দিয়ে আবৃত থাকে এবং একেবারে বাইরে enamel দিয়ে ঢাকা থাকে। দাঁতের root চোয়ালের alveolus-এর সংগে যুক্ত থাকে। দাঁতের neek মাড়ির সংগে যুক্ত থাকে, আর বাইরের দেখা অংশটিকে দাঁতের crown বলে। দাঁতের শিরা, ধমনী, নার্ভ সবই root-এর apex দিয়ে দাঁতের ভিতর যায়।

দাঁতের বিভিন্ন প্রত্যংগে প্রদাহ ঘটলে বেশীর ভাগ সময়েই ব্যথা হয়। দাঁতের গোড়ায় পুঁজ জমলে বা ফোঁড়া হলেও ব্যথার সৃষ্টি হয়। দাঁতের ক্ষয় রোগে অর্থাৎ caries হলে প্রায়শই দাঁতের ব্যথা হয়। তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে দাঁত নড়তে থাকলে, খাবার চিবানোর সময় সেই আলগা দাঁতের নড়াচড়ার ফলে দাঁতে ব্যথা হতে দেখা যায়।

দাঁতের কয়েকটি অসুখ বিশেষতঃ যেগুলি ব্যথা উদ্রেক করে সেগুলির সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করা দরকার।

দাঁতের এনামেলের কিছু অসুখ :

দাঁতের এনামেল অনেক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায়। বাইরের কোন আঘাতে, চিবানোর সময় হঠাৎ অত্যধিক প্রেসারে দাঁতের এনামেল ভেঙে যেতে পারে। অত্যধিক ঘর্ষণের ফলে দাঁতের এনামেলে abrasion বা erosion ঘটতে পারে। তামাক, পান ইত্যাদি ব্যবহার করার ফলে, শক্ত ধরনের খাবার চিবানোর ফলেও দাঁতের এনামেলে erosion হতে পারে। এতে দাঁত খুব sensitive থাকে। ফলে গরম বা ঠান্ডা খাবার বা পানীয় এই সব দাঁতে লাগলে শির শির করে এবং অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থা হয়। এই erosion বাড়তে থাকলে পরে ব্যথাও হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় সিলভার নাইট্রেট বা নাইট্রিক এসিড লাগানো হয় অথবা বৈদ্যুতিক cautery করারও দরকার হতে

পারে। এতেও যদি ভালো কাজ না হয়, তবে সেই সব আক্রান্ত জায়গায় excavate করে ভালোভাবে filling করে দেওয়া উচিত। প্রয়োজনে পাল্পকে devitalise করাও হয়ে থাকে। Erosion যদি খুব বেশী হয়ে থাকে, তবে অনেক সময় সোনার অথবা পোর্সিলেনের inlay পরিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনে crownও তৈরি করে দেওয়া হয়। Silicate বা acrylic filling করলেও উপকার হয়, তবে যাতে খারাপ দেখতে না হয় সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়া উচিত।

দাঁতের caries বা ক্ষয় রোগ :

সাধারণভাবে আমাদের দেশে একে দাঁতে পোকা লাগা বলে। দাঁতের এই ক্ষয় রোগের প্রকৃত কারণ কি তা বোঝা খুবই দুষ্কর। তবে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ধরনের দাঁতের ব্যথা খুবই হয়। সাধারণতঃ দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে শর্করা জাতীয় খাদ্যকনা জমে থাকে সেগুলি নানাধরনের জীবানু দ্বারা fermentation হয়। তার ফলে দাঁতের এনামেল এবং ডেন্টিনে decalcification হয়। এতে দাঁতের গায়ে নোংরা জিনিষের সংগে অম্লজাতীয় পদার্থও লাগতে থাকে। এর ফলেই দাঁতের caries বা ক্ষয় রোগ হয়। অবশ্য অন্য মতে এও বলা হয় যে প্রাথমিকভাবে দাঁতের এনামেলের organic matrix নানাধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরবর্তী সময় inorganic matrixও নষ্ট হতে থাকে। অবশ্য দুই ধরনের মতেই এটি নিশ্চিত যে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত রোগ এই দাঁতের caries।

যারা দাঁতের স্বাস্থ্যবিধি ঠিকমত মানে না, মুখ ঠিকমত পরিষ্কার করে না, মুখে ময়লা জমেই থাকে তাঁদের এই অসুখ বেশী হয়। খাদ্যের মধ্যে আমিষজাতীয় খাবার, ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন A যদি কম থাকে তবে দাঁতের এই ধরনের অসুখ হতে বেশী দেখা যায়। খাদ্যে ভিটামিন D এবং ফসফরাস কম থাকলেও এরকম হতে পারে।

রোগীর দাঁতে caries হলে খাবার সময় বিশেষতঃ গরম বা ঠান্ডা খাবারে, মিষ্টি বা অম্লজাতীয় খাবারে দাঁতে ব্যথা অনুভব করে। খাবার চিবানোর সময়ও ব্যথা হয়। এই ব্যথা সাধারণতঃ দাঁতের পাল্প অনাবৃত হওয়ার ফলে অথবা pericemental irritation-এর জন্যই হয়। আক্রান্ত দাঁতের প্রথমদিকে দাগ হয়, পরে erosion এবং গর্ত হতে পারে। এই দাঁতে চাপ দিলে ব্যথা

অনুভূত হয়। রোগী ব্যথার ভয়ে সেই আক্রান্ত দাঁত ব্যবহার করে না, তার ফলে সেই দাঁতে নোংরা tartar জমতে থাকে। সেই সব নোংরা থাকার জন্য মাড়িতেও প্রদাহ দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে দাঁতের গোড়া এবং মাড়ি থেকে পুঁজ নির্গত হয়—pyorrhoea alveolaris হয়। মুখের মধ্যে এই ধরনের sepsis থাকার জন্য অন্য অসুখ—বদহজম ইত্যাদিও হতে দেখা যায়। দাঁতের cavity বা গর্ত যদি খুব বেশী হয় তবে দাঁতের পাল্পেও প্রদাহ হতে পারে এবং তার ফলে অত্যধিক ব্যথা হয়। রোগীর cervical glandও এতে বড় এবং tender হতে পারে। পাল্পের প্রদাহ বেশী ধরনের হলে periodontal membrane-এ বিস্তার লাভ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত alveolar abscess হতে পারে।

দাঁতের এই caries প্রথম থেকেই যাতে না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। শিশুদের খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভিটামিন A এবং D, ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস থাকা একান্ত দরকার। রোগীর খাদ্যের সংগে ফ্লোরিন থাকাও দরকার। দাঁতের স্বাস্থ্যবিধি সকলের মেনে চলা উচিত। খাবার খাওয়ার পরে দাঁত ভালোভাবে পরিষ্কার করা উচিত। ঠিকমত ভালো টুথপেষ্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করা উচিত। অত্যধিক চিনি বা শর্করাজাতীয় খাদ্য, বিশেষতঃ যে সব খাবার দাঁতে বিশেষভাবে আটকে যায়, সেসব যতটা সম্ভব বর্জন করাই শ্রেয়। দাঁতে যে কোন জিনিষ দিয়ে খোঁচানোও উচিত নয়। Tooth pick ব্যবহার করলে পরে ঐ স্থানে টিংচার আয়োডিন অল্প করে লাগানো উচিত।

এই caries-এর চিকিৎসা দন্তচিকিৎককে দিয়ে করানো উচিত। সিলভার নাইট্রেট অথবা সোডিয়াম ক্লোরাইড দাঁতে লাগানো হয়। ছোট ফাটা (fissure) বা গর্ত থাকলে ঠিকমত filling করার দরকার হয়। আনুষংগিক জীবাণু সংক্রামণ হলে প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যেতে পারে। অনেক সময় আক্রান্ত দাঁত তুলে ফেলারও দরকার হয়।

Dentin-এর hypersensitivity :

সাধারণতঃ দাঁতের dentin-এর কোন অনুভূতি থাকে না, তবে ডেন্টিনের আশেপাশে কোন প্রদাহ হলে বা অসুখ হলে এটি অস্বাভাবিক স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। রোগীর দাঁতে কোন cavity সেখানে তাপজাত উদ্দীপনা জাগলে,

ল্যাকটিক এসিড বা অন্য ব্যাকটেরিয়াজাত পদার্থের দ্বারা সংক্রমণ ঘটলে, আঘাত হলে আক্রান্ত দাঁতে অত্যধিক ব্যথা হয়।

আক্রান্ত দাঁত অম্লজাতীয়, লবনজাতীয় অথবা মিষ্টজাতীয় খাবারের সংস্পর্শে এলে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয় এবং সেই ব্যথা আশেপাশের অন্য জায়গাতেও নির্দেশিত হতে পারে। দাঁতে বা দাঁতের ফোকরে চাপ দিলেও ব্যথা হয়।

এই অসুখের গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা করা হয়। অনেক সময় শুষ্ক তাপ দিলে এবং অ্যালকোহল প্রয়োগ করলে উপকার হয়। অনেক সময় ঠান্ডা প্রয়োগ করলেও আক্রান্ত জায়গায় ব্যথা কমে যায়। ফেনল, ট্রাই-ক্লোরো এসিটিক এসিড, জিংক ক্লোরাইড, সিলভার নাইট্রেট স্থানীয় জায়গায় দিয়েও চিকিৎসা করা হয়। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ—কোকেন, প্রোকেন, লিগনোকেন দিয়েও ব্যথা নিরসনের চেষ্টা হয়। অত্যধিক ব্যথা কমানোর জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ যেমন মরফিন, ব্রোমাইড ইত্যাদিও দেওয়া যেতে পারে।

Pulpitis :

এতে দাঁতের pulp tissueতে প্রদাহ হয়। নানা কারণে এই ধরনের প্রদাহ হতে পারে। আঘাতজনিত কারণে, পাল্পের উপর অত্যধিক প্রেসারে, impacted দাঁতের প্রেসারে এই প্রদাহ হতে পারে। আবার জীবানু সংক্রমণ হয়েও এই pulpitis হয়।

এই প্রদাহে অত্যন্ত তীক্ষ্ন ধরনের ব্যথা হতে পারে। অনেক সময় দাঁতে দপ দপ করা ব্যথাও হয়। এই ব্যথা মাঝে মাঝে আসে, আবার খানিক পরে কমেও যায়। এই ব্যথা দাঁত ছাড়া অন্য জায়গাতেও নির্দেশিত হতে পারে। দাঁতে গরম বা ঠান্ডা লাগলে ব্যথা বেড়ে যায়। কিন্তু দাঁতে টোকা মারলে (percussion) ব্যথা হয় না। দাঁতের ফোকরে তুলা দিয়ে চাপ দিলে অত্যন্ত তীক্ষ্ন ধরনের ব্যথা হয়। শোয়া অবস্থায় ব্যথা বেশী হয়, তাই রোগীর ঘুম হয় না, রোগী সারারাত মেঝেতে চলাফেরা করে। মিষ্টি বা টক খাবারের সংস্পর্শে ব্যথা বেড়ে যায়।

এর চিকিৎসায় দন্তচিকিৎসকের পরামর্শমত দাঁতের নরম এবং খারাপ ডেন্টিন পরিষ্কার করে দিতে হবে। ভালোভাবে উষ্ণ জল বা স্যালাইন দিয়ে পরিষ্কার করে

ধ্বতে হবে। পাল্পের রক্ত সরবরাহ একটু কমাতে পারলে ভালো হয়। ব্যথা উপশমের জন্য ব্যথানিবারক ওষ্বধ দিতে হতে পারে। ঘ্বমের ওষ্বধ দিতেও হয়। স্থানীয় দাঁতের জায়গায় ফেনল, ইউজিনল বা লবংগের তেল দিলে ভালো উপকার হয়। প্রয়োজনবোধে অনেক সময় শল্যচিকিৎসার দরকার হয়। অ্যান্টিবায়োটিক ওষ্বধ জীবানু সংক্রমণ প্রশমণে দেওয়া হয়।

Pulp-এ ফোঁড়া :

Pulp-এ জীবানু সংক্রমণে প্রদাহ হয় এবং শেষে সেখানে প্বঁজ জমে। এই ভাবেই পাল্পে ফোঁড়া হয়। এতেও দাঁতে প্রচন্ড ব্যথা হয়। এই ব্যথা ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকে এবং অন্য দাঁতেও এই ব্যথা ছড়িয়ে পড়তে পারে। ঠান্ডা প্রয়োগে এই ব্যথা কিছুটা কমে। দাঁতে টোকা দিলেও দপদপ করা ব্যথা অন্বভূত হয়। এর ঠিকমত চিকিৎসা না হলে এই জীবানু সংক্রমণ পাল্পকে একেবারে নষ্ট করে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত alveolar abscess-এ পরিণত হয়।

এর চিকিৎসায় পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। ব্যথা উপশমের জন্য ব্যথানিবারক ওষ্বধ দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে শল্যচিকিৎসার দ্বারা প্বঁজ বের করে দিতে হয়।

Apical abscess :

দাঁতের root-এর apex-এ জীবানু সংক্রমণের ফলেই এই ধরনের ফোঁড়া হয়। এই সংক্রমণ একমাত্র তখনই হয়, যখন পাল্প একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য extensive caries হলেও এই apical abscess হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও দাঁতে এবং মাড়িতে প্রচন্ড ব্যথা হয়। দাঁতের x-ray করলে রোগ নির্ণয় সহজ হয়।

এর চিকিৎসায় অপারেশন করে pulp canal থেকে প্বঁজ বের করে দিতে হবে। তার পর সেই স্থানীয় জায়গা ফর্মালিন, অ্যামোনিয়াযুক্ত সিলভার নাইট্রেট অথবা পেনিসিলিন সলিউশন দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে ডায়াথার্মিও করা হয়। পরে উপযুক্ত filling করা যেতে পারে। কিন্তু পরিস্থিতি খ্বব খারাপ হলে দাঁত তুলে দিতে হবে এবং দাঁতের সকেটটি ভালো-ভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক ঠিকমত দিতে হবে।

Moist gangrene of the pulp : পাল্পের আর্দ্র পচন :

এই অসুখে দাঁতের পাল্প জীবাণু সংক্রমণের ফলে নষ্ট হয়ে যায় এবং এতে পচনের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ স্ট্যাফাইলোকক্কাস অথবা স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া দিয়েই সংক্রমণ ঘটে।

আক্রান্ত দাঁতটি দেখতে কালো রঙের হয়ে যায়। পাল্পের কোন vitality থাকে না। দাঁতের মধ্যে drill করলে অথবা filling খুলে দিলে দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে। দাঁতে টোকা দিলেও ব্যথা অনুভূত হয়। দাঁতটি যদি মোটামুটি ঠিক থাকে তবে ঠান্ডায় ব্যথা কমে যায়। কিন্তু গরম খাবার বা পানীয়ের সংস্পর্শে আক্রান্ত দাঁতে প্রচন্ড ব্যথা হয়, কেননা গরমের প্রভাবে দাঁতের মধ্যকার গ্যাস বিস্তার লাভ করে এবং ব্যথার সৃষ্টি করে। এই অসুখের আগে দাঁতের পাল্পে প্রদাহ, ক্ষত এবং ফোঁড়া থাকে।

এই অসুখে দন্ত চিকিৎসকের সংগে পরামর্শ করা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসা করতে হবে—অপারেশনের সাহায্যে পুঁজ এবং অন্যান্য পচনজাত জিনিষ বের করে দিতে হবে। সেই জায়গা ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে এবং জীবাণুমুক্ত করে দিতে হবে। অ্যামোনিয়াযুক্ত সিলভার নাইট্রেট এবং ফর্মালিন দাঁতের ফোকরে দেওয়া যেতে পারে। পরে উপযুক্ত filling করা যেতে পারে।

Pericementum-এর নানা অসুখ :

দাঁতের cement-এ এবং তার আশেপাশে অনেক সময় প্রদাহের সৃষ্টি হয়। বাইরে থেকে দাঁতের উপর আঘাতে, অত্যধিক কঠিন জিনিষ দাঁত দিয়ে কামড়ানোর সময়, দাঁতের মাড়িতে কোন caustic দ্রব্য লাগানোর ফলে, দাঁতের অপারেশনে বা filling করার পরে এই ধরনের প্রদাহ হতে পারে।

এই ধরনের প্রদাহে দাঁতে ব্যথা হয়, কোন রকমের চাপ দাঁত সহ্য করতে পারে না। এর সংগে মাড়িতেও প্রদাহ থাকে, মাড়ি ফুলে ওঠে। প্রয়োজনে দাঁতের x-ray করতে হয় এবং তাতে রোগ নির্ণয় সহজ হয়।

এর চিকিৎসায় প্রথমেই যে কারণে এই প্রদাহ হচ্ছে তা নির্মূল করা উচিত। মাড়িতে এ্যকোনাইট টিংচার অথবা ক্লোরোফর্মমিশ্রিত মেন্থল লাগালে উপকার হয়। মুখে ঠান্ডা বরফ লাগালে রোগী আরাম পায়। রোগীকে বিশ্রামে রাখা দরকার।

আক্রান্ত মাড়ি থেকে অনেক সময় রক্তক্ষরণ হতে পারে। অসুখের শেষ পর্যায়ে জিভ এবং গাল ফুলে যেতে পারে। পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া দরকার। ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধও লাগে। মুখে গরম অ্যান্টিসেপটিক সলিউশন-যুক্ত জলে বার বার girgle করলেও উপকার পাওয়া যায়।

Periodontal abscess :

দাঁতের মাড়িতে প্রদাহ বা pyorrhoea হলে সেই জীবাণু সংক্রমণ alveolus পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে। সেখানে পুঁজের সৃষ্টি হয়, দাঁতের মাড়ি ফুলে ওঠে এবং মাড়ির পাশ দিয়ে অনেক সময় সেই পুঁজ বের হতে থাকে। Apical abscess থেকেও এই ধরনের ফোঁড়া হতে পারে।

এই অসুখে দাঁতে প্রচন্ড ব্যথা হয়, দাঁতে চাপ দিলেই ব্যথা হয়। যদি সময় মত চিকিৎসা না করা হয় তবে অনেক সময় sinus-এর সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে পুঁজ পড়তে প্রায়ই দেখা যায়। অনেক সময় এই অসুখে দাঁতের পাল্পও একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও দাঁতের একটি x-ray করা দরকার।

এই অসুখের চিকিৎসায় সেই ফোঁড়া থেকে শল্যচিকিৎসায় পুঁজ বের করে দিতে হবে এবং সেই স্থান সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করে রাখা দরকার। অনেক সময় বৈদ্যুতিক cauteryও করা হয়। আবার ৫% বোরেট দিয়ে এই স্থানে গজ দিয়ে প্যাক করাও হয়। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধও দেওয়া যেতে পারে। মাঝে মাঝে গরম সেঁক দেওয়াও যায়।

দাঁত তোলার পর ব্যথা বেদনা :

দাঁত তোলার সময় সাধারণতঃ লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দিয়ে নেওয়া হয়। সুতরাং মোটামুটিভাবে দাঁত তোলার সময় ব্যথা লাগে না। তবে অ্যানেস্থিসিয়ার effect চলে যাওয়ার পর অনেক কারণেই রোগী ব্যথা বেদনা অনুভব করতে পারে। দাঁত তোলার সময় periosteum ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বিশেষতঃ যখন সূচ periosteum-এ আঘাত করে। দাঁত তোলার পর স্থানীয় জায়গায় এমন কি হাড়েও জীবাণু সংক্রমণ ঘটতে পারে। Alveolus-এর তীক্ষ্ন কোন খাঁজ যদি নরম অন্য পেশীতে বেশী irritate করে তবে ব্যথা হতে পারে।

ঠিক কি কারণে ব্যথা হচ্ছে তা নির্ণয় করা দরকার এবং যথাসম্ভব সে

কারণগুলি দূর করা দরকার। প্রয়োজনমত ব্যথা বেদনা উপশমকারী ওষুধ—অ্যাসপিরিন, কোডোপাইরিন ইত্যাদি ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। ঠান্ডা কিছু প্রয়োগ করলেও ব্যথা খানিক উপশম হয়। গরম সেঁক না দেওয়াই ভালো কেননা এতে রক্তের জমাট clot ভেঙে যায় এবং ফোঁড়া হওয়ার সূচনাও হতে পারে। দাঁতের ফাঁকা সকেটে অনেক সময় বোরেট ভেজানো গজে প্যাক করে রাখলে ভালো হয়। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধও এতে দেওয়া যেতে পারে।

আক্কেল দাঁতের ব্যথা (Eruption of wisdom teeth) :

সাধারণভাবে দাঁত ওঠার সময় রোগীর কোন ব্যথা বেদনা হয় না। তবে নীচের পাটির এবং উপরের পাটির তৃতীয় মোলার দাঁত ওঠার সময় যথেষ্ট ব্যথা বেদনা হতে পারে। নীচের তৃতীয় মোলার দাঁত ওঠার সময় সব থেকে বেশী ব্যথা হতে দেখা যায়। উপরের পাটির তৃতীয় মোলার দাঁত ১৭ থেকে ২০ বৎসর বয়সে উঠতে দেখা যায়, আর নীচের পাটির তৃতীয় মোলার দাঁত ১৬ থেকে ২০ বৎসর বয়সে উঠে। তবে এর কমবেশী হতে পারে, মোটামুটি ১৮ থেকে ২৪ বৎসর বয়সে দুইটি wisdom দাঁতই উঠে যায়। এদের root ২০ বছর বয়সে মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়।

এই দাঁত ওঠার সময় স্থানীয় মাড়িতে ভীষণ ব্যথা হয়। মুখ ফুলে ওঠে এবং ব্যথার চোটে রোগী মুখ খুলতে পারে না। রোগী শক্ত জিনিস চিবিয়ে খেতে পারে না—ব্যথা অনুভব করে। এর সংগে জীবানু সংক্রমণ ঘটলে জ্বরও হতে পারে।

এক্ষেত্রে দন্তচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি মাড়ি থেকে দাঁত ঠিক মত বের হতে না পারে, তবে উপরকার মাড়ির পেশীতে incision দিয়ে দিতে হয়—যাতে দাঁতটি সহজভাবে বেরিয়ে আসতে পারে। অনেক সময় বৈদ্যুতিক cautery দিয়ে মাড়িতে cauterise করাও হয়ে থাকে। রোগীর মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করিয়ে দিতে হয়। প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হতে পারে। তবে যদি জীবানু সংক্রমণ হতেই থাকে, সে দাঁত তুলে ফেলাই শ্রেয়। দাঁত তোলার আগে দাঁতের একটি x-ray করার দরকার এবং দাঁত তোলার আগে এবং পরে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিয়ে যেতে হবে। অনেক সময় এমনও করা হয় যে পাশের দ্বিতীয় মোলার দাঁতটি তুলে দিতে হয় যাতে তৃতীয় মোলার দাঁতের বের হবার পথ সুগম হয়।

চোয়ালের নানা ধরনের অসুখ

Maxilla প্রত্যক্ষ আঘাতে ভেঙে যেতে পারে এবং এর সংগে nasal, malar এবং lacrymal হাড়ও ভাঙতে পারে। মুখের চামড়ায় কোন ক্ষতি না হলেও মুখের অভ্যন্তরে ছিঁড়ে বা কেটে যেতে পারে। অনেক সময় জীবানু সংক্রমণের ফলে প্রদাহ এবং হাড়েও ক্ষয় হতে পারে। এমনিতে জীবানু সংক্রমণ না হলে তাড়াতাড়ি সেরে যায়। প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসা করাতে হতে পারে। তবে প্রথমদিকে এতে খুবই যন্ত্রণা হতে পারে এবং তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা নিতে হয়।

নীচের চোয়ালে বা mandible-ও প্রত্যক্ষ আঘাতে ভেঙে যেতে পারে। তবে অন্যভাবেও ভেঙে যাওয়া অসম্ভব নয়। এই চোয়ালের হাড়ের অনেক জায়গাতেই ভেঙে যেতে পারে। এতেও যথেষ্ট ব্যথা হয়, মুখ ফুলে ওঠে, রোগী মুখ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে না। মুখের চেহারা বদলে যায়। দাঁতের alignment ঠিক থাকে না। দু'একটি দাঁত ভেঙেও যেতে পারে। Inferior dental নার্ভও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তাতেও ব্যথা হয়। অন্যান্য হাড়ের ফ্র্যাকচারের মত এখানেও ভাঙা হাড়কে ঠিকমত জায়গায় বসাতে হবে, হাড়গুলি যাতে নড়াচড়া করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং আশেপাশের জায়গায় কাজ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ভাঙা দাঁতগুলি বের করে দিতে হবে। অত্যধিক ব্যথার জন্য ব্যথা উপশমকারী ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসার সাহায্যে dental splint, interdental splint বা bone pin দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

চোয়ালের হাড়ে নানাধরনের জীবানু সংক্রমণ ঘটতে পারে এবং অনেক সময় হাড়ে পচন বা necrosis হতেও পারে। সেসব ক্ষেত্রে চোয়ালে প্রচন্ড ব্যথা হতে পারে। বিশেষতঃ দাঁতের এবং মুখের জীবানু সংক্রমণ থেকে চোয়ালের হাড়ে osteomyelitis হতে পারে। এই সংক্রমণের প্রথমদিকে রোগীর দাঁতের দিকে যন্ত্রণা হয়। রোগী ভালোভাবে এবং শক্তভাবে মুখ বা চোয়াল বন্ধ করতে পারে না। রোগীর জ্বর হয়। রোগীর মুখ ফুলে যেতে পারে এবং রোগী মুখ ভালোভাবে খুলতেও পারে না। চোয়ালে প্রদাহের জায়গায় পুঁজ জমে যায়—ফোঁড়ার সৃষ্টি হয়। তা থেকে অনেকগুলি sinus হতে পারে এবং সেখান থেকে পুঁজ গড়াতে

দেখা যায়। এদের মুখেও অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, দাঁতগুলি নড়তে থাকে, অত্যধিক লালা নিঃসরণ হয়। রোগী অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ে। এই সব অসুখের প্রথমদিকেই যথেষ্ট চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। ভালোভাবে মুখ পরিষ্কার করানো দরকার। প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া দরকার। দরকার মত শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থাও করা দরকার।

Temporo-mandibular joint-এর প্রদাহের ফলেও রোগীর ব্যথা বেদনা এবং যন্ত্রণা হতে পারে। রিউম্যাটিক জ্বরের সময় রোগীর এই ধরনের synovitis হতে দেখা যায়। এতে সন্ধিস্থলে জল জমে যায় এবং রোগীর trismus হয় অর্থাৎ মুখ খুলতে পারে না। কখনও কখনও এই সন্ধিস্থলে arthritis হতেও দেখা যায়। প্যারোটিড গ্রন্থির প্রদাহের পর অথবা middle ear-এর প্রদাহের পর এই সন্ধিস্থলেও প্রদাহ সংক্রামিত হতে পারে এবং সেখানে পুঁজ জমতে পারে। এ সব ক্ষেত্রেও বিধিমত চিকিৎসা করা বাঞ্ছনীয়।

Parotitis (প্যারোটিড গ্রন্থির প্রদাহ) :

সাধারণতঃ মুখের মধ্য থেকে Stenson's duct দিয়েই এই ধরনের প্রদাহ প্যারোটিড গ্রন্থিতে হতে দেখা যায়। অপারেশনের পরে মুখ যখন প্রায়শই শুকনো থাকে এবং রোগী মুখ দিয়ে বিশেষ খাবার খায় না বা চিবোয় না তখন তার প্যারোটিড গ্রন্থিতে প্রদাহ হতে পারে। এর duct-এ কোন পাথুরি দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলেও এই ধরনের প্রদাহ হয়। এই অসুখ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিশুদের এবং মেয়েদের হতে দেখা যায়।

রোগীর একটি গ্রন্থি আবার কখনও কখনও দুই গ্রন্থিই একসংগে আক্রান্ত হতে পারে। এই গ্ল্যান্ড খুব বড় হয়, ফুলে ওঠে, এর উপরের চামড়া লাল হয়ে পড়ে। এখানে চাপ দিলে রোগী অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করে। খুব বেশী আক্রান্ত হলে এই গ্রন্থির মধ্যে পুঁজ জমতে থাকে। রোগীর জ্বর হয়। রোগীর মুখ সাধারণতঃ অপরিষ্কার থাকে, জিভ শুকনো থাকে। জিভে ময়লা জমতে থাকে। রোগীর আক্রান্ত জায়গায় খুবই যন্ত্রণা হয়। রোগীর মুখ খুলতে কষ্ট হয়। রোগীর খাবার খেতে এবং চিবোতেও যন্ত্রণা হয়। আশে পাশের অন্য গ্রন্থিও প্রদাহের ফলে বড় হয়ে পড়ে এবং চাপ দিলে ব্যথা হয়। প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে জোরে চাপ দিলে তার duct-এর মুখ দিয়ে পুঁজ অথবা

ঘোলাটে রস বের হতে থাকে। সাধারণতঃ স্ট্রেপটোকক্কাস অথবা স্ট্যাফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া দিয়ে এই প্রদাহের সৃষ্টি হয়।

এই অসুখের চিকিৎসায় স্থানীয় জায়গায় গরম সেঁক দিলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণে পেনিসিলিন দিতে হয়। অ্যান্টিসেপটিক সলিউশন যুক্ত গরম জলে girgle করানো উচিত। তরলজাতীয় খাদ্য দেওয়া উচিত। ফোঁড়া হয়ে গেলে শল্যচিকিৎসায় পুঁজ বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা এই পুঁজ নানা জায়গা দিয়ে বেরুতে পারে—যেমন কানের মধ্যে দিয়ে, pharynx-এ, গলার মাংসপেশীর মধ্য দিয়ে এবং এমন কি mediastinum-এর মধ্যেও বের হতে পারে।

Mumps :

এটি একটি সংক্রামক ব্যাধি, সাধারণতঃ ভাইরাস দিয়েই প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে সংক্রামিত হয়। অন্য সব salivary গ্রন্থিও একই সময়ে আক্রান্ত হতে পারে। যে কোন লোকের, যে কোন দেশে এবং যে কোন আবহাওয়ায় এই অসুখ হতে পারে। একজনের অসুখ হলে অন্য লোকেও সংক্রামিত হতে পারে। সাধারণত শীতকালে এবং বসন্তকালে এই অসুখ বেশী দেখা যায়।

রোগীর শরীরে ভাইরাস ঢোকার পর রোগাক্রান্ত হতে ২১ দিন থেকে ৩৭ দিন পর্যন্ত দেরী হতে পারে। প্যারোটিড গ্রন্থি খুবই বড় হয়ে পড়ে। স্থানীয় জায়গার অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হয়। সেখানে চাপ দিলেও রোগী ব্যথা পায়। রোগীর massetar মাংসপেশীসমূহে বেশ টান থাকে। রোগীর জ্বর হয়, গলা ব্যথাও থাকে। প্যারোটিড গ্রন্থিতে বেশ ফোলা থাকে এবং এই ফোলা কানকেও উপরের দিকে তুলে ধরে। স্থানীয় চামড়া বেশ লাল হতে পারে এবং সেখানেও ফোলা থাকতে পারে। কয়েকদিনের মধ্যেই এই ফোলা কমে যেতে থাকে। অন্যদিকের প্যারোটিড গ্রন্থি এবং এমনকি অন্য salivary গ্রন্থিও ৪ বা ৫ দিনের মধ্যে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। দুইদিকের গ্রন্থি এক সংগে আক্রান্ত হলে রোগী খুব কাহিল হয়ে পড়ে। রোগীর জ্বর হতে পারে। রোগী ভুল বকতে পারে। নাড়ীর গতি দ্রুত হয় এবং রক্তচাপ অত্যধিক কমে যেতে পারে। রোগী মুখ খুলতে পারে না, খেতে, ঢোঁক গিলতে বা চিবুতে খুবই যন্ত্রণা অনুভব করে। রোগীর pharyngitis এবং টনসিলের প্রদাহ থাকতে পারে।

এই অসুখের খারাপ উপসর্গ হিসাবে orchitis, pancreatitis এবং meningitis পর্যন্ত হতে পারে। তবে সাধারণতঃ এই প্রদাহে গ্রন্থির ভিতরে পুঁজ জমে না। প্যারোটিড গ্ল্যান্ড দু' এক মাসের মধ্যে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। কখনও কখনও একবার আক্রান্ত হলেও আবার আক্রান্ত হতে পারে।

Mumps-এ গ্রন্থি ফোলার দু' এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত খুবই সংক্রামক থাকে। অন্ততঃ ২ সপ্তাহ রোগী আলাদা করে isolation-এ রাখা উচিত। এ সময় অন্য লোকের সংস্পর্শে না আসাই শ্রেয়। রোগীকে ভালো আলোবাতাস-যুক্ত ঘরে রাখা দরকার। ভালো খাবার-দাবার দেওয়া উচিত—পুষ্টিকর তরল খাদ্য দেওয়া বাঞ্ছনীয়। রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখাও দরকার। মুখ পরিষ্কার রাখা উচিত। ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধও দিতে হবে। আনুষংগিক উপসর্গের বিধিমত চিকিৎসা করতে হবে। অন্য কোন ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ প্রতিরোধে পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধও দিতে হবে।

এই সব অসুখে অন্য সব উপসর্গ থাকলেও মৃত্যু বড় একটা হয় না। তবে ৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটা অসম্ভব নয়। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রেও এই অসুখ বেশ বিপজ্জনক। এর ফলে অনেক সময় গর্ভস্থ শিশুর জন্মগত বৈকল্য দেখা দিতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
পেটের ব্যথা

পেটের ব্যথা অনেক ধরনের হতে পারে। সাধারণতঃ মোচড় দেওয়া ব্যথা, চেপে ধরা ব্যথা ইত্যাদি হতে দেখা যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগেও এই ব্যথা বাড়তে পারে। অনেক কারণেই পেটের ব্যথা হতে দেখা যায়।

১। নীচের দিকে পাঁজর ভেঙে গেলে এই ব্যথা হতে পারে।
২। ইন্টার কণ্টাল নিউর‍্যালজিয়া হলে
৩। পেটে কোন ক্ষত থাকলে, কোন আঘাত হলে
৪। পেটে হারপিস জণ্টার হলে
৫। বুকের প্লুরিসি অসুখে পেটেও ব্যথা হতে পারে
৬। পেটের মাংসপেশীসমূহের প্রদাহে—myalgia হলে
৭। পাঁজরার হাড়ে periostitis হলে
৮। লিভারের অসুখে
৯। প্লীহার অসুখে
১০। পাকস্থলী বা অন্ত্রের যে কোন অসুখে
১১। কিডনীর অসুখে
১২। Ureter-এর অসুখে, বৃক্কনালীতে কোন পাথুরী থাকলে
১৩। পিত্তস্থলীর অসুখে
১৪। পিত্তনালীতে প্রদাহ ঘটলে, পাথুরী থাকলে
১৫। অগ্ন্যাশয়ের অসুখে
১৬। Uterus-এর কিছু অসুখে
১৭। ফ্যালোপিয়ান টিউব এবং ওভারির অসুখে
১৮। পেটের আভ্যন্তরিণ অংগপ্রত্যংগে ক্যানসার হলে ইত্যাদি ইত্যাদি

উপর পেটের ব্যথা (Epigastric pain) :

পেটের epigastrium-এ ব্যথা প্রায়শই দেখা যায়। সাধারণভাবে পাকস্থলীর

গণ্ডগোলে পেটে এক ধরনের ভীষণ ব্যথা হয়। এই ব্যথা যদি বামদিকে হয়, খাবার খাওয়ার পর ব্যথা বাড়ে এবং এই epigastric জায়গায় উপর থেকে চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়, তাহলে বুঝতে হবে মোটামুটিভাবে এটি পাকস্থলীর (gastric) ব্যথা।

আবার ব্যথা যদি খাওয়ার অনেক পরে অনুভূত হয় এবং খাবার খাওয়ার পর ব্যথা কমে যায়, তাহলে বুঝতে হবে মোটামুটিভাবে এটি duodenal ক্ষতের জন্য ব্যথা। আর ব্যথা যদি সব সময়েই হতে থাকে, খাবার খেলে বা অ্যালকালি-জাতীয় ওষুধ দিয়েও ব্যথা কমানো যায় না, তখন পাকস্থলীর ক্যানসার বলেই সন্দেহ করতে হবে।

Epigastric-এ ব্যথা অগ্ন্যাশয় বা pancreas-এর প্রদাহেও হতে পারে। মাঝে মাঝেই এই ব্যথা হয়, এই ব্যথা খুবই প্রচন্ড ধরনের হতে পারে। নাভিতে চাপ দিলেও রোগীর ব্যথা অনুভূত হয়। এর সংগে রোগীর নাড়ী দ্রুত ও কোমল হয়। Shock হয়।

বুক জ্বালা করলে বুঝতে হবে পাকস্থলীতে প্রদাহ বা gastritis হয়েছে। Epigastric জায়গার ব্যথা অনেক সময় ডানদিকের কাঁধের দিকেও নির্দেশিত হয়। Epigastrium-এ চাপ দিলেও রোগীর ব্যথা হতে পারে। এই ধরনের ব্যথা সাধারণতঃ পিত্তস্থলীর ব্যথা বলে মনে করা যেতে পারে।

অবশ্য অনেক সময় পাকস্থলী এবং অন্ত্রের প্রদাহ ছাড়াও বুকের আভ্যন্তরীণ প্লুরার প্রদাহে এবং হৃৎপিন্ডজনিত অসুখে—angina pectoris বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনে এই ধরনের epigastric ব্যথা হতে পারে।

এইসব ব্যথার সঠিক কারণ নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। প্রয়োজনে রক্তপরীক্ষা, x-ray ইত্যাদিও করতে হবে এবং এতে রোগ নির্ণয় সহজ হতে পারে।

বুক জ্বালা (Heart burn) :

এই বুক জ্বালা সাধারণতঃ বদহজমের জন্য হয়। এই বদহজমের ফলে পাকস্থলীর কিছু নিঃসৃত রস, খাদ্য অনেক সময় বমি না হয়েও মুখের মধ্যে চলে আসে এবং বুক জ্বালার সৃষ্টি করে। অত্যধিক ঝাল মশলাযুক্ত খাবার খেলে, যারা অত্যধিক মদ্যপান করে, যারা অত্যধিক ধূমপানে আসক্ত তাদের বদহজম বেশী হয়। Oesophagus-এ প্রদাহের ফলেও বুক জ্বালা করে।

খাদ্যনালীর mucus membrane-এ সাধারণতঃ কোন অনুভূতি থাকে না তবে এতে প্রদাহ ঘটলে তা খুবই sensitive হয়ে পড়ে। পাকস্থলী থেকে কোন regurgitation না হলেও বুক জ্বালা করতে পারে। অনেক সময় পাকস্থলীর নিঃসৃত রসের হাইড্রোক্লোরিক এসিড খাদ্যনালীর প্রদাহ ঘটায়। তবে পাকস্থলীর ক্যানসার অসুখে যেখানে হাইড্রোক্লোরিক এসিড খুবই কমে যায় অথবা প্রায় থাকেই না সেখানেও কিন্তু বুক জ্বলা প্রায়ই দেখা যায়। Hiatus hernia রোগীদের ক্ষেত্রেও এই বুক জ্বালা করা উপসর্গ প্রায়ই দেখা যায়।

বুক জ্বালা উপশমের জন্য বেশী পরিমাণে জল খেতে হয়, অম্লনাশক ওষুধও খেতে দেওয়া হয়। বদহজমের চিকিৎসা করতে হবে। আসল কী কারণে বুক জ্বালা করছে তা নির্ণয় করে তার চিকিৎসা করতে হবে।

পাকস্থলীর ক্ষত (Gastric ulcer) :

স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে এই গ্যাসট্রিক আলসার বা পাকস্থলীর ক্ষত হতে পারে। সাধারণতঃ ২০ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের লোকেদেরই হয়। অনেক কারণেই এই ক্ষত হতে পারে—খাওয়া দাওয়ার যাদের সময়ের ঠিক থাকে না, যারা অত্যাধিক ঝাল মশলা খায়, যারা অত্যাধিক ধূমপানে অভ্যস্ত, অত্যাধিক ভয়, ভাবনা, মানসিক দুশ্চিন্তায় থাকে—তাদের এই ধরনের অসুখ বেশী হয়।

এই অসুখের উপসর্গ আস্তে আস্তেই দেখা দেয়। সাধারণতঃ খাবার খাওয়ার পর পেটের epigastrium-এ জ্বালা করা প্রচন্ড ব্যথা হতে থাকে। খুব বেশী ব্যথা হলে পিঠের দিকেও এটি বিস্তার লাভ করতে পারে। এই ব্যথা আপনা থেকেই খাওয়ার ঘন্টাখানেক পরে উপশম হয়ে যায়। শুয়ে থাকলে বা পেটের উপর গরম সেঁক দিলেও অনেক সময় ব্যথা কমে যায়। পেটের epigastrium-এ বাইরে থেকে চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে। বহুদিন ধরে এই অসুখ চলতে থাকলে এবং কোন চিকিৎসা না হলে এই ব্যথা সব সময়েই হতে পারে। রোগীর বমি অনেক সময় হতে দেখা যায়। বমিতে অনেক সময় রক্তও থাকতে পারে। পায়খানার সংগেও রক্ত দেখা যেতে পারে। রোগী ব্যথার ভয়ে খেতে ভয় পায়। এ জন্য রোগীর স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। রোগীর শরীরের ওজন কমতে থাকে। পাকস্থলীর একটি barium meal x-ray করলে রোগ নির্ণয় সুনিশ্চিত হয়।

এই গ্যাসট্রিক আলসার রোগীকে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ বিশ্রামে রেখে এবং নিয়ম মাফিক খাদ্য প্রয়োগ করে চিকিৎসা করতে হয়। রোগীকে বেশী দুধ এবং গলা ভাত দেওয়া হয়। ঝাল মশলা দেওয়া হয় না। ধূমপান এবং মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়। ব্যথার সময় অনেক সময় অম্লনাশক ওষুধ (antacid) দেওয়া হয়। অলিভ তেল বা liquid paraffinও দেওয়া হয়। এই সব চিকিৎসায় সুফল পাওয়া না গেলে শল্যচিকিৎসা করাতে হয়।

Chronic gastritis :

এতে পাকস্থলীর মধ্যে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। খাওয়ার গন্ডগোলে, ঝাল মশলা খাবার খেলে, মানসিক দুশ্চিন্তায় এবং খাদ্য বদহজমে এই ধরনের gastritis হতে পারে। এতে পাকস্থলীতে বেশী পরিমাণ অম্লরস নিঃসৃত হয়। এই অসুখেও পাকস্থলীর ক্ষতের মতন নানান উপসর্গ হতে দেখা যায়। রোগীর পেটে ব্যথা হয়। Epigastrium-এ চাপ দিলেও রোগী ব্যথা অনুভব করে। রোগী অম্বলের কথা বলে, ঢেকুর তোলে। সময় বিশেষে রোগীর রক্ত বমিও হতে পারে। এই সব রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে। রোগীর পেটে সব সময় চাপ, ভারী এবং ভরা আছে বলে মনে হয়।

এই সব রোগীকে প্রথম থেকেই সুচিকিৎসা করা দরকার, নতুবা পরে এর থেকে পাকস্থলীর ক্ষত হতে পারে। রোগীর সহজপাচ্য খাওয়ার দিকে নজর দিতে হবে। ঝাল ইত্যাদি বন্ধ করে দিতে হবে। Bland খাদ্য দিলে ভালো হয়। মদ্যপান এবং ধূমপান একেবারেই বন্ধ করা উচিত। অম্বল থাকলে অম্লনাশক ওষুধ দিতে হবে। অনেক সময় হজমের জন্য বিশেষ এনজাইমযুক্ত ভিটামিন ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। রোগীর দাঁতে বা টনসিলে কোন জীবানু থাকলে তার চিকিৎসা করাও দরকার। রোগীকে বেশীক্ষণ খালি পেটে রাখা উচিত নয়। পেট পরিষ্কারের জন্য অনেক সময় liquid paraffin খেতে দেওয়া হয়।

Duodenal ulcer :

এই অসুখে রোগীর ক্ষুদ্রান্ত্রের duodenum-এ ক্ষত সৃষ্টি হয়। এই অসুখের প্রথমদিকে রোগী খাবার দুই তিন ঘন্টা পরে পেটে অস্বস্তি অনুভব

করে। এর পর সেই অস্বস্তি ব্যথার অনুভূতিতে পরিণত হয়। এতে খাওয়ার দু'এক ঘন্টা পরেই ব্যথার সৃষ্টি হয়—কোন প্রকারে পাকস্থলী খালি হলেই ব্যথা সুরু হয়। এই ব্যথা কোন কিছু খেয়ে নিলে কমে যায়। অনেক সময় এই ব্যথার জন্যই রাত্রে রোগী ঘুম থেকে জেগে ওঠে। এই ব্যথা অ্যালকেলি প্রয়োগেও কমতে দেখা যায়।

এই সব রোগীর ক্ষুধা মোটামুটি ভালোই থাকে। সেজন্য স্বাস্থ্যহানি খুব একটা হয় না। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকতে পারে। বেশী মদ্যপান করলে, অত্যধিক ধূমপান করলে, অতি দুশ্চিন্তায়, হঠাৎ ঠান্ডা লাগলে, বদহজম হলে এই ব্যথা হঠাৎ অনেক বেড়ে যায়। পায়খানা পরীক্ষায় অনেক সময় রক্ত ধরা পড়তে পারে। ক্ষত থেকে অধিক রক্তাক্ষরণ হলে রক্তবমি এবং কালো পায়খানা হতে পারে। Barium meal x-ray করলে রোগ নির্ণয় সহজ হয়।

এই অসুখেও রোগীর খাদ্যের দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। Bland খাদ্য দিতে হয়। বার বার খাওয়াতে হয় যাতে রোগীর পেট কখনও খালি না থাকে। অম্লনাশক ওষুধ দিতে হয়। অ্যালকেলি দিলে ব্যথার উপশম ঘটে। Anti-spasmodic ওষুধ এবং এট্রোপিন সালফেট দেওয়া যেতে পারে। বহুদিন ধরে এই অসুখ চলতে থাকলে এবং সুচিকিৎসা না হলে এই অসুখের নানা খারাপ উপসর্গ দেখা দিতে পারে। Pyloric obstruction, ক্ষতস্থানে ফুটো হয়ে যাওয়া (perforation), রক্তক্ষরণ ইত্যাদি হতে পারে। সুতরাং ওষুধের সাহায্যে নিরাময় সম্ভব না হলে শল্যচিকিৎসা করিয়ে নেওয়াই ভালো। সাধারণতঃ gastrojejunostomy এবং তার সংগে vagotomy করা হয়।

Pyloric obstruction :

ক্ষুদ্রান্ত্রের duodenum-এ ক্ষত থাকলে তারই পরবর্তী উপসর্গ হিসেবে এই ধরনের অসুখ হয়। অবশ্য prepyloric অংশে ক্ষত থাকলেও এই অসুখ হতে পারে। পাকস্থলীর ক্যানসার হলেও pylorus আক্রান্ত হয়ে এই অসুখ হতে পারে।

অসুখের প্রথমদিকে খাবার খাওয়ার পরে পেটে প্রচন্ড ব্যথা হয়। রোগীর সবসময়েই পেট যেন ভর্তি থাকে, ফুলে থাকে। অত্যধিক বমি হতে পারে। এই বমির সংগে দু'একদিন আগেকার খাওয়া খাবার বেরিয়ে আসতে পারে। বমির গন্ধ

খুবই অম্ল ধরনের হয় তবে ক্যানসারজনিত অসুখে খুবই দুর্গন্ধযুক্ত হয়। রোগী ভালোভাবে খেতে পারে না। স্বাস্থ্যহানি হয়। রোগীর ওজন কমে যায়। রোগীর প্রস্রাব কম হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্যও থাকে।

এই অসুখে শল্যচিকিৎসাই শ্রেয়। তবে এর আগে barium meal x-ray করে নেওয়া দরকার। রোগীকে শল্যচিকিৎসার আগে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে। প্রয়োজনে রক্তসঞ্চালনের ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

পাকস্থলীর ক্যানসার :

সাধারণতঃ এই অসুখ পুরুষদের বেশী হয়। ৪৫ থেকে ৬৫ বৎসর বয়সের রোগীদের বেশী হয়। অনেক সময় এদের আগে থেকেই পাকস্থলীর ক্ষত থাকে। বহুদিন থেকে chronic gastritis-এ এরা ভোগে।

অসুখের প্রথমদিকে রোগী বদহজমের কষ্টে ভোগে। রোগীর পেটে অল্প-স্বল্প ব্যথা থাকে। খাবার পরে পেটে অস্বস্তি হয়। পেট যেন সব সময়েই ফুলে থাকে। এর পরের দিকে রোগীর পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা হতে থাকে। এই ব্যথা সবসময়েই হতে থাকে এবং খাবার খাওয়ার পর বেড়ে যায়। রোগীর ক্ষুধা থাকে না। রোগী দিন দিন শুকিয়ে যেতে থাকে। রোগীর রক্তাল্পতা দেখা দেয়। রোগীর রক্তবমি হতে পারে। পায়খানার সংগেও রক্ত দেখা দিতে পারে —melaena হতে পারে। রোগীর পেটে অত্যধিক গ্যাস জমে, খারাপ গন্ধযুক্ত ঢেঁকুর ওঠে। বমির সংগে পুরানো কালচে রঙের জিনিস (coffee grounds) বের হতে পারে।

রোগীর শেষ পর্যায়ে pylorus পর্যন্ত আক্রান্ত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে pyloric obstruction হতে পারে। এদের পাকস্থলীর রস ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। Barium meal x-ray করতে হবে। রক্তও পরীক্ষা করতে হবে।

এদের ক্ষেত্রেও শল্যচিকিৎসা করতে হবে। এদের পুষ্টি এবং খাদ্যের দিকেও ভালোভাবে নজর দিতে হবে। মাঝে মাঝে gastric lavage দেওয়া দরকার। ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ দিতে হয়। রক্তাল্পতার জন্যও iron, ভিটামিন দিতে হবে।

Acute appendicitis :

এই অসুখে অন্ত্রের appendix-এ প্রদাহ হয়। যে কোন বয়সে স্ত্রী পুরুষ

সবারই এই অসুখ হতে পারে। এই প্রদাহের ফলে appendix খুবই লাল এবং শক্ত হয়ে ওঠে, ফুলে ওঠে। এর mucus membrane-এ ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পরে এর মধ্যে পুঁজের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এই appendix তখন ফুটো হয়ে যায়। এর মধ্যকার পুঁজ তখন peritonitis-এর সৃষ্টি করে। তার ফলে পুরো পেটের মধ্যেই প্রদাহ হতে পারে।

এই অসুখের প্রথমদিকে রোগীর পেটে প্রচন্ড ব্যথা হয়। ব্যথা হঠাৎ আরম্ভ হয়। প্রথমে নাভির কাছে আরম্ভ হয় এবং পরে ডানদিকের ileac fossaতে সীমাবদ্ধ হয়। এই ব্যথা মোচড় দেওয়ার মত হতেও পারে। এর পর রোগীর দেহের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে—জ্বর হয়। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। রোগীর বমি হতে পারে। রোগীর জিভ শুকনো হয়ে যায়। Peritonitis হলে পেটের সব জায়গায় ব্যথা থাকে। রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। রোগীর পেটের মাংসপেশীসমূহে টান ধরে—পেট শক্ত হয়ে যায়। চাপ দিলে বিশেষতঃ ডানদিকের ileac fossa-তে ব্যথা অনুভব হয়। রোগী অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ে।

রোগ নির্ণয় ঠিকমত হলে শল্যচিকিৎসা করা দরকার। তবে তার আগে পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। তবে appendicular lump হয়ে গেলে তখুনি আর অপারেশন করা হয় না। অন্ততঃ ৬ সপ্তাহ পরে সবদিকে বিবেচনা করে appendecectomy করা হয়। Appendicular abscess হয়ে গেলে, appendix-এ ফুটো বা perforation হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ অপারেশন করতেই হয়।

অ্যাপেনডিক্সের অপারেশন ঠিক সময়ে করাই উচিত তবে ঠিক মত ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করলে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যেতে পারে। তবে কখনও কখনও আবার প্রদাহ ঘটতে পারে এবং chronic appendicitis-এ পরিণত হতে পারে। আর ভয়ংকর ধরনের জীবানু সংক্রমণ ঘটলে appendicular abscess হতে পারে বা ফুটো হয়ে generalised peritonitis-এর সৃষ্টি করতে পারে।

Acute peritonitis :

পেটের peritonium-এ প্রদাহের ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। এতে নানা ধরনের জীবানু সংক্রমণ ঘটে। অনেক কারণে এই পেরিটোনাইটিস হতে পারে।

১। নানা ধরনের জীবাণু সংক্রমণের ফলে যেমন appendicitis, diverticulitis, পিত্তস্থলীর প্রদাহ (cholecystitis), salpingitis ইত্যাদি।

২। পাকস্থলীর ক্ষত বা টাইফয়েডজনিত আন্ত্রিক ক্ষত ফুটো বা perforation হলে।

৩। বাইরের কোন আঘাত থেকে পেটের ভিতরকার অংগপ্রত্যংগে ক্ষতি হলে। বাইরে কোন আঘাত না হয়েও অন্ত্রে ফুটো হলে এই ধরনের প্রদাহ দেখা দেয়।

৪। লিভার, প্লীহা ইত্যাদির আঘাতজনিত ক্ষতি হলে

৫। স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে puerperal sepsis বা প্রসবপরবর্তী জীবাণু সংক্রমণ ঘটলে।

৬। হার্ণিয়া যদি strangulated হয়ে পড়ে, ovarian cyst-এ যদি torsion হয়।

৭। পেটের পেরিটোনিয়াম যদি পিত্ত, প্রস্রাব বা pancreatic juice-এর সংস্পর্শে আসে।

এই অসুখে নানাধরনের ব্যাকটেরিয়া যেমন B. coli, B. pyocyaneus, B. proteus, স্ট্রেপ্টোকক্কাস স্ট্যাফাইলোকক্কাস এবং এমন কি B. welchii পর্যন্ত দিয়ে সংক্রমণ ঘটতে পারে। পেরিটোনিয়াম লাল হয়ে পড়ে, চকচকে ভাব আর থাকে না এবং অনেকটা rough granular হয়ে পড়ে। অনেক রস নিঃসরণ হয় এবং পরিশেষে সেখানে পুঁজ জমে। সেই পুঁজ গোটা পেটের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এই রোগের উপসর্গ প্রথমদিকে মোটামুটি নির্ভর করে কি কারণে এই ধরনের প্রদাহ ঘটেছে তার উপর। সে সময় ব্যথা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরে আস্তে আস্তে গোটা পেট জুড়ে সেই ব্যথা হতে থাকে। এই ব্যথা সব সময়েই হতে থাকে এবং সংক্রমণ বেশী হলে ব্যথাও বাড়তে থাকে। ব্যথার সংগে রোগী বমিও করতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। রোগী মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মানসিক অবস্থা মোটামুটি ঠিক থাকে।

রোগীর জিভ শুকিয়ে যায়, শ্বাসপ্রশ্বাসের হার কমে যায়, নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, রক্তচাপ কমে যেতে পারে। পেটে চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়, রোগীর পেটের মাংসপেশীসমূহে বেশ টান থাকে—পেট শক্ত হয়ে যায়। রোগীর চোখ

ঢুকে যায়। অল্পস্বল্প ঘাম হতে থাকে। রোগীর shock হয়। রোগীর অবস্থা খুবই সংগীন হয়ে পড়ে।

এই অসুখের চিকিৎসা খুবই সাবধানে করা উচিত। ঠিকমত রোগ নির্ণয় করা দরকার। প্রথমতঃ যে কারণে এই প্রদাহের সৃষ্টি হয়েছে তার চিকিৎসা করা দরকার। শল্যচিকিৎসার সাহায্যে পেটের মধ্যকার প্রদাহজনিত রস ভালোভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে পেটের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক সলিউশন দেওয়া যেতে পারে। ভালোভাবে drainage দিতে হবে। প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ মুখে বা ইঞ্জেকশনে দিতে হবে।

Subphrenic abscess :

এই অসুখে পেটের peritoneal cavityতে transverse colon এবং omentum-এর উপরে এবং diaphragm-এর নীচে পুঁজ জমা হতে থাকে। সাধারণতঃ পাকস্থলীর ক্ষত ফুটো হয়ে গেলে, duodenum-এর ক্ষত ফুটো হয়ে গেলে, অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে, পিত্তস্থলীতে প্রদাহ হলে, লিভার বা প্লীহা আঘাতে ফেটে গেলে এই ধরনের ফোঁড়া হতে পারে। অনেক সময় বুকের empyema ডায়াফাগ্‌মের মাংসপেশী ভেদ করে পেটে এই ধরনের অসুখ সৃষ্টি করতে পারে। পেটের অপারেশনের পরে জীবাণু সংক্রমণ হয়েও এই প্রদাহ হতে পারে।

এই অসুখে পেটের উপরদিকে বিশেষতঃ ডানদিকে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। রোগীর জ্বর হয়, নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। পেটের উপরিভাগে একটু ফোলা দেখা যেতে পারে—সেখানকার চামড়ায় অল্পবিস্তর ফোলা থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় বুক এবং পেট কম নড়াচড়া করে। রক্ত পরীক্ষা করলে leucocytosis অর্থাৎ শ্বেতকণিকার আধিক্য দেখা যায়। X-ray করলে দেখা যায় ডায়াফ্রাগ্‌মের dome অনেক উপরের দিকে উঠে যায়। ডায়াফ্রাগ্‌ম বেশী নড়াচড়া করে না।

এই অসুখের যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় হওয়া দরকার। শল্যচিকিৎসার সাহায্যে পুঁজ বের করে দিতে হবে এবং ভালো drainage দিতে হবে। রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ দিতে হবে।

Pelvic abscess :

এই অসুখে প্রদাহজনিত পুঁজ পেটের pelvic cavityতে জমে। এটি

পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের বেশী হয়। স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে salpingo-oophoritis হলে, puerperal sepsis বা প্রসবপরবর্তী সংক্রমণ ঘটলে এবং গর্ভপাতজনিত সংক্রমণে এই অসুখ হতে দেখা যায়। তবে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এপেন্ডিসাইটিস হলে অথবা diverticulitis হলে এই অসুখ হতে পারে। তলপেটের অপারেশনের পরে জীবানু সংক্রমণ ঘটে এটি হতে পারে।

এই অসুখের উপসর্গ সাধারণতঃ রোগের কারণের উপর নির্ভর করে। রোগীর তলপেটে অল্প ব্যথা হতে থাকে। বমি হতে পারে, রোগীর বার বার প্রস্রাব হয়। প্রস্রাব হতে কষ্টও হতে পারে। পায়খানা হতেও কষ্ট হতে পারে। মলদ্বার এবং স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে যোনিপথে পরীক্ষা করলে একটি ফোলা জায়গা বোঝা যায় এবং সে জায়গায় চাপ দিলে যথেষ্ট ব্যথা হয়। রোগীর জ্বর হয়, নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। রোগী আস্তে আস্তে কাহিল হয়ে পড়ে।

এই অসুখের চিকিৎসায় রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে, ব্যথার জন্য ব্যথা উপশমকারী ওষুধ দিতে হবে। শল্যচিকিৎসার সাহায্যে পুঁজ বের করে দিতে হতে পারে।

Acute intestinal obstruction :

এই অসুখে অন্ত্র দিয়ে তার ভিতরকার জিনিস স্বাভাবিক পথে যেতে পারে না, কেননা যে কোন কারণে বাইরে থেকে কোন চাপে অথবা অন্ত্রের ভিতরকার কোন অসুখে অন্ত্রে বাধাসৃষ্টি হয়। এই বাধাসৃষ্টির সময় অত্যধিক চাপ সৃষ্টির ফলে সেখানকার রক্ত সরবরাহকারী ধমনী এবং শিরায় রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে—একে strangulation বলে। এই ধরনের strangulation সহ অন্ত্রে বাধাসৃষ্টি নিম্নলিখিত কারণ সমূহে হতে পারে :

১। বাইরের (external) হার্ণিয়াতে

২। ভিতরের (internal) হার্ণিয়াতে

৩। পেটের ভিতরে নানা ধরনের band হয়ে অন্ত্রে বাধাসৃষ্টি করতে পারে এবং তার সংগে strangulation থাকতে পারে :

ক) পেরিটোনিয়ামের adhesion

খ) Meckle's diverticulum

গ) অ্যাপেনডিক্স

ঘ) Greater omentum

৪। Intussusception : এ ক্ষেত্রে অন্ত্রের কিছু অংশ নীচের কিছু অংশের ভিতর ঢুকে যায় এবং এতে অন্ত্রে বাধাসৃষ্টি হয়।

৫। Volvulus : এ ক্ষেত্রে অন্ত্রের খানিক অংশ তার mesentry-র কক্ষপথে ঘুরে যায় এবং তার ফলে অন্ত্রে বাধাসৃষ্টি হয়।

এসব strangulation ছাড়াও অন্ত্রে বাধাসৃষ্টি হয়। তার কারণগুলি নিম্নরূপ :

১। পেরিটোনিয়ামের adhesion

২। জন্মগত আন্ত্রিক দোষে যেমন :

ক) ক্ষুদ্রান্ত্রের atresia

খ) বৃহদান্ত্রের atresia

গ) Imperforate anus

৩। বাইরে থেকে কোন শক্ত জিনিস অন্ত্রে গিয়ে বাধাসৃষ্টি করতে পারে।

৪। পিত্তস্থলীর পাথুরী অন্ত্রে গিয়েও এমন বাধাসৃষ্টি করতে পারে।

৫। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আগে থেকেই অল্পস্বল্প বাধা থাকে এবং হঠাৎ এগুলি acute হয়ে যেতে পারে।

ক) অন্ত্রের কোন টিউমার,

খ) diverticulitis

গ) fibrous stricture

অন্ত্রের obstruction হলে যে স্থানে বাধা আছে তার উপরের দিকের অন্ত্র গ্যাস এবং তরলজাতীয় পদার্থে খুবই ফুলে ওঠে এবং নীচের অন্ত্র মোটামুটি ভাবে খালি থাকে। এই ফুলে ওঠা বা distension বেশী হয় বৃহদান্ত্রে বাধা সৃষ্টি হলে। এতে অন্ত্র খুবই ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে এবং অন্ত্রের গাত্র খুবই পাতলা হয়ে পড়ে। Strangulation থাকলেও বাধাসৃষ্টির উপরের এবং নীচের অংশে একই ধরনের প্রভাব পড়ে, কিন্তু অন্ত্রের যে অংশে রক্তচলাচল বিঘ্নিত হয় সে অংশ খুবই ফুলে ওঠে, নীল হয়ে পড়ে। সে অংশ থেকে রক্ত এবং অন্যান্য secretion ভেতরে জমতে থাকে। শেষ পর্যায়ে সেই অংশে পচন বা gangrene হতে দেখা যায়।

এই অন্ত্রের obstruction-এ রোগীর পেটে খুবই ব্যথা হয়। এটি প্রচন্ড ধরনের এবং আকস্মিকভাবে হতে পারে। প্রথমদিকে নাভির কাছাকাছি আরম্ভ হয় এবং পরে গোটা পেট ফুলে ওঠে এবং ব্যথাও ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যথা মোচড় দেওয়া ব্যথা হয় বিশেষতঃ যখন peristalsis বেড়ে যায়। রোগীর বমি হয়। রোগীর পেট বেশী ফুলে গেলে বমি সাধারণতঃ কম হয় তবে পেট কম ফুললে বমি অনেক বেশী হয়। বমির সংগে পিত্তও থাকতে পারে। পরের দিকে বমি কালচে রঙের হয় এবং অনেক সময় দুর্গন্ধ থাকে। রোগী ভীষণ পিপাসার্ত হয়ে পড়ে। রোগীর পুরোপুরি কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। রোগীর পায়খানা হয় না এবং কোন flatus হয় না।

রোগী খুব কাহিল হয়ে পড়ে। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, রক্তচাপ কমে যায়। রোগীর শরীরে জলের ভাগ কমে যায়। রক্তের খনিজ লবনের তারতম্য ঘটে। রোগীর শক্ হয়। রোগী toxic হয়ে পড়ে। রোগীর দেহের তাপমাত্রা কমে যেতে পারে। তবে peritonitis হলে তাপমাত্রা বাড়তেও পারে। সেক্ষেত্রে পেটে চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে। রোগীর পেটে rigidityও দেখা দেয়। পেটের একটি x-ray করলে রোগ নির্ণয় সহজ হয়।

এই সব রোগীর চিকিৎসায় পাকস্থলীতে একটি Ryle's tube দিতে হয় এবং বার বার শোষণ করা দরকার। শিরাপথে fluid দিতে হবে। এরপরে শল্য-চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কী কারণে অন্ত্রে বাধা সৃষ্টি হয়েছে সেটি নির্ণয় করে তার যথাযথ অপারেশন করা হয়। অপারেশনের সময় প্রয়োজন বোধে রক্তসঞ্চালনেরও দরকার হয়। অপারেশনের আগে রোগীর শরীরে dehydration থাকলে শিরাপথে fluid দিয়ে তার চিকিৎসা করতে হবে। শক্ থাকলে প্রয়োজনবোধে vasopressor ওষুধ, steroid ইত্যাদি দিতে হতে পারে।

Strangulated hernia :

এই অসুখে হারনিয়ার মধ্যকার contents যখন এত বেশী হয় যে সেখানে রক্তচলাচলকারী ধমনী এবং শিরায় প্রচন্ড চাপ পড়ে এবং তার ফলে স্থানীয় জায়গায় রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সেই loop তখন খুবই congested হয়ে পড়ে, লাল হয়, ফুলে ওঠে এবং ভিতরে রক্ত ও অন্য secretion জমতে থাকে। সেই অংশে পচন বা gangrene হতেও পারে।

এই ধরনের strangulated হারনিয়াতে প্রচন্ড ধরনের ব্যথা হয়। সেই ব্যথা মোটামুটি ঐ হারনিয়ার জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। রোগীর বমি হতে পারে, নাড়ী দ্রুত হয়। রক্তচাপ কমে যেতে পারে, রোগীর শক্ হতে পারে।

এই অসুখের চিকিৎসায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অপারেশন করা দরকার।

Acute intussusception :

এই অসুখে অন্ত্রের একটি অংশ আরেক অংশের মধ্যে ঢুকে যায় এবং তার ফলে অন্ত্রে বাধাসৃষ্টি হয়। এই অসুখ সাধারণতঃ কমবয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে হয়। সাধারণতঃ অন্ত্রের Peyer's patch-এ প্রদাহের ফলে এবং সেগুলি বড় হয়ে যাওয়ার জন্য খুব বেশী peristalsis হতে থাকে। তার ফলে এখানকার অন্ত্রের এক অংশ অন্য অংশের মধ্যে ঢুকে যায়।

এতে রোগীর পেটে প্রচন্ড ব্যথা হয়। কয়েক মিনিট পর পর ব্যথার প্রকোপ আসতে থাকে। যন্ত্রণার সময় রোগী একেবারে কুঁকড়ে পড়ে। পায়খানার সংগে রক্ত এবং mucus দেখা যায়। মোটামুটি পেট বেশ নরমই থাকে। তবে হাত দিয়ে এর পিন্ড (lump) বেশ অনুভব করা যায়। এই পিন্ড বেশ লম্বা ধরনের হয়। মলদ্বার দিয়ে আঙুলের সাহায্যেও এই পিন্ড বেশ বোঝা যায়। যথাসম্ভব সত্বর একটি x-ray করা দরকার। এই অসুখেও যথাসম্ভব শীঘ্র অপারেশন করা দরকার।

Volvulus :

এই অসুখে অন্ত্রের একটি coil তার mesentry-র কক্ষে পাক খেয়ে ঘুরে যায় এবং তার ফলে অন্ত্রের বাধাসৃষ্টি হতে দেখা যায়। সাধারণতঃ sigmoid colon-এই volvulus হয়। তবে caecum এবং ক্ষুদ্রান্ত্রেও volvulus হতে পারে। মোটের উপর বৃদ্ধ বয়সের রোগীদের ক্ষেত্রে এই অসুখ হয়।

সাধারণতঃ হঠাৎ পেটে প্রচন্ড ব্যথা হয় এবং সেই সংগে একবার বমিও হতে পারে। এর পর পেটে distension হতে থাকে এবং পেট এত ফুলে যায় যে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। রোগীর হৃৎপিন্ডে অস্বাভাবিক চাপ পড়তে পারে। অনেক সময় এতে strangulationও হতে পারে। এ ক্ষেত্রেও রোগীর সত্বর শল্যচিকিৎসা করা আবশ্যক।

Anal fissure :

এটি রোগীর মলম্বারে যেখানে চামড়া এবং mucous membrane-এর সংযোগ ঘটে সেখানে লম্বা এবং সরু ধরনের ক্ষত। সাধারণতঃ বাইরের কোন জিনিস অথবা শক্ত পায়খানা দ্বারা মলম্বারের mucous membrane-এ এই ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষত তেকোনা ধরনের এবং এর শীর্ষদেশ পেঁছায় Hilton লাইনের কাছে এবং নীচে মলম্বারের চামড়া পর্যন্ত আসে।

রোগী পায়খানা করার সময় প্রচন্ড ব্যথা পায় বিশেষতঃ শক্ত পায়খানার সময়। প্রথমদিকে এই ব্যথা পায়খানার পরেও ৫ থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত থাকে কিন্তু পরের দিকে দীর্ঘস্থায়ী অসুখে দু-তিন ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যথা থাকতে পারে।

এই অসুখের চিকিৎসায় পায়খানা খুব নরম রাখা উচিত। তরল প্যারাফিন রাত্রে খেতে দেওয়া হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য একেবারে এড়িয়ে চলতে হয়। মলম্বার ভালোভাবে পরিষ্কার রাখতে হয়। অ্যান্টিসেপটিক মলম ওখানে লাগানো যেতে পারে। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার মলম ওখানে লাগালে ব্যথা কম থাকে। দীর্ঘস্থায়ী অসুখের ক্ষেত্রে অপারেশন করিয়ে নেওয়াই ভালো।

Perianal abscess :

মলম্বারের এবং rectum-এর আশেপাশে ফোঁড়া হওয়ার ঘটনা খুব বিরল নয়। সাধারণতঃ পূর্ণ বয়স্কদের ক্ষেত্রেই এই অসুখ হয় এবং পুরুষদেরই বেশী হয়। B. coli, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপটোকক্কাস ইত্যাদি জীবাণু সংক্রমণের ফলেই এই ফোঁড়া হয়। Perianal ফোঁড়া একটি সাধারণ ফোঁড়া এবং চুলের গোড়ায়, sebaceous গ্ল্যান্ডে অথবা thrombosed বাইরের অর্শে (external piles) জীবাণু সংক্রমণ ঘটে। পরে এর থেকে ischiorectal ফোঁড়া বা সাইনাস সৃষ্টি হতে পারে।

এই অসুখে রোগী বসার সময় এবং এমন কি চলার সময়ও ব্যথা অনুভব করে। এই ফোঁড়া খুবই ছোট ধরনের, লাল congested হয় এবং পরে এর মধ্যে পুঁজ জমে। রোগী পায়খানা করতে কষ্ট পায়, তাই কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

এর চিকিৎসায় স্থানীয় জায়গায় গরম সেঁক দিলে রোগী আরাম পায়। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। পায়খানা নরম করার জন্য তরল প্যারাফিন রাত্রে খেতে দিতে হবে। প্রয়োজনে অপারেশন করে পুঁজ বের করে দিতে হবে।

Ischiorectal abscess :

এই ফোঁড়া মলাশয়ের যে কোন প্রদাহ বা ক্ষত থেকে পরবর্তী উপসর্গ হিসাবে হতে পারে। তবে anal canal-এর কোন জীবাণু সংক্রমণ হলে যেমন—perianal abscess বা অর্শ থেকেও এই ধরনের ফোঁড়া হতে দেখা যায়। Ischio-rectal fossa-র এই ফোঁড়া ঠিক সময়ে চিকিৎসা না করলে মলাশয়ের পিছন দিয়ে সংক্রমণ গিয়ে অন্যদিকের fossa-তেও যেতে পারে। এই ফোঁড়া অনেক সময় অন্ত্রের মধ্যেও ফেটে যেতে পারে। অনেক সময় এ থেকে fistula-র সৃষ্টি হয়।

এই অসুখের উপসর্গ হঠাৎ দেখা দেয়। স্থানীয় জায়গায় প্রথমদিকে অল্প ব্যথা হয়, কিন্তু পরের দিকে এই ব্যথা ভয়ংকর হয় এবং দপ দপ করতে থাকে। এই ব্যথা বসলে, চলাফেরা করলে এবং পায়খানার সময়ও অনেক বেড়ে যায়। স্থানীয় জায়গা বেশ ফুলে ওঠে, লাল হয়ে পড়ে, গরম হয়ে থাকে, চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে। মলদ্বারে আঙুল ঢুকিয়ে (rectal examination) পরীক্ষা করলে এই ফোঁড়া ভালোভাবে বোঝা যেতে পারে। এই অসুখে রোগীর প্রস্রাবের retention হতেও দেখা যায়।

এই অসুখের চিকিৎসা প্রয়োজনমত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। পায়খানা নরম রাখার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যথার জন্য ব্যথা-উপশমকারী ওষুধ দিতে হবে। শল্যচিকিৎসার সাহায্যে পুঁজ ঠিকমত বের করে দিতে হবে। রোগীর স্থানীয় জায়গা ঠিকমত পরিষ্কার রাখতে হবে। রোগীকে পরিপূর্ণ বিশ্রামে রাখা দরকার।

Anal fistula :

এই অসুখ ischiorectal অথবা pelvirectal ফোঁড়া থেকেই উৎপন্ন হয়। এতে bowel থেকে চামড়া পর্যন্ত একটি পথ থাকে। এই পথ সরল থাকতে পারে আবার আঁকাবাঁকা থাকতেও পারে। আবার অনেক সময় এর শাখা-প্রশাখাও থাকে। Horse-shoe fistula একদিক থেকে বেরিয়ে মলাশয়ের পিছনদিক দিয়ে অন্যদিকে যায়। এই পথের গাত্র মোটামুটি granulation দিয়ে তৈরী থাকে।

এই অসুখে রোগী অস্বস্তিকর অবস্থায় থাকে। এই fistula-র বাইরের মুখ

দিয়ে পুঁজ গড়াতে থাকে। যদি মুখটি কোন সময় অল্প বন্ধ হয়ে যায় তখন পুঁজ ভেতরে জমতে থাকে এবং সেখানে মাঝে মাঝে ব্যথার সৃষ্টি হয়। রোগী মাঝে মাঝে পায়খানা যাবার বেগ আসতে পারে।

এর চিকিৎসায় অপারেশন লাগে। এই track একেবারে কেটে বাদ দিতে হয়। যথেষ্ট অ্যাণ্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। স্থানীয় জায়গা ভালোভাবে পরিষ্কার করে রাখতে হয়।

Internal piles : অর্শ :

Rectum-এর নীচের অংশে portal এবং systemic রক্তনালীসমূহের সংযোজন থাকে। সেইখানে রক্তনালীর কোন কারণে varicose dilatation ঘটলে অর্শের সৃষ্টি হয়।

অনেক সময় এই অসুখের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে একই পরিবারে অনেকের এ অসুখ থাকতে পারে। অত্যধিক কোষ্ঠকাঠিন্যে—অত্যধিক straining থাকলে বিশেষতঃ প্রস্টেট গ্রন্থি বড় হলে এই অর্শ দেখা দিতে পারে। রক্তনালীর back pressure হলেও অর্শ হতে পারে।

এই অসুখে মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়ে বিশেষতঃ পায়খানা করার সময়। অনেক সময় mucus বের হতে দেখা যায়। আবার খানিকটা অংশ মলদ্বারের বাইরেও চলে আসতে পারে। এই অর্শে অনেক সময় ব্যথাও হয়।

অর্শের প্রথমদিকে ব্যথা নাও থাকতে পারে। তবে যখন এটি মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে prolapse হয় অথবা সেখানে irritation, প্রদাহ বা জীবাণু সংক্রমণ ঘটে তখন সেই অর্শের জায়গায় ব্যথা হয়। অনেক সময় পিঠে বা কোমরের দিকেও ব্যথা অনুভূত হয়।

এই অর্শের চিকিৎসায় পায়খানা যাতে নরম থাকে তার ব্যবস্থা করতে হয়। রোগীর খাদ্যের দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা উচিত যাতে কোষ্ঠকাঠিন্য না ঘটে। অনেক সময় অর্শে sclerosing ওষুধ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় এবং এতে অনেক অর্শ সেরেও যায়। তবে প্রয়োজনবোধে শল্যচিকিৎসা করানো দরকার।

এই অর্শের পরবর্তী উপসর্গ হিসাবে অনেক সময় strangulation হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে prolapsed অর্শ আর ভেতরে ঢোকানো যায় না। এতে

ব্যথা খুবই ভয়ংকর ধরনের হয়। এক্ষেত্রে অর্শ খুবই congested, নীল রঙের ফোলা ধরনের হয় এবং মলদ্বারের বাইরেই বেরিয়ে থাকে। অনেক সময় এতে পচন বা gangrene হতে দেখা যায়। এর চিকিৎসায় রোগীকে অ্যানেস্থিসিয়া দিয়ে বাইরের mass ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে সময়মত শল্যচিকিৎসা করা হয়।

অনেক সময় অর্শে প্রদাহ ঘটে তার ফলে phlebitis এবং periphlebitis হতে পারে। এক্ষেত্রেও অত্যধিক ব্যথা এবং ফোলা থাকে। Mucus discharge বেশী হয়। বার বার পায়খানা যাওয়ার বেগ (tenesmus) থাকে। এই প্রদাহ থেকে অনেক সময় ক্ষতেরও সৃষ্টি হয়। এসবের চিকিৎসায় উপযুক্ত অ্যাণ্টি-বায়োটিক দিতে হবে। পায়খানা নরম রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। স্থানীয় জায়গায় অ্যাণ্টিসেপটিক মলম লাগাতে হবে। রোগীর পরিপূর্ণ বিশ্রামও দরকার।

External piles (অর্শ) :

এক্ষেত্রে varicose perianal vein মলদ্বারে চামড়ার সংগে যুক্ত হয়ে থাকে। এর সংগে internal pilesও থাকতে পারে। এই thrombosed external piles মলদ্বারে ছোট, নীল রঙের গোলাকার ফোলার সৃষ্টি করে।

এই অর্শে খুবই ব্যথা হতে পারে। এখানে চাপ দিলেও রোগী ব্যথা অনুভব করে। এক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসায় এই অর্শ কেটে দেওয়া হয় এবং তার ভিতরকার জমাট রক্ত বের করে দিতে হয়।

পিত্তস্থলীর প্রদাহ (Acute cholecystitis) :

পিত্তস্থলীতে জীবাণু সংক্রমণের ফলে প্রদাহ ঘটে। সংক্রমণ সাধারণ systemic রক্তের সংগে, portal রক্তের সংগে, lymph stream-এর সংগে এবং পিত্তনালীর মধ্য দিয়েও হতে পারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই প্রদাহ স্ট্রেপটো-কক্কাস ব্যাকটেরিয়া দিয়েই সংক্রমণ হয়।

এই অসুখ সব বয়সেই হতে পারে। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে বড় একটা দেখা যায় না। সংক্রমণের গুরুত্ব অনুযায়ী নানাধরনের প্রদাহ হতে পারে, এমন কি পিত্তস্থলীর মধ্যে পুঁজও জমতে পারে। পিত্তস্থলীতে পচন (gangrene)

হওয়ার ঘটনাও ঘটে। যখন পিত্তস্থলীর মধ্যে পুঁজ জমা হয়, এবং পিত্তস্থলী পুঁজে ফুলে ওঠে তখন তাকে পিত্তস্থলীর empyema বলে। পিত্তস্থলীর মধ্যে mucus জমে যখন খুব বেশী ফুলে ওঠে তখন তাকে পিত্তস্থলীর mucocele বলে।

এই অসুখের আগে থেকেই রোগীর বদহজমের উপসর্গ দেখা দেয়। অনেক সময় পিত্তস্থলীতে পাথুরি থাকার জন্য এবং সেই পাথুরি হঠাৎ পিত্তনালীতে আটকে পড়ার জন্য রোগীর খুব বেশী মোচড় দেওয়া ব্যথা হয় এবং তারপরেই এই পিত্তস্থলীর প্রদাহ এবং তার নানান উপসর্গ দেখা দেয়। এই প্রদাহের ব্যথা পেটের ডানদিকে এবং উপরদিকে হতে থাকে। এই ব্যথা সব সময়েই হতে থাকে, মোচড় দেওয়া ব্যথা হয়। ব্যথার সংগে রোগী বমিও করতে থাকে। রোগীর দেহের তাপমাত্রা বাড়ে। কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। স্থানীয় জায়গায় চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে। পেট সাধারণতঃ নরমই থাকে তবে peritonitis হলে rigidity দেখা দেয়। রোগীর নাড়ী দ্রুত হয়। রক্ত পরীক্ষায় শ্বেত-কণিকার আধিক্য ধরা পড়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পিত্তস্থলীকে বাইরে থেকে হাত দিয়ে অনুভব (palpate) করা যায়।

এই সব রোগীকে পরিপূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হয়। তরল খাদ্য দিতে হয়। ব্যথার জন্য ব্যথাউপশমকারী ওষুধ দেওয়া হয়। প্রয়োজনমত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। জ্বর বেশী হলে দেহের তাপমাত্রা কমানোর জন্যও ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষতঃ acute supurative cholecystitis এবং acute gangrenous cholecystitis-এর ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি অপারেশন করে পিত্তস্থলী বাদ দেওয়াই শ্রেয়।

পিত্তস্থলীর প্রদাহ দীর্ঘস্থায়ী বা chronic হয়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদের বেশী হয়। ৪০ বছরের অধিক বয়সের ক্ষেত্রে বেশী হতে দেখা যায়। রোগী ডিসপেপসিয়ায় ভোগে। সবসময় epigastrium-এ অস্বস্তি থাকে। ডিম, মাখন, ঘি, তেল এদের সহ্য হয় না। রোগ নির্ণয়ের জন্য cholecystography করার দরকার হয়। এই অসুখেও cholecystectomy অপারেশন করার দরকার হয়।

পিত্তস্থলীর পাথুরি (gall stones) :

পিত্তস্থলীতে পাথুরি হলে এবং সেই পাথুরি পিত্তস্থলীর মধ্যেই থাকলে

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উপসর্গ দেখা দেয় না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেখানে পিত্তস্থলীতে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ থাকে সেখানে রোগীর flatulent ডিসপেপসিয়া হতে পারে।

এই পাথুরি অনেক সময় পিত্তস্থলী থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। ছোট পাথুরি cystic duct দিয়ে বেরিয়ে common bile duct হয়ে অন্ত্রে চলে আসতে পারে। পাথুরি যদি বড় হয় তবে cystic duct অথবা Hartmann's pouch-এ আটকে যেতে পারে। এই পাথুরি যখন cystic duct দিয়ে বেরুতে থাকে তখন রোগী পেটের উপরদিকে এবং ডানদিকে প্রচন্ড ব্যথায় কষ্ট পায়। এই ব্যথা মোচড় দেওয়া ব্যথার মত হয়। এই ব্যথা নবম কণ্টাল কার্টিলেজের ভিতরে এবং উপরের দিকে এবং মধ্যবর্তী xiphisternum পর্যন্ত নির্দেশিত হতে দেখা যায়। এই ব্যথা পিঠের ডান scapula-র দিকেও নির্দেশিত হতে পারে। এই ব্যথা এত প্রচন্ড হয় যে রোগী সহ্য করতে পারে না, কাহিল হয়ে পড়ে, রোগী ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে, ঠান্ডা হয়ে যায়, ঘাম হতে থাকে। এই সময় রোগীর নাড়ী দ্রুত হয়, রক্তচাপ কমে যায়। পেটে পিত্তস্থলীর জায়গায় বা তার আশেপাশে চাপ দিলেও রোগী ব্যথা পায়। এই প্রচন্ড ব্যথায় রোগী বমিও করতে পারে।

অনেক সময় পাথুরি cystic duct-এ আটকে যায় এবং পরে পিত্তস্থলীতে পড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে প্রথমদিকে রোগীর ব্যথা খুবই প্রচন্ড হয়, যখন পাথুরি cystic duct দিয়ে বেরুতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যথা কমে যায়—যখন সেই পাথুরি আবার পিত্তস্থলীতে পড়ে যায়। তবে পেটের উপরদিকে একটা অস্বস্তি কিছুদিন থাকতে পারে।

যে সব পাথুরি একেবারেই cystic duct-এ আটকে থাকে সেক্ষেত্রে ব্যথা বেশী কিছুদিন থাকে এবং এর পর ধীরে ধীরে ব্যথার উপশম ঘটে। এর পর পিত্তস্থলীতে সংক্রমণ ঘটলে প্রদাহ (acute cholecystitis) হতে পারে। জীবাণু সংক্রমণ বেশী হলে পিত্তস্থলীর empyema হয়, আর কোন সংক্রমণ না ঘটলে পিত্তস্থলীর mucocele হতে দেখা যায়।

যে সব পাথুরি common bile duct (পিত্তনালী) দিয়ে বের হতে পারে, তারা শেষ পর্যন্ত অন্ত্রের duodenum-এ চলে যায়। তবে duct-এর মধ্যে

পাথুরি আটকে থাকলে তা বের করে দিতে হবে এবং তার সংগে পিত্তস্থলীও অপারেশন করে বাদ দিতে হবে।

পিত্তনালীতে পাথুরি (Stone in common bile duct) :

যে সব পাথুরি প্রথম বারেই পিত্তনালী দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে সেই যাওয়ার সময় রোগীর প্রচন্ড colic ধরনের ব্যথা হয়। এই ব্যথা এত ভয়ংকর ধরনের হতে পারে যে রোগীর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে, রোগীর শক্ হয়। এর সংগে বমিও হতে পারে। তবে পাথুরি অন্ত্রে চলে গেলে আপনা থেকেই ব্যথার উপশম হয়। এসব ক্ষেত্রে অল্প সময়ের জন্য ন্যাবা হতেও পারে।

যে সব পাথুরি পিত্তনালীতে আটকা পড়ে যায়, সেসব ক্ষেত্রে রোগীর এই biliary colic প্রায়শই দেখা যায়। এক্ষেত্রে রোগীর জ্বর হয় এবং পরে রোগীর jaundice বা ন্যাবা হয়। পিত্তনালীর প্রদাহে রোগীর দেহের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যেতে পারে। পাথুরি যদি একটি হয় এবং ব্যথা যদি অনেক দিন পর হয়, তবে মধ্যবর্তী সময়ে ন্যাবা নাও থাকতে পারে। তবে ব্যথার পরে আবার ন্যাবা দেখা দিতে পারে। পাথুরি যদি অনেক হয় এবং colic যদি প্রায়শই হতে থাকে, তবে ন্যাবা দিন দিন বাড়তেই থাকে। এই ধরনে জন্ডিসে পিত্তস্থলী খুব একটা বড় হয় না।

এই সব রোগীর পিত্তস্থলীতে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ থাকে। সুতরাং খাদ্যের দিকে এদের নজর দিতে হবে। ডিম, ঘি, তেল এদের খেতে দেওয়া হয় না। গ্লুকোজ, ভিটামিন সি দিতে হয়। রোগীর রক্ত পরীক্ষা করা দরকার, x'ray করে রোগ নির্ণয় সুনিশ্চিত করা দরকার। এই অসুখের চিকিৎসায় পাথুরি বের করে দিতে হয় এবং তার সংগে পিত্তস্থলীও বাদ দেওয়া হয়। Biliary colic-এর চিকিৎসায় antispasmodic ওষুধ দিতে হবে।

অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহ (Acute Pancreatitis) :

অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহ পেটের একটি বিপজ্জনক অসুখ। এটি ঠিক কি কারণে হয় বোঝা মুস্কিল। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া দিয়েই সংক্রমণ ঘটে। এই প্রদাহে পেটে প্রচন্ড যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণার চোটে রোগীর একেবারে collapse হতে পারে। এই ব্যথা হঠাৎ হয়, তীক্ষ্ন ধরনের ব্যথা হয়।

সাধারণতঃ পেটের epigastrium-এ আরম্ভ হয়। পরে দু'দিকের costolumbar angle-এ ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যথার সংগে বমিও হতে পারে। রোগীর পায়খানা মোটেই হয় না। রোগীর নাড়ী খুবই দ্রুত হতে থাকে—পরে একেবারেই পাওয়া যায় না। রক্তচাপ বিপজ্জনকভাবে কমে যায়। রোগীর পেটের মাংসপেশীসমূহ এবং ডায়াফ্রাগম এত বেশী শক্ত হয়ে পড়ে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হয়। রোগী নীল হতে থাকে—cyanosis হয়। পেটে অল্প চাপ দিলেই রোগী ব্যথা অনুভব করে। রোগীর পেটে কাঠিন্য বা rigidity থাকে। রোগীর প্রস্রাবে diastase index এবং রক্তে amylase নির্ণয় করলে রোগনির্ণয় সহজ হয়। এই সব অসুখ শল্যচিকিৎসা করলে বিশেষ উপকার হয় না, সুতরাং না করাই শ্রেয়। রোগীকে শিরাপথে fluid দিতে হবে। রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য vasopressor ওষুধ দিতে হবে। রোগীকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন দিতে হবে। পর্যাপ্ত streptomycin ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

কিডনীর ব্যথা :

কিডনীর ব্যথা মোটামুটিভাবে চার ধরনের হতে পারে।

১। স্থানীয় ব্যথা—এটি সাধারণতঃ কোমরের দিকে হয়। তবে রোগী পিঠে অথবা পেটের একপাশে ব্যথা অনুভব করতে পারে। এতে diffuse ধরনের ব্যথা হয়। Costolumbar angle এবং নবম কণ্টাল কার্টিলেজের মধ্যে এই ব্যথা কেন্দ্রীভূত থাকে।

২। নির্দেশিত ব্যথা—এই ব্যথা দ্বাদশ থোরাসিক নার্ভ, ইলিও-ইংগুইনাল নার্ভ, ইলিও-হাইপোগ্যাসট্রিক নার্ভ এবং প্রথম লাম্বার নার্ভের গতিপথে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সুতরাং এই ব্যথা inguinal canal, অন্ডকোষ, পাছার উপর ভাগ, iliac crest-এর উপর ভাগ ইত্যাদিতে নির্দেশিত হতে পারে।

৩। একটি কিডনীর অসুখে অন্য কিডনীতে ব্যথা হতে পারে। এটি সাধারণতঃ অন্য কিডনীর কার্যকারিতা বেড়ে যাওয়ার জন্য হয়।

৪। Renal colic—এটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা এবং এর মোচড় দেওয়া ব্যথা ureter-এর গতিপথে বিস্তৃত হতে পারে।

কিডনীর injury :

কিডীনতে কোন ধরনের আঘাতজনিত ক্ষতি হলে রোগীর কোমরে প্রচন্ড ব্যথা

হয়। এর সংগে রোগীর নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, রক্তচাপ কমে যায়, রোগীর শক্ হয়। কিডনীর স্থানীয় জায়গায় রক্ত জমে যায় (haematoma), রোগীর প্রস্রাবের সংগে রক্ত বের হতে থাকে। কিডনীর আঘাতের সংগে শরীরের অন্য অংগ প্রত্যংগের ক্ষতি থাকলে তার জন্য আলাদা উপসর্গ থাকে। বেশীর ভাগ সময়েই শল্যচিকিৎসা বিনাই কিডনী সেরে যায়। তবে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হতে থাকলে এবং প্রস্রাবের extravasation হলে অপারেশন করতেই হয়।

হাইড্রোনেফ্রোসিস :

যদি ureter-এ অসম্পূর্ণ বাধা থাকে এবং এতে প্রস্রাবের প্রদাহ যদি আস্তে আস্তে এবং মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে কিডনীর pelvis এবং calyces অত্যধিক প্রেসারে ফুলে যেতে থাকে। একেই হাইড্রোনেফ্রোসিস বলে। হঠাৎ সম্পূর্ণ বাধাপ্রাপ্ত হলে কিডনী খুব ছোট এবং ক্ষয়প্রাপ্ত (atrophy) হয়ে যায়। হাইড্রোনেফ্রোসিসে রোগীর অত্যধিক ব্যথা হতে পারে এবং সে ব্যথা কিডনীর ব্যথার মতই।

Acute pyelitis :

এই অসুখে কিডনীর pelvis-এ প্রদাহ হয়। নানা ধরনের জীবাণু যেমন স্ট্যাফাইলোককাস, B. coli, B. proteus, স্ট্রেপটোককাস ইত্যাদি দিয়েই সংক্রমণ ঘটে। যে কোন বয়সেই এই অসুখ হতে পারে। তবে ২০ বছর বয়সের উপর স্ত্রীলোকেদের ক্ষেত্রেই এই অসুখ বেশী হয়।

এই অসুখে রোগীর কোমরে কিডনীর প্রচন্ড ব্যথা হয়। পেটের অন্যান্য জায়গায়, কুঁচকিতে, অন্ডকোষে ইত্যাদিতেও নির্দেশিত হতে পারে। রোগীর অত্যধিক জ্বর হয়। কাঁপুনি (rigor) হতে পারে। রোগী বার বার প্রস্রাব করে এবং প্রস্রাব করার সময়ও ব্যথা হয়। রোগীর প্রস্রাবে অনেক সময়ই পুঁজ থাকে। প্রস্রাব পরীক্ষায় pus cell ধরা পড়ে। রোগীর প্রচন্ড মাথা ব্যথা হতে পারে। অত্যধিক সংক্রমণ হলে স্থানীয় মাংসপেশীসমূহে টান (rigidity) থাকে। সেখানে হাত দিয়ে চাপ দিলেও রোগী ব্যথা অনুভব করে।

এই অসুখে সালফাজাতীয় ওষুধ, পেনিসিলিন অথবা অন্য অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। তবে তার আগে প্রস্রাব ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে

হবে এবং culture এবং sensitivity test করে নিলে চিকিৎসা করতে সুবিধা হয়।

Acute pyelonephritis :

এতেও কিডনী ও তার pelvis-এ স্ট্রেপটোকক্কাস এবং স্ট্যাফাইলোকক্কাস ব্যাকটেরিয়া দিয়ে সংক্রমণ ঘটে। পেটের মধ্যকার জীবাণু সংক্রমণে অথবা প্রসব পরবর্তী জীবাণু সংক্রমণে স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে এই অসুখ বেশী হয়। এই অসুখেও রোগীর কাঁপ দিয়ে জ্বর আসে। দেহের তাপমাত্রা ১০৪°/১০৫° ফা. হতে পারে। রোগীর কিডনীর জায়গায় প্রচন্ড ব্যথা হয়। রোগীর বমি বমি ভাব থাকে। রোগী ঝিমিয়ে পড়ে। জিভ শুকিয়ে যায়। প্রস্রাব অত্যন্ত কমে যায়, এমন কি বন্ধও হয়ে যেতে পারে। সংক্রমণ বেশী হলে রোগী toxic হয়ে পড়ে, ভুল বকতে থাকে। অজ্ঞান হয়ে যেতেও পারে।

এসব ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। উপসর্গ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করতে হবে।

Pyonephrosis :

এসব অসুখ pyelonephritis, hydronephrosis ইত্যাদি অসুখের পরবর্তী উপসর্গ হিসাবে হতে পারে। এতে অত্যন্ত বেশী ধরনের জীবাণু সংক্রমণ হয়। কিডনীর মধ্যে পুঁজ জমতে থাকে। এই অসুখেও প্রচন্ড ধরনের কিডনীর ব্যথা হতে থাকে। সব সময়েই অবিরাম ব্যথা হতে থাকে। প্রস্রাবের সংগে পুঁজ থাকে। কিডনী সাধারণতঃ খুব বড় হয়েই থাকে। চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়। এই সব রোগীর স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়ে পড়ে।

এই অসুখে শল্যচিকিৎসার দরকার হয়। Nephrostomy করে পুঁজ বের করে দিতে হয়। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। পরে প্রয়োজনবোধে কিডনী বাদ দিতে হতেও পারে।

Perinephric abscess :

এই জাতীয় ফোঁড়া পেটের অন্যান্য প্রদাহ যেমন অ্যাপেন্ডিসাইটিস, কোলি-সিস্টাইটিস, স্যালপিনজাইটিস, লিভারের ফোঁড়া ইত্যাদি থেকেই সংক্রমিত হয়।

কিডনীর কোন আঘাত লাগলে এবং সেই রক্তজমা স্থানে জীবাণু সংক্রমণ ঘটলেও এই ধরনের ফোঁড়া হতে পারে।

এই ধরনের অসুখে রোগীর জ্বর হয় এবং কিডনীর জায়গায় প্রচন্ড ব্যথা হয়। কিডনীর জায়গায় চাপ দিলেও রোগী প্রচন্ড ব্যথা পায়। রোগী চলা ফেরা করতেও কষ্ট হতে পারে। এই অসুখের সংগে অন্য অংগের কোন প্রদাহ থাকলে তার উপসর্গও থাকবে। প্রস্রাবের সংগে পুঁজ থাকতে পারে।

এর চিকিৎসায় পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। প্রয়োজনে অপারেশনের সাহায্যে পুঁজ বের করে দিতে হবে।

কিডনীর পাথুরি (Renal stone) :

কিডনীতে নানাধরনের পাথুরি হতে দেখা যায়। ইউরিক এসিড, সোডিয়াম ইউরেট, ক্যালসিয়াম অক্সালেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম অ্যামোনিয়াম ফসফেট ইত্যাদি ধরনের পাথুরি হতে দেখা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কিডনীতেই এই পাথুরি জমতে পারে। পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশী হয়। সাধারণতঃ ২০ থেকে ৬০ বছর বয়সের লোকদেরই বেশী হতে দেখা যায়।

এই পাথুরি ঠিক কোন জায়গায় আছে, তাদের সাইজ কেমন এবং সেই পাথুরি নড়াচড়া করতে পারে কিনা—এই সবের উপর রোগের উপসর্গ নির্ভর করে। এমন অনেক পাথুরি থাকতে পারে যেগুলিতে কোন রকমের উপসর্গই দেখা দেয় না। এগুলি হঠাৎ ধরা পড়ে এবং এর জন্য কোন কিছু চিকিৎসারও দরকার হয় না।

যে সব পাথুরি নড়াচড়া করতে পারে সেগুলি কিডনীর মধ্যে যথেষ্ট irritation করে এবং তার জন্য যথেষ্ট ব্যথা হয়। অনেক সময় প্রস্রাবের সংগে রক্তও বেরুতে দেখা যায়। সাধারণতঃ বেশী পরিশ্রম করলে এবং দৌড় ঝাঁপ করলে ব্যথা বেশী হয় এবং বিশ্রাম করলে ব্যথা কমে যায়।

অনেক সময় পাথুরি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে এবং ureter-এর মধ্যেও চলে আসতে পারে। এমনও হতে পারে ureter দিয়ে সোজা মূত্রস্থলীতে চলে আসে। এটি একবারে হতে পারে বা অনেকবার চেষ্টা করে অল্প অল্প এসে শেষে এই মূত্রস্থলীতে পোঁছায়। এই সব পাথুরিই যথেষ্ট যন্ত্রণা দেয়। এই রোগে বহুবারই কিডনীর colic যন্ত্রণায় হতে দেখা যায়। এই ব্যথা এত ভয়ংকর হতে পারে যে কোন কিছুতেই রোগীকে উপশম

দেওয়া যায় না। অনেক সময় মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়।

এই যন্ত্রণার সংগে রোগীর বমিও হতে পারে। রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করলে pus cell, এলবুমিন, রক্ত, অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া, নানাধরনের crystal ইত্যাদি পাওয়া যায়। X-ray করলে রোগ নির্ণয় সহজ হয়।

এই অসুখের চিকিৎসা খুবই সাবধানে করা দরকার। যদি পাথুরি থাকা সত্ত্বেও রোগীর কোন উপসর্গ না থাকে, রোগীর প্রস্রাবে যদি কোন জীবানু সংক্রমণ না থাকে তবে অপারেশন না করাই ভালো। তবে যে সব পাথুরি নড়াচড়া করতে পারে, যেগুলি প্রায়শই যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, যাদের মাঝে মাঝে প্রস্রাবের সংগে রক্ত দেখা যায় সে সব ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসার সাহায্যে পাথুরি বের করে দেওয়াই শ্রেয়।

এই পাথুরির জন্য অনেক ধরনের খারাপ উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন জীবানু সংক্রমণ হতে পারে, প্রস্রাবের প্রবাহে বাধাসৃষ্টি করতে পারে, হাইড্রো নেফ্রোসিস হয়ে যেতে পারে, কিডনী নষ্ট বা atrophy হয়ে যেতে পারে। কিডনীতে ক্যানসার হয়ে যেতেও পারে। এই পাথুরির জন্য প্রস্রাব একেবারেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে (calculus anuria)। জীবানু সংক্রমণের ফলে pyelitis, pyelonephritis, pyonephrosis এবং এমন কি perinephric abscess পর্যন্ত হতে পারে।

Ureter-এ পাথুরি :

সাধারণতঃ কিডনীর পাথুরিই কিডনীর পেলভিস্ হয়ে ureter-এ আসে। Ureter-এ আসলেই যে সেই পাথুরি মূত্রস্থলীতে চলে যাবে এমন কোন কথা নেই, সেই পাথুরি ureter-এর মধ্যে আটকে থাকতে পারে। এই পাথুরি ureter-এ আসলেই রোগী প্রচণ্ড ব্যথা পায়। যেখানে পাথুরি আটকায় সেখানেই ব্যথা বেশী হয় তবে গোটা ureter ধরে, এমন কি কিডনীর জায়গায় এবং আরও অন্য জায়গায় নির্দেশিত ব্যথা অনুভূত হতে পারে। এই ব্যথা খুবই ভয়ংকর রকমের হতে পারে এবং রোগী কাহিল হয়ে পড়ে। এই পাথুরি মূত্রস্থলীর কাছাকাছি intramural জায়গায় এলে রোগীর বার বার প্রস্রাব হয়, তলপেটে অস্বস্তি বোধ হয়। প্রস্রাব পরীক্ষা করলে রক্ত, এলবুমিন ইত্যাদি থাকতে পারে। অনেক সময় রক্তপ্রস্রাব হতেও দেখা যায়।

যখন পাথুরি প্রথমদিকেই একেবারে মূত্রস্থলীতে চলে আসে, তখন ব্যথা কমে যায়। কিন্তু ureter-এ আটকে থাকলে বার বার colic ব্যথা হতে থাকে। অনেক দিন ধরে মূত্র প্রবাহের বাধাসৃষ্টি করলে হাইড্রোনেফ্রোসিস হতে পারে।

রোগ নির্ণয় করার জন্য একটি x-ray করার দরকার। রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করাও হয়। প্রয়োজনে cystoscopy করাও যেতে পারে।

এর চিকিৎসায় প্রথমেই রোগীকে ব্যথার জন্য antispasmodic ওষুধ দিতে হবে। প্রয়োজন হলে মরফিনজাতীয় ওষুধও দেওয়া হয়। এট্রোপিন দেওয়াও যেতে পারে। রোগীকে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে দেওয়া হয়। বেশী প্রস্রাব করালে প্রস্রাবের সংগে ছোট পাথুরি বেরিয়ে যেতে পারে। তাই অনেক সময় frusemide ওষুধও দেওয়া হয়।

পাথুরি যদি প্রত্যেক colic ব্যথার সংগে আস্তে আস্তে নেমে আসে, তবে কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখা যেতে পারে যাতে অপারেশন না করেই পাথুরি বেরিয়ে যায়। কিন্তু যদি না নামতে থাকে তবে অপারেশন করে বের করে দেওয়াই শ্রেয়।

মূত্রস্থলীতে পাথুরি : (Vescical calculus) :

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়ে কিডনীর পাথুরিই ureter দিয়ে নেমে আসে এবং মূত্রস্থলীতে থাকে। এটি যদি প্রস্রাবের সংগে বেরিয়ে যেতে না পারে তবে মূত্রস্থলীতে বড় হতে থাকে এবং এতে নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। অবশ্য শিশুদের ক্ষেত্রে এই মূত্রস্হলীতে পাথুরী জন্ম নেয় এবং বড় হতে থাকে। একসংগে অনেক পাথুরি এই মূত্রস্হলীতে হতে পারে। নানা আকৃতির পাথুরিও দেখা যায়।

অনেকসময় পাথুরি কোন উপসর্গ ব্যতিরেকে মূত্রস্থলীতে বহুদিন থাকে। এই পাথুরি মূত্রস্থলীর trigone-এর সংস্পর্শে এলেই নানা উপসর্গ দেখা দেয়। বিশ্রামকালে মূত্রস্থলী প্রস্রাবে ভর্তি থাকলে কোন ব্যথা হয় না। কিন্তু নড়াচড়া করলে বিশেষতঃ প্রস্রাব করবার সময়ে ব্যথা হতে পারে। প্রস্রাব শেষ হবার পরে ব্যথা আরও বেড়ে যায়। এই ব্যথা মূত্রনালীতে এবং পুরুষাংগে নির্দেশিত হতে দেখা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাথুরির জন্য প্রস্রাব একবারে বন্ধ হয়ে যেতে

পারে। বেশীর ভাগ সময়ে মূত্রস্থলীতে irritation-এর জন্য রোগী বার বার প্রস্রাব যায়। প্রস্রাবে pus cell এবং রক্ত থাকতে পারে।

অসুখ সঠিক নির্ণয়ের জন্য একটি x-ray করা একান্ত দরকার। Cystoscopy করেও দেখে নেওয়া যেতে পারে। অপারেশন করে এই পাথুরি বের করে দিতে হয়।

মূত্রস্থলীতে প্রদাহ (**Acute cystitis**) :

মূত্রস্থলীতে নানা কারণের প্রদাহ হতে দেখা যায়। এই প্রদাহের ফলে রোগীর বার বার প্রস্রাব পায়। অনেকসময় প্রস্রাব এত বেশী পায় যে রোগী কাপড়েই প্রস্রাব করে ফেলতে পারে। প্রস্রাব করবার পরেও রোগীর মনে হয় আবার প্রস্রাব হবে। সাধারণতঃ জ্বালা করা ব্যথা রোগী সব সময়েই অনুভব করে। এই ব্যথা পুরুষাংগ এবং perinium-এ নির্দেশিত হতে দেখা যায়। রোগীর প্রস্রাব পরীক্ষা করলে পুঁজ, রক্ত ইত্যাদি পাওয়া যায়। রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে পড়ে। রোগীর জ্বর হতে পারে। রোগী অত্যন্ত toxic হয়ে পড়ে।

এসব রোগীর চিকিৎসা খুব সাবধানে করতে হবে। রোগীকে পরিপূর্ণ বিশ্রামে রাখা দরকার। প্রচুর জল খাওয়ানো হয়। ব্যথার জন্য মরফিন এবং এট্রোপিন দেওয়া যেতে পারে। ঘুমের জন্য ঘুমের ওষুধও দেওয়া হয়। পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া দরকার। খুব বেশী ধরনের জীবানু সংক্রমণ ঘটলে cystostomy এবং lavage করা যেতে পারে।

Acute retention of urine :

অনেক কারণেই রোগীর মূত্রস্থলীতে প্রস্রাব জমে ওঠে এবং রোগী প্রস্রাব করতে পারে না। কারণগুলি মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

১। পুরুষাংগজনিত—phymosis, paraphymosis, কোন ব্যান্ড বা ring বা টিউমার যদি মূত্রনালীতে চাপ সৃষ্টি করে।

২। মূত্রনালী সংক্রান্ত—মূত্রনালীতে যদি সংকোচন বা stricture হয়, rupture হলে, পাথুরি হলে, প্রদাহ হলে অথবা বাইরে থেকে অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হলে রোগীর প্রস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৩। প্রস্টেট গ্রন্থি জনিত— প্রস্টেট বড় হলে, ক্যানসার হলে অথবা প্রদাহ হলে, গ্রন্থিতে ফোঁড়া হলে প্রস্রাব বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৪। মূত্রস্থলীর neck-এ টিউমার বা পাথুরি হলে প্রস্রাব হতে পারে না।

এই অসুখে ঠিকমত রোগ নির্ণয় করা দরকার। রোগীর তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। তলপেট ফুলে ওঠে। রোগী অস্থির হয়ে পড়ে। অসুখের আসল কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা করা দরকার। প্রয়োজনে suprapubic cystostomy করার প্রয়োজন হতে পারে। অবশ্য তার আগে ক্যাথেটার পরানোর চেষ্টা করা উচিত এবং অনেক সময়েই এতে সুফল পাওয়া যায়।

প্রস্রাবের extravasation :

মূত্রস্থলী বা মূত্রনালী আঘাতের ফলে ফেটে গেলে প্রস্রাব বাইরে আশেপাশে বেরিয়ে আসে। তলপেটে জোরে ঘুষি, লাথি ইত্যাদি মারলে, হঠাৎ আঘাতে pelvis-এ fracture হলে অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনায় মূত্রস্থলী ফেটে যাওয়া অসম্ভব নয়। Perineum-এ মূত্রনালীতে আঘাত ঘটলে এই ধরনের extravasation হতে দেখা যায়।

এই অসুখ সাধারণতঃ হঠাৎ আরম্ভ হয়। আক্রান্ত জায়গায় প্রচন্ড ব্যথা হয়। রোগীর কাঁপ দিয়ে জ্বর আসে। রোগীর রক্তদুষ্টি হয়। প্রস্রাব খুবই কম হয়। যেটুকু প্রস্রাব হয়—খুবই কষ্ট করে হয়। প্রস্রাবের সংগে রক্ত দেখা যায়। Perineum ও তার আশেপাশের জায়গা ফুলে যায়। লাল রঙের হয়ে যায়, চামড়া শক্ত ধরনের indurated হয়। পরে ঠিকমত চিকিৎসা না হলে পচন বা gangrene হতে পারে।

এর চিকিৎসা তাৎক্ষণিক হওয়া দরকার। আক্রান্ত extravasated জায়গায় অনেকগুলি incision দেওয়া যায়। একটি ক্যাথেটার মূত্রনালী দিয়ে পাঠানোর চেষ্টা করা উচিত। প্রয়োজনে suprapubic cystostomy করতে হতে পারে।

পুরুষাংগের প্রদাহ (Infections of the penis ; Balanoposthitis) :

এই অসুখে glans penis এবং prepuce-এ নানাধরনের জীবানু সংক্রমণে প্রদাহ ঘটে। এতে prepuce অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ওঠে, জ্বালা করা ব্যথা হতে থাকে। চুলকাতে থাকে। পুরুষাংগের গাত্রে অনেক সময় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। নানা জায়গা থেকে পুঁজ গড়াতে থাকে।

এই অসুখের চিকিৎসায় পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়াতে হবে। আক্রান্ত জায়গা পরিষ্কার রাখতে হবে। পটাশিয়াম পারমাংগানেট সলিউশন-

যন্ত্র গরম জলে পরিষ্কার করা যেতে পারে। পুঁজ জমা থাকলে বের করে দিতে হবে। জীবাণু সংক্রমণ প্রশমিত হলে পরে circumcision করে দিতে হবে।

Torsion of the testis :

যদি জন্মগত কারণে spermatic cord খুব ছোট থাকে এবং testis স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক উপরে external ring-এর কাছে অবস্থিত থাকে, তবে testis অনেক সময় পাক খেয়ে যেতে পারে। এর ফলে testis-এর স্বাভাবিক নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণতঃ অল্প অল্প আঘাতের পর এই ধরনের অবস্থা হতে দেখা যায়। কর্ডের নীচের দিকে খুব লাল হয়ে পড়ে—congested হয়ে থাকে, ধমনী এবং শিরায় রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়—এগুলিতে thrombosis হয়। ভিতরে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। পরে এখানে জীবাণু সংক্রমণ এবং পচন হতে থাকে।

এতে testis-এ প্রচন্ড তীক্ষ্ন ধরনের ব্যথা হয়, অনেক ফোলা থাকে। হাত দিয়ে চাপ দিলেও ব্যথা হতে থাকে। এর চিকিৎসায় অবিলম্বে অপারেশন করার দরকার। যদি testis ঠিক থাকে তবে untwisting করা হয় আর পচন ধরলে তা বাদ দেওয়াই শ্রেয়।

Acute epididymo-orchitis :

এক্ষেত্রে testis-এ নানাধরনের জীবাণু সংক্রমণের ফলে প্রদাহ ঘটে। স্ট্রেপটো-কাকস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, গণোকক্কাস ইত্যাদির দ্বারা জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। মূত্রনালীর আশেপাশে ফোঁড়া হলে, প্রস্টেট গ্রন্থির ফোঁড়া হলে, testis-এ আঘাত হলে এই ধরনের প্রদাহ হতে পারে।

রোগী অন্ডকোষ প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করে। স্থানীয় জায়গা লাল হয়ে পড়ে, congested থাকে, ফোলা থাকে। অন্ডকোষ বড় হতে পারে। চাপ দিলে ব্যথা হয়। অন্ডকোষের চামড়াতে ফোলা থাকে।

যে কারণে এই ধরনের প্রদাহ ঘটেছে তার চিকিৎসা করা দরকার। একটি suspensory ব্যান্ডেজ দিয়ে অন্ডকোষ বেধে রাখলে ব্যথা কম হয়। ব্যথার জন্য ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া দয়কার। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে।

ঋতুস্রাবকালীন ব্যথা (Dysmenorrhoea) :

ঋতুস্রাব আরম্ভ হওয়ার আগে অনেক স্ত্রীলোকই তলপেটে ব্যথা অনুভব করে। অনেক সময় এই ব্যথা এত বেশী হয় যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে যদি কোন pelvic disease থাকে তবে তার বিধিমত চিকিৎসা করা বিধেয়। এতেই অনেক সময় যন্ত্রণার সমাপ্তি ঘটে।

অনেক সময় ঋতুস্রাবের প্রথম ২৪ ঘন্টা তলপেটে যন্ত্রণা হতে থাকে এবং এই ব্যথা সাধারণতঃ মোচড় দেওয়ার মত হয়। সাধারণতঃ যুবতীদের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ গর্ভবতী হওয়ার আগেই এই সব দেখা দেয়। এদের ক্ষেত্রে antispasmodic ওষুধ, ব্যথানাশক (analgesic) ওষুধ বা প্রয়োজনে হর্মোনও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অনেক সময় dilatation এবং curratage করাও প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মধ্যবয়স্কা নারীদের ক্ষেত্রেও হঠাৎ এই ধরনের ব্যথা দেখা দিতে পারে। এদের আগে থেকে এ ধরনের ব্যথার কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। এটি endometriosis হওয়ার জন্য হতে পারে। Peritoneal carcinomatosis হওয়ার জন্যও এই যন্ত্রণা হতে পারে। সুতরাং অভিজ্ঞ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে রোগীকে ভালো-ভাবে পরীক্ষা করানো দরকার। প্রয়োজনে বিধিমত চিকিৎসা করতে হবে।

ফ্যালোপিয়ান টিউবের প্রদাহ (Acute salpingitis) :

এই অসুখ সাধারণতঃ যুবতী স্ত্রীলোকদেরই হয় বিশেষতঃ কোন কারণে গর্ভ-পাতের পর। গণোরিয়া অসুখও এই ধরনের প্রদাহ হতে পারে। এতে ফ্যালোপিয়ান টিউবে প্রদাহ ঘটে এবং এর সংগে pelvic peritonitis-ও হতে পারে। এই অসুখে রোগী তলপেটে যন্ত্রণার কথা বলে। এর সংগে বা ব্যথার আগেও রোগীর বমি হয়। তলপেটে চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে। তলপেটের মাংসপেশীতে টান থাকে—rigidity দেখা দেয়। রোগীর জ্বর হয়। যোনিপথ দিয়ে পরীক্ষা করলে দুইদিকে ব্যথাকর জায়গা বোঝা যায়। জরায়ু থেকে discharge এবং রক্ত বের হতে দেখা যেতে পারে।

এই রোগের চিকিৎসায় রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে। রোগীর পেটে গরম সেঁক দেওয়া যেতে পারে—এতে রোগী আরাম পায়। রোগীর অত্যধিক যন্ত্রণার জন্য ব্যথানাশক ওষুধ এমনকি মরফিন পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।

রোগীকে পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে অপারেশন করার প্রয়োজন হয় না।

ফ্যালোপিয়ান টিউব এবং ওভারির প্রদাহ (Salpingo-oophoritis) :

অনেক সময় ফ্যালোপিয়ান টিউব এবং তার সংগে ওভারির প্রদাহ ঘটতে পারে। নানা ধরনের জীবানু সংক্রমণ থেকে অথবা টিউবারকিউলোসিস ব্যাসিলাস সংক্রমণ থেকে এই অসুখ হয়। এই অসুখে রোগীর কিছুদিন পর পরই তলপেটে ব্যথা হয়—এই ব্যথা সাধারণতঃ ঋতুস্রাব আরম্ভ হওয়ার আগেই হয়। এই ব্যথার সংগে জ্বরও হয়। পিঠে এবং কোমরের দিকেও ব্যথা যেতে পারে। কোন কোন সময় অত্যাধিক স্রাব হতেও দেখা যায়। ফ্যালোপিয়ান টিউব এবং ওভারী প্রদাহের ফলে বেশ ফুলে ওঠে এবং শেষ পর্যায় একটি বড় পিন্ডে পরিণত হয়।

টিউবারকিউলোসিস হলে তার চিকিৎসা করা দরকার। স্ট্রেপটোমাইসিন, P A S এবং আইসো-নিকোটিনিক এসিড দেওয়া হয়। প্রয়োজনে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ দিয়ে শল্যচিকিৎসা করানো হয়।

ওভারির টিউমার (Ovarian tumours) :

ওভারিতে অনেক সময় নানা ধরনের টিউমার হতে দেখা যায়। ফাইব্রোমা (fibroma), ক্যানসার ইত্যাদি হতে পারে। এগুলিতে সাধারণতঃ কোন ব্যথা বেদনা বা যন্ত্রণা হয় না। তবে এর উপসর্গ হিসাবে এই টিউমারের pedicle-এ পাক খেয়ে ঘুরে যায় অর্থাৎ torsion হয়, তখন আকস্মিক যন্ত্রণার সৃষ্টি হতে পারে। এই torsion-এর ফলে ধমনী এবং শিরাতে রক্তচলাচল ব্যাহত হয়—টিউমারে পচন হতে থাকে এবং অনেক সময় নানা বীজানু দিয়ে সংক্রমণও এতে হতে পারে। এতে পেরিটোনিয়ামেও প্রদাহ দেখা দেয়। টিউমার থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে তা পেরিটোনিয়ামের মধ্যে জমতেও পারে।

এই অসুখে রোগীর হঠাৎ পেটে প্রচন্ড ব্যথা হতে থাকে, বমি হতে পারে নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, রক্তচাপ কমে যেতে থাকে, তলপেটের মাংসপেশীসমূহে টান ধরে—rigidity দেখা দেয়।

রোগনির্ণয় যদি সুনিশ্চিত হয় তবে তাৎক্ষণিক অপারেশন করা দরকার এবং সেই টিউমার বের করে দেওয়া উচিত।

Ruptured ectopic gestation :

ফ্যালোপিয়ান টিউবে যদি গর্ভসঞ্চার হয়, সেই অস্বাভাবিক গর্ভ কিছুদিনের মধ্যেই rupture করে এবং এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এতে রোগীর সাধারণতঃ একটি মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন পেটে অত্যধিক যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। এই ব্যথা এত বেশী হয় যে রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেও পারে। পেটের মধ্যে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হতে থাকে, তার ফলে রোগী ফ্যাকাশে হয়ে যায়, নাড়ীর গতি দ্রুত হতে থাকে এবং অনেক সময় পাওয়াই যায় না। রক্তচাপ বিপজ্জনকভাবে কমে যেতে থাকে। রোগীর শক্ হয়। রোগীর পেটে চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়। রোগীর যোনিপথে পরীক্ষা করলে রোগনির্ণয় সহজ হয়।

এই অসুখের চিকিৎসায় রোগীকে শিরাপথে fluid দিতে হবে—প্রয়োজনমত রক্তসঞ্চালন করতে হবে। রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য vasopressor ওষুধও দিতে হবে। রোগীর তাৎক্ষণিক অপারেশন করার দরকার। সেই আক্রান্তে টিউব বাদ দিয়ে দিতে হবে।

Prolapsed uterus :

সাধারণতঃ সন্তান প্রসবের পর বিশেষতঃ যে সব মায়েরা বহুবার গর্ভবতী হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের prolapsed uterus হতে দেখা যায়। এদের pelvic floor-এর মাংসপেশী সমূহ খুবই দুর্বল থাকার জন্য জরায়ু নীচের দিকে যোনিপথের মধ্য দিয়ে নেমে আসে। এতে রোগীর খুবই অস্বস্তি হয়, রোগী ভীষন ব্যথাও পায়। অনেক সময় এর সংগে মূত্রস্থলীও বেরিয়ে আসতে পারে। সেজন্য প্রস্রাবের গন্ডগোলও দেখা দিতে পারে।

এই অসুখে স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞদের দিয়ে শল্যচিকিৎসা করানোর দরকার হয়। তবে প্রথম দিকে এলে physiotherapist-এর তত্ত্বাবধানে pelvic floor-এর মাংসপেশী সমূহের ব্যায়াম করানো যেতে পারে। এতে মাংসপেশী সমূহ আবার সতেজ স্বাভাবিক হতে সাহায্য হয় এবং তার ফলে অসুখ আর বাড়তে নাও পারে। এর সংগে পেটের মাংসপেশীসমূহের ব্যায়াম করানোও যেতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

বুকের বিভিন্ন ব্যথা

বুকের মধ্যে হঠাৎ ব্যথা প্রথমে sternum-এর পিছনে অনুভূত হয় এবং সেই ব্যথা যদি বাম হাত এবং কনুই এবং কাঁধের দিকে যায় তবে তাকে angina pectoris বলেই বুঝতে হবে। মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনেও এই ধরনের ব্যথা হবে। অবশ্য অনেক সময় পাকস্থলীর মধ্যকার অতিরিক্ত গ্যাস এই ধরনের বুকের ব্যথার সৃষ্টি করতে পারে।

এ ছাড়াও আরও অনেক ধরনের বুকের ব্যথা হতে পারে ঃ

১। বুকের পাঁজর ভেঙে গেলে বুকে খুবই ব্যথা হয়

২। ইণ্টারকস্টাল নিউর‍্যালজিয়া হলে

৩। বুকে কোন আঘাত বা ক্ষত থাকলে

৪। বুকের চামড়ায় হারপিস জস্টার হলে

৫। প্লুরিসি অসুখে

৬। মাংসপেশীতে প্রদাহ হলে, myalgia হলে

৭। বুকের হাড়ে অথবা শিরদাঁড়ায় periostitis হলে

৮। অনেক সময় পেটের peritonitis এর ব্যথা অত্যধিক হলে বুকের ব্যথায় পরিণত হতে পারে।

৯। অনেক সময় লিভারের ব্যথা, পাকস্থলীর ব্যথা, কিডনীর ব্যথা, পিত্তস্থলীর ব্যথা অত্যধিক হলে বুকেও অনুভূত হতে পারে।

১০। স্তনের প্রদাহ হলে

ইত্যাদি।

দুর্ঘটনাজনিত বুকের আঘাত (injuries) :

উঁচু থেকে পড়ে যেয়ে, বুকে ধাক্কা লেগে, গাড়ী দুর্ঘটনায়, বোমার আঘাতে, গুলি গোলায় বুকের বিভিন্ন ক্ষতি হতে পারে। অনেক সময় বুকের খাঁচার একটি পাঁজর বা rib ভেঙে যেয়ে বুকের মধ্যকার অংগপ্রত্যংগে ক্ষতি করতে পারে।

চামড়ায় কোন আঘাত না থাকলেও অনেক সময় বুকের ভিতর আঘাত থাকতে পারে। বুকের অংগপ্রত্যংগের ক্ষতির সংগে লিভার, প্লীহা, পাকস্থলী ইত্যাদির ক্ষতি, হাত পায়ের হাড় ভাঙা, মাথার খুলির ক্ষতি এমন কি মস্তিষ্কের ক্ষতিও থাকতে পারে।

এই সব অসুখে রোগীর নাড়ীর গতি, রক্তচাপ ঠিক আছে কিনা, শক্ আছে কি না, কোন জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কি না তা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ফুসফুস থেকে হাওয়া প্লুরায় আসছে কিনা অর্থাৎ pneumothorax হয়েছে কিনা তাও দেখতে হবে। ফুসফুসের হাওয়া যদি চামড়ার নীচেকার স্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তবে তাকে বলে surgical emphysema। এসব জায়গায় চাপ দিলে হাওয়া থাকার জন্য বজবজ শব্দ হয়। রোগীর বুকের একটি x'ray করা একান্ত দরকার।

রোগীর বুকে অত্যন্ত ব্যথা থাকতে পারে। রোগী স্বচ্ছন্দে শ্বাস নিতে পারে না। রোগীর অক্সিজেনের অভাবে নীল (cyanosis) হতে দেখা যায়। Pneumothorax-এর হাওয়া যদি বের হতে না পারে—যদি বাড়তেই থাকে তবে mediastimum-এ চাপ সৃষ্টি করে, হৃৎপিন্ড, মহাধমনী এবং অন্যান্য শিরাতেও চাপ সৃষ্টি করে এবং তার ফলে রোগীর প্রচন্ড শক্ হয়। এই অসুখের সময়মত চিকিৎসা না করলে tension pneumothorax-এ রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

এই সব রোগীকে প্রথমেই পরিপূর্ণ বিশ্রামে রাখা দরকার। ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ দিতে হবে এবং প্রয়োজনে মরফিন দিতে হতে পারে। রোগীকে অক্সিজন দিতে হবে। রোগীর যদি রক্তক্ষরণ হতে থাকে তবে শিরাপথে fluid দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে রক্তসঞ্চালনও করতে হতে পারে।

যদি tension pneumothorax থাকে তবে একটি মোটা সুচ বুকের মধ্যে দিয়ে হাওয়া বের করে দিতে হবে এবং একটি water seal drain দিতে হবে। রোগীর প্লুরার মধ্যে রক্ত জমা থাকলে অর্থাৎ haemothorax থাকলে তাও বিধিমত বের করে দিতে হবে।

রোগীর বুকের খাঁচায়—পাঁজর ভেঙে গেলে রোগীর বুকে প্রচন্ড ব্যথা হয়—শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়। রোগী শ্বাসনালী ও ফুসফুস

থেকে secretion-ও ভালোভাবে কেশে বের করে দিতে পারে না। এই সব secretion ফুসফুসে জমতে থাকলে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে।

অনেকগুলি পাঁজর এক সংগে ভেঙে গেলে রোগীর বুকের খাঁচার সেই অংশ প্রায় আলাদা ভাবে কাজ করতে থাকে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার সময়। একে stove-in chest বলে। Flail chest হলে flail সেগমেণ্টকে আবার স্বাভাবিক ভংগিমায় রেখে সুদৃঢ় করতে হবে। এসব ছাড়াও ডায়াফ্রাম মাংসপেশীতে ক্ষতি বা rupture থাকলে অথবা হৃৎপিণ্ড বা বড় বড় রক্তনালীর ক্ষতি হলে যথাযথ শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। রোগীর ব্যথাবেদনা উপশমের জন্য মরফিন দেওয়া ছাড়াও continuous thoracic epidural analgesia দেওয়া যেতে পারে। এটি ব্যথার উপশম করায়, রোগীকে ভালোভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে সাহায্য করে এবং রোগীকে ভাল ভাবে কাশতেও সাহায্য করে। ইণ্টারকস্টাল ব্লকও অনেক সময় ভাল কাজ দেয়।

বোমা বিস্ফোরণে বা ছুরি ছোরার আঘাতে বুকের খাঁচায় অথবা তার অভ্যন্তরের বিভিন্ন অংশ প্রত্যংগে ক্ষতিসাধন হতে পারে। সেগুলির ঠিকমত রোগ নির্ণয় করা দরকার। প্রয়োজনে x'ray করার দরকারও হয়।

প্লুরিসি (Pleurisy) :

ফুসফুসের বহিঃ আবরণী বা pleura-তে প্রদাহ হলে তাকে প্লুরিসি বলে। নানা ধরনের জীবানু সংক্রামণের ফলেই এই প্রদাহ ঘটে। যখন এই প্রদাহের ফলে fibrinous exudate জমা হয় তখন তাকে বলে dry pleurisy বলে। যখন অনেক বেশী serous fluid জমা হয় তখন তাকে pleurisy with effusion আর যখন ভিতরে একেবারে পুঁজ জমে যায় তাকে purulent pleurisy বা empyema বলা হয়।

Dry pleurisy সাধারণতঃ ফুসফুসের অন্যান্য অসুখের সংগে হতে দেখা যায়। এই সব অসুখের মধ্যে নিউমোনিয়া, ফুসফুসের যক্ষ্মা, ফুসফুসের collapse, ফ্রাইব্রোসিস, bronchiectasis, ফুসফুসের ফোঁড়া, গ্যাংগ্রীন, infarct ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুকের খাঁচার কোন অসুখ, পাঁজরের অসুখ, কিডনীর দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহে, septicaemia, pyaemia-তে এই ধরনের প্লুরিসি হতে দেখা যায়।

এই অসুখে রোগীর বুকে অত্যন্ত ব্যথা অনুভূত হয়। রোগীর শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে। বেশী জোরে শ্বাস নিলে ব্যথা বেড়ে যায়। কাশি হলে এবং বেশী নড়াচড়া করলেও ব্যথা বেশী হয়। এই ব্যথা রোগীকে খুবই কাহিল করে ফেলে এবং ব্যথার চোটে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এর সংগে রোগীর জ্বর হতে পারে। রোগীর বুকের শ্বাসপ্রশ্বাসের নড়াচড়া কম থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়। অনেক সময় বুকে চাপ দিলেও রোগী বুকে ব্যথা অনুভব করে। স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুনলে friction rub শোনা যায়।

এই সব রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে বিছানায় শুইয়ে রাখতে হয়। রোগীর খাদ্যের এবং পুষ্টির দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। বুকের আক্রান্ত দিকে ভালোভাবে strapping করে রাখলে ব্যথা খানিকটা কমে। খুব বেশী ব্যথা হলে ব্যথানিবারক ওষুধ, এমন কি মরফিনও দেওয়া যেতে পারে। প্রচুর অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধ দিতে হয়। আনুষংগিক অসুখের চিকিৎসাও বিধিমত করার দরকার।

প্লুরিসির সংগে effusion থাকলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা যক্ষ্মারোগের আক্রমণের জন্যই হয়। এ ক্ষেত্রেও প্রথম দিকে রোগীর বুকে ব্যথা হয় এবং রোগীর ঘুসঘুসে শুকনো কাশি হতে থাকে। রোগীর জ্বর হতে থাকে—১০২° / ১০৩° ফাঃ তাপমাত্রার বেশীও হতে পারে। প্লুরার মধ্যে effusion হয়ে গেলে ব্যথা অনেক কমে যায়। অনেক বেশী জল জমলে সেই দিকের ফুসফুস অনেকাংশে চুপসে থাকে—collapse থাকে, সেক্ষেত্রে রোগীর শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। এক্ষেত্রে mediastinum অন্যদিকে সরে যেতে দেখা যায়। রোগী আক্রান্ত বুকের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে থাকে। রোগী আধশোয়া মাথা উঁচু করে রাখলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সুবিধা হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে রোগীর বুকের নড়াচড়া খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। আক্রান্ত জল জমা জায়গায় কোন শ্বাসপ্রশ্বাস শোনা যায় না। বুকের একটি x'ray করলে রোগনির্ণয় সহজ হয়।

এই রোগীকে খুবই যত্নের সংগে চিকিৎসা করতে হয়। প্রয়োজনে শল্য-চিকিৎসার সাহায্যে বুকের fluid বের করে দিতে হয়। রোগীকে বহুদিন ধরে পরিপূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হয়। যক্ষ্মার জন্য বিধিমত স্ট্রেপটোমাইসিন, PAS, INH ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। অন্য জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধে অন্য অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দেওয়া দরকার। খাদ্য এবং পুষ্টির দিকেও নজর দিতে হবে।

Angina pectoris :

এই অসুখে হৃৎপিন্ডের পেশীসমূহে রক্ত সরবরাহ কমে যাওয়ার জন্য বুকে প্রভূত ব্যথা হয়। সাধারণতঃ অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে হৃৎপিন্ডের কাজ বেড়ে গেলে এই ব্যথা অনুভূত হয়, আবার বিশ্রাম নিলে এই ব্যথা কমে যায়। করোনারী ধমনীর রক্ত প্রবাহে বাধা সৃষ্টির ফলেই এই অসুখ হয়। চল্লিশ বছরের বেশী বয়সে করোনারী ধমনীতে atheroma সৃষ্টিই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর জন্য দায়ী। অনেক সময় aortic stenosis অসুখেও এই ধরনের বুকের ব্যথা হতে পারে। অত্যধিক রক্তাল্পতা ঘটলে এই ধরনের বুকের ব্যথা হতে পারে। সিফিলিস জনিত করোনারী sclerosis হলেও angina pectoris হতে পারে।

এই অসুখে সাধারণতঃ বুকের মধ্যে মোটামুটিভাবে sternum-এর কাছে ব্যথা অনুভূত হয়। এর পর বুকের বাম দিকে এবং ডান দিকে এই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। তবে বেশীর ভাগ সময়ে বুকের বাম দিকেই ব্যথা থাকে। এই ব্যথা হাতে, ঘাড়ে, গলায়, চোয়ালে এবং পেটের epigastrium-এও ছড়িয়ে পড়ে। বাম কাঁধে, বাম উপর হাতে, নীচের হাতে এমন কি আঙুলেও ব্যথা নির্দেশিত হয়। এই ধরনের ব্যথা খুবই ভয়ংকর ধরনের হয়, যেন বুকে চাপ সৃষ্টি হয়, crushing এবং constricting ধরনের হয়। এই ব্যথা শ্বাসপ্রশ্বাসের কমবেশীতে কমে না বা বাড়ে না। প্রথম ব্যথা আরম্ভ হয় অত্যধিক পরিশ্রমের পর কিন্তু শেষে চলা ফেরার পরে, খাবার খাওয়ার অব্যহিত পারে, অত্যধিক দুশ্চিন্তায় এমন কি অনেক সময় কোন শারীরিক শ্রম না করলেও বুকে ব্যথা অনুভূত হতে পারে। অনেক সময় ঘুমের মধ্যেও কোন রকম খারাপ স্বপ্ন দেখেও বুকে ব্যথা হতে পারে এবং তার ফলে ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

এই ধরনের বুকের ব্যথা খুব কম সময়ের কয়েক মিনিটের মত স্থায়ী হয়। বিশ্রাম নিলে নিজে থেকেই ব্যথা কমে যায়। প্রথম দিকে ব্যথা অনেক পর পর আসে, কিন্তু শেষের দিকে খুব অল্প সময় পরেই ব্যথা আসতে পারে। দুই ব্যথার মধ্যবর্তী সময়ে রোগী অল্প ধরনের বুকে ব্যথা অনুভব করতেও পারে। ব্যথার সময়ে রোগীর মুখের ভাব বদলে যায়, ভয় পেয়ে যায়, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে পড়ে। এ সময় নাড়ীর গতি অল্প বাড়তেও পারে আবার কমতেও পারে। রক্তচাপ কিছুটা বাড়তে পারে। ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম করলে অনেক সময় হৃৎপিন্ডের অসুস্থতা বোঝা যায়। আবার অনেক সময় কোন কিছু পাওয়া নাও যেতে

পারে। সেক্ষেত্রে কিছুটা ব্যায়াম করানোর পর ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম করলে সুবিধা হতে পারে।

এই অসুখে হঠাৎ myocardial infarction হতে পারে। সুতরাং শুরু থেকেই এই অসুখের বিধিমত চিকিৎসা দরকার। এই বুকের ব্যথার যদি কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তার চিকিৎসা করা দরকার। অত্যধিক রক্তাল্পতা থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে। আনুষংগিক উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, মেদবৃদ্ধি ইত্যাদি অসুখ থাকলে তার চিকিৎসা করা দরকার। রোগী যদি অত্যধিক ধূমপানে অভ্যস্ত থাকে তবে ধূমপান একেবারেই ছাড়তে হবে। খাওয়া দাওয়া নিয়মিত এবং পরিমিত হওয়া দরকার। মানসিক দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা, ভয়ভাবনা ইত্যাদি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। খুব বেশী ভর-পেট খাওয়া উচিত নয়—খাওয়ার পরেই শ্রমসাধ্য কাজ করা উচিত নয়। প্রয়োজনে কাজের ধারা বদলাতে হবে। বিশ্রাম ঠিকমত নিতেই হবে।

এই অসুখে নানাধরনের ওষুধের ব্যবহার করা হয় যাতে করোনারী ধমনীতে প্রসারণ ঘটে এবং তার ফলে রক্তপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। Glyceryl trinitrate, amyl nitrite, octyl nitrite ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। রোগীর ভয়-ভাবনা উত্তেজনা বেশী থাকলে রোগীকে ঘুমের ওষুধ, ডায়াজিপাম ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। অনেক সময় anticoagulant ওষুধও দেওয়া হয়। অনেক সময়ে antithyroid ওষুধ, রেডিও অ্যাকটিভ আয়োডিন দেওয়া হয়ে থাকে। β adrenergic blocker ওষুধ দিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। Monoamine oxidase inhibitor ওষুধও দেওয়া যেতে পারে।

Myocardial infarction :

এই অসুখে হৃৎপেশীতে হঠাৎ necrosis বা পচন ঘটে। সাধারণতঃ হৃৎপিন্ডের করোনারী ধমণীতে রক্তপ্রবাহ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার ফলেই এটি ঘটে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে করোনারী থ্রম্বোসিস থেকেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। সাধারণতঃ পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের চেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়। যাদের উচ্চ রক্ত চাপ থাকে, যাদের মেদবৃদ্ধি বা ডায়াবেটিস থাকে তাদের এই অসুখ বেশী হতে দেখা যায়। যে কোন বয়সে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে এই অসুখ হতে পারে, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চল্লিশ বছর বয়সের বেশী রোগীদেরই এই অসুখ হয়। খাদ্যাভ্যাসের

উপরও এই অসুখ কিছুটা নির্ভর করে, রক্তে কোলেস্টেরল বেশী থাকলে করোনারী ধমণীতে atheroma হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

এই অসুখের উপসর্গের মধ্যে বুকে ব্যথা সব থেকে উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় এদের আগে থেকেই angina pectoris-এর ব্যথায় ভোগে। আসল ব্যথা আরম্ভ হওয়ার আগে থেকেই রোগীর শরীর ম্যাজ ম্যাজ করতে পারে, অল্প স্বল্প বুকে অস্বস্তিও থাকতে পারে। তবে এই ইনফার্কশনের ব্যথা অকস্মাৎ আসে এবং খুবই তীব্র ধরনের হয়। দিনের যে কোন সময় হতে পারে, এমন কি ঘুমের মধ্যেও হতে পারে। এই ব্যথা বুকের মাঝখানে sternum-এর নীচে আরম্ভ হয় তারপর বাম দিকে এমন কি ডান দিকেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। বাম দিকে কাঁধে, হাতে, গলায়, চোয়ালে এমন কি পেটের epigastrium-এও এই ব্যথা নির্দেশিত হয়। এই ব্যথা এত প্রচন্ড হয় যে রোগী নড়াচড়া করতে পারে না। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, অনেকে ছটফট করতে থাকে। এই ব্যথা বিশ্রামেও কমে না, দিনের পর দিন এই ব্যথা থাকতে পারে।

এই ব্যথার সংগে রোগী নাড়ীর গতি দ্রুত হয়ে পড়ে, রক্তচাপ অনেক কমে যেতে পারে। রোগীর শরীর ঝিম ঝিম করে, রোগীর ঘাম হতে থাকে, রোগী বমি করতে পারে। রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। রোগীর শক্ হয়। রোগীর শরীর ঠান্ডা হয়ে যেতে থাকে, ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে, রোগী ভয়ে ভাবনায় দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়ে।

এই ব্যথা এবং শকের সংগে রোগীর heart failure হতে দেখা যায়। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। রোগীর ফুসফুসে moist sound পাওয়া যায়—এমন কি congestive cardiac failure, pulmonary oedema পর্যন্ত হতে পারে। রোগী হৃৎস্পন্দনের ছন্দপতন ঘটতে পারে (dysrhythmia)। Extrasystole, auricular বা ventricular tachycardia অথবা auricular fibrillation হতে পারে। আক্রান্ত হবার প্রথম ঘন্টার মধ্যেই শতকরা ২০ ভাগ ক্ষেত্রে ventricular fibrillation হতে দেখা যায়।

অনেক সময় রোগীর অল্প স্বল্প জ্বরও হতে পারে। রোগীর রক্ত পরীক্ষা করলে শ্বেতকণিকার আধিক্য এবং erythrocite sedimentation rate বেশী হতে দেখা যায়। রোগীর একটি ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম করা একান্ত আবশ্যক। তবে ব্যথা আরম্ভ হওয়ার সময় এবং তার পরের কয়েক ঘন্টার মধ্যে ইলেকট্রো-

কার্ডিওগ্রাম করলে অস্বাভাবিক কিছু ধরা নাও পড়তে পারে। ইলেকট্রোকার্ডিও-গ্রাম করলে হৃৎপিণ্ডের ঠিক কোন জায়গায় infarction হয়েছে তা বোঝা যায়, হৃৎপিণ্ডের dysrhythmia থাকলে তা নির্ণয়নেও প্রভূত সাহায্য হয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীর cyanosis হয় এবং central venous pressure বেড়ে যায়। হৃৎপিণ্ডজনিত এই shock-এ রোগীর রক্তচাপ অত্যন্ত হ্রাস পায় এবং শরীরের অম্লতা (metabolic acidosis) বৃদ্ধি পায়।

এই myocardial infarction-এর চিকিৎসা তাৎক্ষণিক হওয়া দরকার, কেননা রোগীর আক্রান্ত হওয়ার প্রথম দিকেই মৃত্যুর আশংকা অনেক বেশী থাকে। যদি ঠিক সময়ে পর্যাপ্ত চিকিৎসা করা যায়, তবে অনেক রোগীই মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে।

প্রথম থেকেই রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে। কোনরকমের দুশ্চিন্তা, ভয়ভাবনা করা চলবে না। রোগীর প্রথম দিকে খাওয়া দাওয়া, প্রস্রাব, পায়খানা সবই সাবধানে করতে হবে। রোগী যাতে ভালোভাবে ঘুমুতে পারে তাও দেখতে হবে। রোগীর সেবাসুশ্রূষা (nursing) খুবই ভালো হওয়ার দরকার।

রোগীর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে, রোগীর শক্ হয়—সুতরাং রোগীকে অক্সিজেন দিতে হবে। নাকে ক্যাথেটারের সাহায্যে অক্সিজেন দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার। রোগী বুকে প্রচণ্ড ব্যথা পায় সেজন্য ব্যথানিবারক ওষুধ যেমন মরফিন, পেথিডিন প্রয়োগ করা উচিত। এই ওষুধ প্রয়োজন মত শিরাপথে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। রোগীর ভয়ভাবনা দূর করার জন্য ডায়াজিপাম দিতে হতে পারে। প্রচণ্ড ব্যথায় রোগীর শরীরে catecholamine অত্যধিক বেড়ে যায় এবং তার ফলে রোগীর হৃৎপিণ্ডের কাজ এবং রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়, তবে রোগীকে ব্যথানিবারক ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলে সেই catecholamine নিঃসরণ কমতে সাহায্য হয় এবং তার ফলে dysrhythmia-ও কমে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড দিয়েও ব্যথা নিবারন করা যেতে পারে। এতে রোগীকে বেশী পরিমাণে নার্কোটিক ওষুধ দিতে লাগে না এবং তার জন্য রক্তচাপ জনিত উপসর্গও কম হতে পারে।

রোগীকে শিরাপথে জলীয় পদার্থ দিতে হবে। রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য vasopressor ওষুধ দিতে হবে। শরীরের অম্লতাবৃদ্ধি ঘটলে শিরাপথে সোডিয়াম বাইকার্বো-

নেট দেওয়া দরকার। হাৰ্দউৎপাদ বাড়ানোর জন্য আইসোপ্রেনালিন দেওয়া যেতে পারে। Ventricular filling প্রেসার কমানোর জন্য এবং ইনফার্কসন জনিত শোথ কমানোর জন্য frusemide অথবা ম্যানিটল শিরাপথে দিতে হবে। Steroid ওষুধ দেওয়া হয়। রক্তে পটাশিয়াম লেভেলের গন্ডগোল থাকলে তার বিধিমত চিকিৎসা করতে হবে। কোন রকমের dysrhythmia থাকলে, heart block থাকলে তারও পর্যাপ্ত চিকিৎসা করতে হবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রোগী ventricular fibrillation হয়েই মারা যায়। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে defibrillation করাও হয়।

আধুনিককালে এই সব myocardial infarction-এর রোগীদের intensive coronary care unit-এ ভর্তি করে চিকিৎসা করা হয়। এতে সব সময়ের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা যায়। সব রকম monitoring এখানে করা যায়। প্রয়োজনমত সব ওষুধও এখানে হাতের কাছে পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে চিকিৎসা করলে এই অসুখের মৃত্যুহার কমানো যেতে পারে। এই অসুখ আধুনিককালে খুবই বেশী দেখা যায় এবং এর মৃত্যুহার সাধারণতঃ অনেক বেশী। সুতরাং এর তাৎক্ষণিক চিকিৎসাও পর্যাপ্ত হওয়া দরকার। হাসপাতালে ভর্তি করার আগেও রোগী যাতে সুচিকিৎসা পায় সেদিকেও নজর দেওয়া উচিত।

Acute coronary insufficiency :

যখন হৃৎপিন্ডের মাংসপেশী সমূহের অক্সিজেন চাহিদা এবং অক্সিজেন সরবরাহের মধ্যে তারতম্য ঘটে তখনই এই ধরনের অসুখ হয়। সাধারণতঃ সম্পূর্ণ coronary occlusion ছাড়া অন্যভাবে আকস্মিক অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে গেলে অথবা হঠাৎ রক্তসরবরাহ কমে গেলে এই ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। অনেক কারণেই এটি হতে পারে :

১। অত্যধিক রক্তপাত হলে, শক্ হলে বা অত্যধিক রক্তচাপহ্রাস হলে
২। acute heart failure হলে
৩। শরীরের অক্সিজেনের অভাব ঘটলে
৪। কারবন মনোক্সাইড বিষক্রিয়ায়
৫। ফুসফুসে embolism হলে

৬। অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম করলে

৭। অত্যধিক মানসিক দুশ্চিন্তায়

৮। হঠাৎ রক্তচাপবৃদ্ধি ঘটলে

৯। Paroxysmal tachycardia হলে

এই অসুখে রোগী বুকে ব্যথা অনুভব করে। এতে angina pectoris-এর মতই ব্যথা হয়, তবে অনেকক্ষন বেশী স্থায়ী হয়। এক্ষেত্রেও একটি ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম করলে সুবিধা হয়।

এই অসুখের চিকিৎসাতেও গ্লিসারিন ট্রাইনাইট্রেট দেওয়া হয়। তবে ভালোভাবে ব্যথা কমানোর জন্য মরফিন ইঞ্জেকশন দিতে হতে পারে। এদের anticoagulant therapy দিতে হয়। শিরাপথে হেপারিন দেওয়া হয়। যে অসুখের জন্য এই ধরনের করোনারী insufficiency হচ্ছে, তার কারণ নির্ণয় করা দরকার এবং তার বিধিমত চিকিৎসা করা দরকার।

পরিশ্রমের পর বুকের ব্যথা অথবা হার্ট ফেলিওর থাকলে রোগীকে খুবই সাবধানে থাকতে হয়। রোগীকে দুশ্চিন্তা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকতে হবে। প্রয়োজনে রোগীকে তার প্রাত্যহিক কাজকর্ম সীমিত করা দরকার। সাধ্যমত বিশ্রাম নিতেই হবে। ধূমপান ছেড়ে দেওয়া একান্ত দরকার।

Acute Cor Pulmonale / Pulmonary embolism :

এক্ষেত্রে একটি বা তার চেয়েও বেশী বড় embolus ফুসফুসীয় রক্ত প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে এবং তার ফলে হৃৎপিন্ড এবং রক্ত সংবহনতন্ত্রে নানা ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। শিরা গাত্র থেকে thrombus ছিঁড়ে গিয়ে শিরাপথ দিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ফুসফুসীয় ধমনীতে আটকা পড়ে। উপসর্গ নির্ভর করে কত বড় embolus তার উপর। সাধারণতঃ পায়ের মাংসপেশীর মধ্যেকার শিরার মধ্যেই thrombus তৈরী হয়। অপারেশনের পর, বিশেষতঃ পেটের এবং তলপেটের অপারেশনের পর, প্রসব করার পর এই ধরনের embolism ঘটতে দেখা যায়। দীর্ঘকালীন congestive cardiac failure-এর রোগীদের এই embolism হতেও দেখা যায়।

Main pulmonary artery অথবা তার অন্য ধমনীতে বাধাসৃষ্টি হলে আকস্মিকভাবে ভয়ংকর ধরনের হৃৎপিন্ড এবং রক্ত সংবহনতন্ত্রের গন্ডগোল দেখা

দেয়। রোগী বুকে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করে, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হলে যে ধরনের ভীষণ বুকের ব্যথা হয় প্রায় সেই ধরনেরই ব্যথা হতে থাকে। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন হতে থাকে—শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হতেও থাকে। রোগীর মাথা ঘোরে, শরীর ঝিমঝিম করে, ছটফট করে, অনেকসময় খিঁচুনি হতেও দেখা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগী পেটেও ব্যথা অনুভব করে। রোগীর কাশির সংগে রক্তও দেখা দিতে পারে।

রোগীর নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, রক্তচাপ অত্যধিক হ্রাস পায়, রোগীর শক্ হয়। রোগী ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, ঘাম হতে থাকে। রোগীর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটতে পারে—নীল হতে থাকে—cyanosis হয়। Jugular venous প্রেসার বেড়ে যায়, লিভার engorged হয়ে পড়ে। হৃৎপিণ্ডে triple rhythm শোনা যেতে পারে। পালমোনারী এরিয়াতে systolic murmur শোনা যেতে পারে।

এই massive pulmonary embolism থেকে রোগী বেঁচে গেলেও রোগীর pulmonary infarction হতে পারে। রোগীর জ্বর হয়, রক্তে শ্বেতকণিকার আধিক্য দেখা দেয়। আক্রান্ত দিকের প্লুরায় প্রদাহ ঘটে এবং তার জন্য প্লুরাজনিত ব্যথা হয়। রোগীর কাশি হয়, কফে রক্ত দেখা যায়। ফুসফুসের আক্রান্ত জায়গা consolidated অবস্থায় থাকে। অনেক সময় এতে pleural rub এবং pleural effusion হয়। এই সব অসুখে বুকের x-ray এবং ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাম করার দরকার হয়।

এই অসুখের চিকিৎসায় প্রথমেই দেখা উচিত যাতে এই অসুখ আগে থেকেই প্রতিরোধ করা যায়। অসুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ অপারেশনের পরে রোগীকে প্রয়োজন ছাড়া বহুদিন বিছানায় শুইয়ে রাখা উচিত নয়। মাঝে মাঝে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়। পায়ের শিরায় যাতে কোন প্রদাহ না ঘটে—যাতে thrombophlebitis না ঘটে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। যেহেতু হার্ট ফেলিওর হলে এই অসুখের সম্ভাবনা বেশী থাকে, সুতরাং প্রথম থেকেই এই ফেলিওরের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা করা বিধেয়। যদি পায়ের মাংসপেশীতে venous thrombosis হয় তবে তারও বিধিমত চিকিৎসা করতে হবে এবং প্রয়োজনে anticoagulant therapy দিতে হবে।

Pulmonary embolism-এর চিকিৎসা তাৎক্ষণিক হওয়া দরকার। রোগীকে

চিৎভাবে শুইয়ে রাখতে হয়। মাথা একটু নিচু লেভেলে রাখলে মস্তিষ্কে রক্ত-সরবরাহ ঠিক থাকে। রোগীকে অক্সিজেন দিতে হবে। শিরাপথে জলীয় পদার্থ দিতে হবে। ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধও দিতে হবে। প্রয়োজনে শল্য-চিকিৎসার সাহায্যে embolus বের করে দিতে হয়।

Air embolism :

যদি systemic vein দিয়ে কোনরকমে বাতাস চলে যায় তবে এই air embolism ঘটে। সেই বাতাস হৃৎপিণ্ডের ডানদিকে যায় এবং সেখানে রক্তের সংগে মিশে ফেনার সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে pulmonary artery দিয়ে রক্তপ্রবাহ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। রক্ত এবং বাতাসের সংমিশ্রণে যে শব্দের সৃষ্টি হয় তা স্টেথোস্কোপ ছাড়াই বুকে শোনা যায়। অবশ্য বলা হয় প্রায় ২০০ মিলিলিটারের মত বাতাস গেলেও উপসর্গ বেশী দেখা দেয় না। এই কম পরিমাণের বাতাস মোটামুটি শরীরে শোষিত হয়ে যায়। যে সব কারণে এই air embolism ঘটে তা মোটামুটি নিম্নরূপ :

১। মাথা বা গলায় কোন অপারেশনের সময়, jugular vein-এর ফুটা দিয়ে নেগেটিভ প্রেসারে বাতাস ভিতরে ঢুকে যেতে পারে।
২। রক্ত সঞ্চালনের সময় ঠিকমত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না নিলে।
৩। ফ্যালোপিয়ান টিউবে insufflation করার সময়
৪। কৃত্রিমভাবে pneumoperitonium করার সময়
৫। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে প্লাসেন্টার জায়গায় কোন অস্বাভাবিক ক্ষত থেকে

রোগীকে কৃত্রিমভাবে pneumothorax করার সময় বাতাস pulmonary vein দিয়ে চলে যেতে পারে। এতে করোনারী এবং মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রেও প্রচণ্ড ধরনের বুকের ব্যথা হয় এবং অল্প পরিমাণ বাতাসেই রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

নাইট্রোজেন embolism :

যে সব লোক খনিগর্ভে বা সমুদ্রগর্ভে অত্যধিক চাপের মধ্যে কাজ করে, তারা যখন হঠাৎ স্বাভাবিক বায়বীয় পরিমণ্ডলে চলে আসে, তখন এই ধরনের

embolism হতে পারে। চাপ হঠাৎ কমার সময় বাতাসের বুদবুদ রক্ত থেকে বেরিয়ে আসে, অক্সিজেন এবং কারবন ডাইঅক্সাইড সহজেই শোষিত হয় এবং অপসারিত হয় কিন্তু নাইট্রোজেন শোষিত হতে পারে না। সেই নাইট্রোজেনই শরীরে ক্ষতিসাধন করে। এই নাইট্রোজেন চর্বিতে দ্রবন হয়, তাই মস্তিষ্কে এবং চামড়ার নীচেকার চর্বিতে এগুলি জমা হতে দেখা যায়। যখন নাইট্রোজেন বেরিয়ে আসে, স্পাইনাল কর্ড এবং প্রান্তিক নার্ভসমূহে প্রভৃত ক্ষতি করে। তার ফলে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, রোগীর হাত পা অসাড় হয়ে যেতে পারে, এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। এই অসুখকে decompression sickness অথবা Caisson disease বলে।

Fat embolism :

হাড় ভেঙে যাওয়ার পর ছোট ছোট চর্বির কণা অনেকসময় ছোট ছোট শিরার মধ্যে দিয়ে গিয়ে এই fat embolism-এর সৃষ্টি করে। অনেক হাড় ভেঙে গেলে এই ধরনের embolism খুবই সাংঘাতিকভাবে হতে দেখা যায় এবং এর ফলে অনেকসময়ই মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রেও রোগীর বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের ব্যথার মতই। রোগীর শ্বাসকষ্ট হয়। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। রক্তচাপ অত্যধিক কমে যায়—রোগীর cyanosis হয়। রোগীর শক্ হয়। কোনরকমে এই চর্বিকণাসমূহ মস্তিষ্ক, কিডনী, চামড়া অথবা অন্য জায়গার ক্যাপিলারীতে আটকা পড়লে সেখানকার নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

ফুসফুসের massive collapse :

ব্রংকাশের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় কোন বাইরের জিনিষ, রক্ত, secretion যেয়ে বাধাসৃষ্টি করলে, ব্রংকাশে কোন টিউমার হলে, ব্রংকাশ যে কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হলে এই ধরনের ফুসফুসের collapse (চুপসে যাওয়া) হতে পারে। Mediastinum-এ কোন টিউমার, aneurism বা পেরিকার্ডিয়ামের effusion ব্রংকাশের উপর চাপ সৃষ্টি হলেও এই ধরনের ফুসফুসের collapse হয়।

ফুসফুসের collapse হলে সেই আক্রান্ত জায়গা লাল হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়, স্বাভাবিক ফুসফুসের মত সে জায়গায় হাওয়া থাকে না—চুপসে থাকে।

বেশী ধরনের massive collapse হলে হৃৎপিণ্ড এবং mediastinum-এর উপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ে এবং তার জন্যও নানাধরনের উপসর্গ দেখা দেয়।

Massive collapse সাধারণতঃ আকস্মিকভাবেই হয়। রোগী বুকে ব্যথা অনুভব করে। সাধারণতঃ বুকের নীচের দিকেই ব্যথা হয়। Sternum-এর নীচের দিকেও ব্যথা হতে পারে। রোগীর শ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হয়। রোগীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে, অনেক সময় শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে—cyanosis হয়। রোগীর কাশি হতে পারে, তবে কফ বেশী ওঠে না। রোগীর আক্রান্ত দিকের বুক শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে বিশেষ নড়াচড়া করে না। শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে পাঁজরা ভিতরের দিকে ঢুকে যেতে দেখা যায়। আক্রান্ত দিকে হৃৎপিন্ডের apex beat সরে যায়। শ্বাসনালীও সরে যায়। স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুনলে সে দিকে শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ শোনা যায় না। বুকের একটি x-ray করলে রোগ নির্ণয় সহজ হয়।

এই সব রোগীকে খুবই সতর্কতার সংগে চিকিৎসা করা দরকার। অপারেশনের পর অথবা অজ্ঞান অবস্থায় কোন secretion, রক্ত ইত্যাদি যাতে শ্বাসনালীতে না যায় তা সবিশেষ দেখা দরকার। রোগীকে অপারেশনের পর ভালোভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়াও দরকার। Collapse হয়ে গেলে রোগী যাতে ভালোভাবে কাশতে পারে এবং কফ বের করে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগীর শ্বাসনালী পরিষ্কার করার জন্য bronchoscopy করে শোষন করারও দরকার হতে পারে। বাইরে থেকে কোন চাপ সৃষ্টি হলে, pleural effusion হলে, টিউমার হলে, সে সবের বিধিমত চিকিৎসা করতে হবে। পরেও বুকের x-ray করে দেখতে হবে যে ফুসফুস ঠিকমত স্বাভাবিক হয়ে এসেছে কি না।

ইন্টারকস্টাল নিউর‍্যালজিয়া (Intercostal neuralgia) :

ইন্টারকস্টাল মাংসপেশীর রিউম্যাটিক অসুখে, ফাইব্রোসাইটিসে অথবা ইন্টারকস্টাল নার্ভের প্রদাহে এই ধরনের নিউর‍্যালজিয়া হতে পারে। এতে রোগী বুকে তীক্ষ্ন ধরনের ব্যথা অনুভব করে। সাধারণতঃ রোগী শ্বাস নেওয়ার সময় ব্যথা আরও বেড়ে যায়। বুকের একদিকেই এই ব্যথা হয়, তবে দুইদিকেই হতে পারে। এর সংগে পিঠে ব্যথাও হতে পারে। ফাইব্রোসাইটিস হলে

ইন্টারকষ্টাল মাংসপেশীতে nodule বোঝা যেতে পারে। সেখানে চাপ দিলেও রোগী ব্যথার কথা বলে। আক্রান্ত নার্ভের নানা জায়গায় চাপ দিলেও রোগীর ব্যথা অনুভব হয়।

এতে রোগীর আক্রান্ত জায়গায় গরম সেঁক, radiant heat, infrared radiation অথবা short wave diathermy করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। Nodule বা গুটিকা থাকলে অপারেশন করে বের করে দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে ম্যাসাজ করলেও রোগী আরাম বোধ করে। ব্যথা কম হলে physiotherapist-এর পরামর্শ মত শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম (breathing exercise) করানো দরকার।

অষ্টম অধ্যায়
মাংসপেশীর ব্যথা

মাংসপেশীসমূহে ব্যথা (Muscle pain) :

মাংসপেশীসমূহে ব্যথার জন্য প্রধানতঃ দায়ী বিভিন্ন ধরনের kinin। যখন মাংসপেশীসমূহে একটি নির্দিষ্ট ছন্দে সংকোচন ঘটে এবং সেখানকার রক্তপ্রবাহ পর্যাপ্ত থাকে তখন সেখানে ব্যথা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু কোন কারণে যদি রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়, তখন সেখানে প্রচন্ড ব্যথার সৃষ্টি হয়। সংকোচনের পরেও ব্যথা অনুভূত হতে পারে। সেই ব্যথা অনেকক্ষণ থাকে যতক্ষণ না সেখানকার রক্তপ্রবাহ ঠিকমত হয়। যখন কোন মাংসপেশী পর পর সংকোচন হতেই থাকে এবং মধ্যবর্তী সময়ে কোন প্রসারণ না ঘটে তবে সেখানেও প্রভূত ব্যথা অনুভূত হয়, কেননা সংকোচনের ফলে রক্তনালীতে চাপ পড়ে এবং রক্তসরবরাহ ব্যাহত হয়। এই মাংসপেশী সংকোচনের ফলে সেখানে স্থানীয় জায়গায় এক রাসায়নিক পদার্থ p factor উৎপন্ন হয়। এইটিই ব্যথা বেদনার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। রক্তপ্রবাহ ঠিক এবং পর্যাপ্ত থাকলে এই p factor খুব অল্প সময়েই সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এবং তার ফলে ব্যথা বেদনারও উপশম ঘটে। এই p factor একটি বিশেষ ধরনের kinin অথবা পটাশিয়ামও হতে পারে।

করোনারী insufficiency হলে হৃৎপেশীতে রক্তসরবরাহ ব্যাহত হয় এবং তার ফলে p factor-এর আধিক্য ঘটে এবং রোগীর বুকে প্রচন্ড ব্যথা হয়। আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে সেই স্থানের রক্তসরবরাহ স্বাভাবিক হয় এবং তার ফলে p factorও সেখানে বেশী জমতে পারে না। Buerger's disease-এও দেখা যায় যে রোগী কিছু হাঁটবার বা চলাফেরা করার পর পায়ে ব্যথা অনুভব করে। আবার খানিক বিশ্রাম নিলে ব্যথার উপশম ঘটে।

স্পাইনাল নার্ভে কোন irritation হলে বিশেষতঃ কোন চাপ সৃষ্টির ফলে অথবা কোন ভাইরাস সংক্রমণের ফলে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীসমূহে spasm হয় অর্থাৎ মাংসপেশীসমূহ সংকুচিত অবস্থায় থাকে। তার ফলে সেই সব মাংস-

পেশীসমূহে খুবই ব্যথার সৃষ্টি হয়। যে কোন কারণে মাংসপেশীসমূহে cramp হলে সেখানেও প্রচন্ড ব্যথার সৃষ্টি হয়। Peripheral neuritis হলেও সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীসমূহে প্রচন্ড ব্যথা হয়।

Polymyositis রোগীর ক্ষেত্রেও খুব বেশী মাংসপেশীতে ব্যথা হয়। Myalgia rheumatic হলেও রোগী প্রচন্ড ব্যথার কষ্টে ভোগে।

মাংসপেশীসমূহের ব্যথা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারণ খুঁজে পাওয়া যায় বটে, তবে অনেক সময় সঠিক কারণ বোঝা যায় না। বহুদিন ধরে মাংসপেশীসমূহে ব্যথা থাকলে সেগুলি ঠিকমত কাজ করে না এবং পরিশেষে atrophy হয়ে যায়। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে ওষুধের সাহায্যে ব্যথা কমানো যায়। পরিমিত ব্যায়াম করালেও বিশেষ উপকার হয়—মাংসপেশীসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে না। অনেক সময় গরম সেঁক দিলেও ভালো হয় কেননা এতে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীসমূহে রক্ত সরবরাহ উন্নতি ঘটে।

পেটের অভ্যন্তরীণ (visceral) ব্যথায় অনেক সময় দেখা যায় যে কাছাকাছি skeletal মাংসপেশীসমূহে সংকোচন ঘটে। এই প্রতিবর্তী সংকোচন প্রায়ই পেটের মাংসপেশীসমূহে দেখা যায়। এই সংকোচন খুবই বেশী হয় যখন আভ্যন্তরীণ পেরিটোনিয়ামে প্রদাহ হয়। তবে পেরিটোনিয়াম ছাড়া আভ্যন্তরীণ অংগপ্রত্যংগের প্রদাহেও এটি ঘটতে পারে। অনেক সময় এই সংকোচনের সঠিক ব্যথা খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে এটা ঠিক যে এই muscle spasm এবং rigidity-তে আক্রান্ত অংগপ্রত্যংগের ক্ষতি কম হয় এবং রীতিমত সেগুলিকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। রোগনির্ণয়েও সাহায্য হয়।

পেটের আভ্যন্তরীণ অংগপ্রত্যংগে প্রদাহে অনেক সময় পেটের উপরিভাগে চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে অর্থাৎ সে জায়গায় tenderness থাকে। এই উপসর্গটিও রোগনির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়। এই tenderness সাধারণতঃ অনেক কারণেই হতে পারে। প্রথমতঃ অংগপ্রত্যংগের প্রদাহের ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যথা অনুভূতি খুব বেড়ে যায়, দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তরীণ প্রতিবর্তী-ক্রিয়ায় কিছু autonomic পরিবর্তন হওয়ার ঘটনা ঘটে এবং সব শেষে প্রদাহের ফলে পেটের মাংসপেশীসমূহে প্রতিবর্তীক্রিয়ায় সংকোচন ঘটে অর্থাৎ spasm হয়।

মাংসপেশীসমূহে প্রদাহ বা আঘাত :

মাংসপেশীসমূহে প্রদাহ হলে তাকে myositis বলে, মাংসপেশীর মধ্যকার fibrous কোষসমূহে প্রদাহ হলে তাকে fibrositis বলে। মাংসপেশীসমূহ যেখানে হাড়ে লাগে, সেই টেন্ডনে প্রদাহ ঘটলে তাকে tendinitis বলে। এই টেণ্ডনের সংগে synovial sheath-এ প্রদাহ হতে পারে, তাকে tenosynovitis বলে। আঘাতের ফলে, হাড়ে ফ্রাকচার হলে অর্থাৎ ভেঙে গেলে মাংসপেশীসমূহে strain হতেও পারে। কিছু rheumatic অসুখে মাংসপেশীসমূহের মধ্যে অনেক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ জমতে দেখা যায় এবং তার ফলেও প্রদাহ ঘটে। আঘাতের ফলে মাংসপেশী, টেণ্ডন ইত্যাদি অনেক সময় ছিঁড়ে যেতেও পারে।

এই সব প্রদাহে আক্রান্ত জায়গায় ভীষণ ব্যথা হয়। চাপ দিলে বা নড়াচড়া করলে ব্যথার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। সে স্থান ফুলে ওঠে। আক্রান্ত মাংসপেশীসমূহ অনেক সময় শক্ত হয়ে পড়ে। হাতে বা পায়ের অনেক মাংসপেশীতে প্রদাহ হলে সেই হাত, পা নাড়ানো যায় না, কেননা নড়লে বা কোন কাজ করলে ব্যথা বাড়ে। এই প্রদাহের ফলে সে জায়গার নার্ভও আক্রান্ত হতে পারে, তার ফলে cramp, tremor বা neuritis পর্যন্ত হতে পারে।

এর চিকিৎসায় আক্রান্ত হাত বা পা একটি সাপোর্ট দিয়ে বিশ্রামে রাখতে হবে। গরম সেঁক, ম্যাসাজ দিলে উপকার হয়। এতে ব্যথাও কমে যায়। পরিমিত ব্যায়াম করলে হাত পায়ের movement স্বাভাবিক হয়ে আসে।

পায়ের পেটির মাংসপেশীর আঘাত :

পায়ের gastrocnemius মাংসপেশীর কিছু তন্তু অনেক সময় ছিঁড়ে যেতে পারে। যখন এই মাংসপেশী খুব জোরে সংকুচিত হয়, বিশেষতঃ যখন রোগী আঙ্গুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকে তখন এই ধরনের ক্ষতি হতে পারে। ছিঁড়ে যাওয়ার সময় রোগী প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করে—মনে হয় যেন পায়ে কেউ জোরে ঘুষি মেরেছে। এর পর planter flexion করতে গেলে এই মাংসপেশীর দুর্বলতা ধরা পড়ে। গোড়ালির dorsiflexion করলে রোগী ব্যথা পায়।

এক্ষেত্রে অসুখের প্রথম ২৪ ঘন্টা সাবধানে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। তারপর

কিন্তু রোগী সেই পা অল্প স্বল্প ব্যবহার করলেই ভালো হয়। ইনফ্রা রেড রে দেওয়া যেতে পারে, প্রয়োজনে সর্টওয়েভ থেরাপি দেওয়া যায়। প্রথম দিকে অল্প active exercise করানো যেতে পারে, পরে প্রদাহ এবং ব্যথা কমে যাওয়ার পর ভালোভাবে ম্যাসাজ এবং ব্যায়াম করানো হয়। প্রয়োজনে ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শমত forced passive movements করাতে হতে পারে। মাংসপেশীর মধ্যে রক্ত জমে গেলে শল্যচিকিৎসায় তা বের করে দিতে হবে এবং ছেঁড়া মাংসপেশী সেলাই করে দিতে হবে।

গোড়ালির Achilis tendon-এর rupture :

পায়ের পেটির মাংসপেশীসমূহ অত্যধিক সংকোচন ঘটলে এই ধরনের টেন্ডনের rupture হতে পারে। এতেও রোগী প্রচন্ড ব্যথা পায়। রোগী চলাফেরা করতে পারে না। পা বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই rupture যদি অসম্পূর্ণ হয় তবে রোগীকে কিছুদিন বিশ্রাম দিয়েই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি movement করতে দেওয়া হয়। ম্যাসাজ করাও চলে। তবে পুরোপুরি ছিঁড়ে গেলে রোগীকে পরিপূর্ণ বিশ্রামে রাখা দরকার। মাঝামাঝি planter flexion করে রাখলে ভালো হয়। Dorsiflexion কোনরকমেই যাতে না হয় তার দিকে নজর রাখা উচিত। প্রয়োজনে splint-এর সাহায্য নিতে হবে। ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ বিশ্রাম দিতে হবে, যাতে আক্রান্ত জায়গায় কোনরকমে টান না পড়ে তা দেখতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী শল্যচিকিৎসার দরকার হয়।

স্প্রেন (Sprain) :

এটি সাধারণতঃ হাড়ের সন্ধিস্থলের কাছাকাছি লিগামেন্টের আঘাতের ফলেই হয়। লিগামেন্টসমূহের অত্যধিক এবং অস্বাভাবিক stretching-এ কিছু লিগামেণ্টতন্তু ছিঁড়ে যায়। এর ফলে আক্রান্ত জায়গা ফুলে ওঠে, প্রচন্ড ব্যথা হয়। সন্ধিস্থলের নড়াচড়ায় ব্যথা আরও বেশী হয়। সন্ধিস্থলের mobility-ও অত্যন্ত কমে যেতে পারে। সন্ধিস্থলে অল্পস্বল্প রক্ত জমতেও পারে। শুধুমাত্র স্প্রেন হলে হাতের কোন deformity হয় না, হাড়ের কোন displacement হয় না। সন্ধিস্থল মোটামুটি স্বাভাবিক থাকে। তবে সন্ধিস্থলে অল্প

প্রদাহ দেখা যায়। বড় লিগামেন্টের বেশী ক্ষতি হলে অস্বাভাবিক mobility দেখা যেতে পারে।

Strain-ও লিগামেন্টের এক ধরনের আঘাত থেকেই হয়। এতেও লিগামেণ্টে stretching ঘটে, কিন্তু কখনোই তার স্বাভাবিক elasticity-র সীমা ছাড়ায় না। এতে কোন লিগামেণ্টের তন্তু ছিঁড়ে যায় না। তবে এক্ষেত্রেও ব্যথা, ফোলা হয়। সন্ধিস্থলে অল্প effusion-ও হতে পারে।

এই ধরনের স্প্রেন হলে আক্রান্ত হাড়ের সন্ধিস্থল বিশ্রামে রাখতে হবে। প্রয়োজনে splint বা প্লাষ্টার কাষ্ট ব্যবহার করতে হয়। তবে সন্ধিস্থলে adhesion যাতে না ঘটে তার জন্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি active movements করানো দরকার। ব্যথার জন্য এবং ফোলার জন্য আক্রান্ত জায়গায় তাপ প্রয়োগ করা দরকার। ইনফ্রা রেড আলো অথবা সর্টওয়েভ থেরাপি দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ দিতে হয়। ফোলা এবং ব্যথা কমে যাওয়ার পর দেখতে হবে যাতে হাড়ের সন্ধিস্থলের mobility স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে আসে এবং সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীসমূহের power পুরোমাত্রায় ফিরে আসে। এ সবে না সারলে, আনুষংগিক হাড় ভাঙা আছে কিনা দেখতে হবে। সেজন্য প্রথমদিকেই একটি x-ray করা উচিত।

অনেক হাড়ের সন্ধিস্থলেই এই ধরনের স্প্রেন ঘটতে পারে। তবে কব্জি এবং গোড়ালিতে এই ধরনের স্প্রেন প্রায়শই দেখা যায়। স্প্রেনের সংগে অনেক সময়ই আশেপাশের টেন্ডন, মাংসপেশী ইত্যাদিতে অত্যধিক stretching-এ ক্ষতি হতে পারে। সে সব ক্ষেত্রেও যথোচিত ব্যবস্থা নিতে হবে।

মাংসপেশীর অন্যান্য ব্যথা :

যে কোন মাংসপেশী হঠাৎ খুব বেশী ব্যবহার করলে সেই মাংসপেশীতে ব্যথা হয়। মাংসপেশীর অত্যধিক সংকোচন ঘটলে সেক্ষেত্রেও ব্যথা হয়। টিটেনাসে, খিঁচুনিতে মাংসপেশীসমূহে fasciculation হয়, এদেরও পরে মাংসপেশীসমূহে ব্যথা হয়। মাংসপেশীতে রক্ত সরবরাহ কমে গেলে মাংসপেশীতে ischaemic ব্যথা হতে পারে।

অনভ্যস্ত ব্যায়ামে বা পরিশ্রমে শরীরের মাংসপেশীসমূহে নানা ধরনের বিপাকীয় পদার্থ জমে যায়। এর ফলে ক্যাপিলারী permeability বাড়ে এবং

কোষে বেশী জলীয় পদার্থ জমে। মাংসপেশীর কোষ যদি ছিঁড়ে যায় বা ফেটে যায়, তাহলে আরও বেশী ফোলা দেখা যায়। এই সবের কারণে অনভ্যস্ত পরিশ্রমে মাংসপেশীসমূহে ব্যথার সঞ্চার হয়। স্থানীয় জায়গায় ঠান্ডা প্রয়োগ করলেও এই ধরনের ব্যথা হয়।

রিউম্যাটিক অসুখেও মাংসপেশীসমূহে প্রচন্ড ব্যথা হয়। এটি অল্প ধরনের মাংসপেশীর প্রদাহের জন্য এবং কিছুটা fibrous কোষে ফোলার জন্যই হয়। এই ব্যথা পরিমিত ব্যায়ামে কমে যায়। মাংসপেশীর মধ্যকার fascial plane এর tension থেকেই মাংসপেশীর ব্যথা উদ্দীপনা ঘটে। মাংসপেশী-সমূহের সংকোচনের ফলেও ব্যথা উদ্দীপনা জাগে।

নবম অধ্যায়

হাড়ের নানা ব্যথা

হাড়ের নানান অসুখে প্রচণ্ড ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে। এই সব হাড়ের অসুখ মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। হাড় ভাঙা, হাড়ের সন্ধিস্থলে বা joint-এর অসুখ এবং হাড়ের অন্য অসুখ যেমন প্রদাহ, ক্যানসার —এই সবেতেই রোগীর আক্রান্ত হাড়ে এবং তার আশেপাশে ভয়ংকর ব্যথা হতে দেখা যায়। হাড়ের কিছু পুরানো ব্যথার সম্বন্ধে 'দীর্ঘস্থায়ী নানান ব্যথা' শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সাধারণভাবে হাড়ের ব্যথা সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

হাড় ভাঙা : (**Fracture of bones**) :

হাড়ের ধারাবাহিকতার ছেদ হলে তাকে হাড় ভাঙা (fracture) বলা হয়। এই ছেদ সম্পূর্ণ (complete) থাকতে পারে, আবার অনেক সময় অসম্পূর্ণও (incomplete) থাকতে পারে। সম্পূর্ণ হাড় ভাঙা দুই ধরনের হতে পারে :

ক) যখন একটি হাড় সম্পূর্ণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়—একে বলে single fracture। এটিতে হাড় আড়াআড়িভাবে, লম্বাভাবে বা বাঁকাভাবে ভাঙতে পারে।

খ) Comminuted fracture—যখন হাড় একটির বেশী ভাগে ভাঙে।

অসম্পূর্ণ হাড় ভাঙাও কয়েক প্রকারের হতে পারে। তারা নিম্নরূপ :

ক) Fissured fracture—এখানে হাড়ে শুধু চিড় খেয়ে যায়। এতে হাড়ের কোন স্থানচ্যুতি (displacement) হয় না।

খ) Greenstick ফ্রাকচার—এতে হাড় শুধু বেঁকে যায়। সাধারণতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে বড় বড় হাড়ে এই ধরনের ফ্রাকচার হতে দেখা যায়।

গ) Depressed ফ্রাকচার—এতে হাড়ের খানিকটা অংশ ভেঙে ভিতরের দিকে বসে যায়। সাধারণতঃ মাথার খুলিতে এ ধরনের ফ্রাকচার হয়।

ঘ) Cancellous ফ্রাকচার—ছোট ছোট cancellous হাড় অথবা বাড়ন্ত হাড়ের metaphyses-এর ক্ষেত্রে এই ধরনের ফ্রাকচার হয়।

এসব ছাড়াও আরও অনেক ধরনের ফ্রাকচার হতে পারে। যেমন :

Impacted ফ্রাকচার—এখানের হাড়ের একটি ভাঙা অংশ অন্য ভাঙা অংশের সংগে গেঁথে যায়।

Separation of epiphysis—এক্ষেত্রে শুধুমাত্র হাড়ের epiphyses ভেঙে সরে যায়। সাধারণতঃ শিশুদের ক্ষেত্রেই এ ধরনের ফ্রাকচার হয়।

Complicated ফ্রাকচার—যখন হাড় ভাঙার সংগে আশেপাশের স্নায়ুতন্তু এবং রক্তনালীর ক্ষতি হয়।

Fracture-dislocations—যখন হাড় ভাঙার সংগে কাছাকাছি হাড়ের সন্ধি-স্থলে dislocation ঘটে।

Closed ফ্রাকচার—যখন হাড় ভাঙার সংগে চামড়ায় কোন ক্ষত থাকে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভাঙা হাড়ের অংশের সংগে বাইরের কোন যোগাযোগ ঘটে না। একে অনেক সময় simple ফ্রাকচারও বলে।

Open ফ্রাকচার—এ ক্ষেত্রে হাড় ভাঙার সংগে চামড়াতেও ক্ষত থাকে। হাড় ভাঙার অংশ অনেক সময় চামড়া দিয়ে বেরিয়ে আসতেও পারে। এসব ক্ষেত্রে বাইরের থেকে রোগ জীবানুর সংক্রমণ হাড়ের মধ্যেও যেতে পারে। একে অনেক সময় compound ফ্রাকচারও বলে।

ফ্রাকচারের কারণ সাধারণতঃ আঘাতের ফলে অথবা আপনা থেকেই—দুই ধরনের হতে দেখা যায়। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আঘাত থেকেই ফ্রাকচার হয়। একে traumatic ফ্রাকচার বলা হয়। এই সব ক্ষেত্রে হাড়ে কোন অসুখ থাকে না, শুধু অত্যধিক আঘাতের ফলেই হাড় ভেঙে যায়। এই আঘাত আবার অনেক ধরনের হতে পারে।

১। প্রত্যক্ষ আঘাত—যখন প্রত্যক্ষভাবে হাড়ের উপর আঘাত আসে। উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে যে হাড়ের উপর আঘাত লাগে সে হাড়ই প্রত্যক্ষভাবে ভেঙে যেতে পারে। হাড়ের উপর প্রত্যক্ষ ঘুষিতেও হাড় ভেঙে যেতে পারে।

২। অপ্রত্যক্ষ আঘাত—শরীরের অন্য অংশে আঘাতের ফলে অপ্রত্যক্ষভাবে চাপের ফলে অন্য জায়গার হাড় ভেঙে যেতে পারে। রোগী পড়ে যাওয়ার সময়

হাতের উপর পড়লে সেই আঘাত অপ্রত্যক্ষভাবে clavicle-এ ফ্রাকচার করতে পারে। পায়ের আঘাতে tibia এবং fibula-তে ফ্রাকচার হতে পারে।

৩। মাংসপেশীর হঠাৎ অত্যধিক সংকোচনের ফলে অনেক সময় patella ভেঙে যেতে দেখা যায়।

ফ্রাকচারের আর একটি কারণ—spontaneous বা স্বতঃস্ফূর্ত ফ্রাকচার। এক্ষেত্রে হাড়ের কোন অসুখ থাকে এবং হাড় দুর্বল অবস্থায় থাকে। খুব অল্প আঘাতেই এক্ষেত্রে ফ্রাকচার হতে দেখা যায়।

ফ্রাকচারের বিভিন্ন উপসর্গ :

১। সাধারণ কোন দুর্ঘটনা, ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া, গাছ থেকে পড়ে যাওয়া, পা পিছলে পড়ে যাওয়া, মারামারি, ঘুষোঘুষি ইত্যাদি থেকেই ফ্রাকচার হয়। রোগী অনেক সময় নিজেই বুঝতে পারে তার হাড় ভেঙেছে।

২। আক্রান্ত হাতে বা পায়ে প্রচন্ড ব্যথা হয়। সে জায়গায় নড়াচড়া করলে ব্যথা আরও বাড়ে।

৩। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঘাতপ্রাপ্ত অংশের কাজকর্ম ব্যাহত হয়। তবে অসম্পূর্ণ ফ্রাকচার হলে অথবা যেখানে দুটি হাড় আছে—তার একটিতে ফ্রাকচার হলে কাজকর্ম খুব বেশী ব্যাহত নাও হতে পারে।

৪। আঘাতপ্রাপ্ত জায়গা খুবই ফুলে ওঠে। সাধারণতঃ আঘাতপ্রাপ্ত জায়গায় প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলেই এত ফুলে যায়। পরে অবশ্য শোথ (oedena) হয় এবং তাতেও আরও বেশী ফোলা দেখা যায়।

৫। আঘাতপ্রাপ্ত জায়গা তার স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলে—deformity দেখা যায়। এতে সে জায়গা ছোট হতে পারে, বড় হতে পারে, বাঁকা দেখা যেতে পারে, ঘুরে যেতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

৬। হাড় ভাঙার জন্য সে জায়গায় অস্বাভাবিক mobility দেখা যেতে পারে, যদিও সেখানে কোন সন্ধিস্থল নেই।

৭। সেই আঘাতপ্রাপ্ত জায়গায় চাপ দিলে রোগী প্রচন্ড ব্যথা পায়।

৮। আঘাতপ্রাপ্ত জায়গা চাপ দিলে অনেক সময় হাড়ের কড় কড় আওয়াজ crepitus শোনা যায়। অনেক সময় হাত দিয়ে অনুভব করাও যায়।

৯। আঘাতপ্রাপ্ত জায়গার একটি x-ray করলে রোগ নির্ণয় সুনিশ্চিত হয়।

১০। আনুষংগিক উপসর্গ যেমন দ্রুত নাড়ীর গতি, অত্যধিক রক্তচাপ হ্রাস ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

হাড়ের ফ্র্যাকচারের বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়া :

১। হাড় ভাঙার সংগে হাড়ের সন্ধিস্থলেও ক্ষতি হতে পারে। সেই সন্ধিস্থলে রক্ত জমে যেতে পারে। সেখানকার movement অত্যধিক ব্যাহত হতে পারে। পরবর্তীকালে এর ফলস্বরূপ traumatic arthritis পর্যন্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে আক্রান্ত সন্ধিস্থলে একটি দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা থাকতে পারে।

২। অনেক সময় হাড় ভাঙার সংগে আশেপাশের মাংসপেশী, চামড়া ইত্যাদিতে ক্ষতি হতে পারে। চামড়ায় ক্ষত হলে জীবাণু সংক্রমণের আশংকা থাকেই।

৩। আক্রান্ত হাড় ভাঙার ঠিকমত চিকিৎসা না হলে, সে জায়গায় ঠিকমত বিশ্রাম না দিলে সেখানে স্থায়ী শোথ হতে পারে। সেখানে রক্ত জমতেও পারে।

৪। হাড় ভাঙার সংগে কাছাকাছি রক্তনালী অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেখানে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হতে পারে। রক্তনালীতে রক্তপ্রবাহে বাধাসৃষ্ট হতে পারে। অনেক সময় সেখানে thrombosis হতেও দেখা যায়।

৫। মাংসপেশীসমূহে ক্ষতি হলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। Myositis ossificans হতে পারে।

৬। হাড় ভাঙার সংগে কাছাকাছি নার্ভেরও ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়। নার্ভ একেবারে দুটুকরো হয়ে যেতেও পারে। সেক্ষেত্রে অনেক সময় হাত বা পা অসাড় হয়ে যেতে পারে।

৭। Delayed union—হাড় জোড়ায় অস্বাভাবিক বেশী সময় নিতে পারে। যদি হাড় ভাঙার জায়গায় রক্তসরবরাহ বিঘ্নিত হয়, তবে হাড় জোড়া লাগতে দেরী হতে পারে।

৮। Non-union-এর ক্ষেত্রে চিকিৎসাতেও ভাঙা হাড় জোড়ে না। যদি অনেকখানি হাড় একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, যদি মাংসপেশী বা লিগামেন্ট দুই ভাঙা হাড়ের মাঝখানে এসে পড়ে, যদি ঠিকমত immobilisation না হয়, যদি ভাঙা হাড় কাছাকাছি না আসে, তবে এ ধরনের non-union হতে পারে।

৯। Malunion—যদি reduction ঠিকমত না হয় তবে অস্বাভাবিক

অবস্থায় হাড় জুড়ে যেতে পারে। হাড় ছোট হয়ে যেতে পারে, বেঁকে যেতে পারে বা ঘুরেও যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় শল্যচিকিৎসার দরকার হয়।

হাড় ভাঙার চিকিৎসা :

হাড় ভাঙার সংগে সংগে আঘাতপ্রাপ্ত হাত বা পা পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে। নড়াচড়া যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে splint দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে—এতে ভাঙা জায়গায় নড়াচড়া হয়না, ব্যথাও কম হয়। সে জায়গায় রক্তক্ষরণও কম হতে পারে। অত্যধিক ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধ রোগীকে দিতে হবে। যথাসম্ভব শীঘ্র একটি x-ray করে দেখে নিতে হয় সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য। ফ্রাকচারের চিকিৎসায় সাধারণতঃ তিনটি বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।

১। Reduction—এই প্রক্রিয়ায় হাড়ের ভাঙা অংশগুলি আবার স্বাভাবিক জায়গায় নিয়ে আসা হয়।

২। Immobilisation—ভাঙা হাড়ের সেই সঠিক অবস্হান, যতদিন না হাড় জোড়ে, বজায় রাখতে হয়।

৩। চিকিৎসা চলাকালীন আশেপাশের মাংসপেশীসমূহ এবং হাড়ের সন্ধিস্থল যাতে ঠিক কার্যকরী থাকে—তারও ব্যবস্থা নিতে হয়।

Reduction :

Reduction-কে অনেক সময় ফ্রাকচার সেট করা বলাও হয়। এই পদ্ধতিতে ভাঙা হাড়ের অংশ দুটিকে সঠিক জায়গায় নিতে আসতে হয়। যদি কোন ফ্রাকচারে কোন স্থানচ্যুতি না থাকে, তবে এই reduction করার দরকার হয় না। এই reduction ফ্রাকচার হওয়ার পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করাই ভালো, কেন না তখন বেশী ফোলা থাকে না, মাংসপেশীসমূহে ততবেশী সংকোচন থাকে না। এতে রোগীর ব্যথাও কমে যায়, শক্ হওয়ার আশংকাও কমে যায়। এই reduction করার সময় রোগীকে অ্যানেস্থিসিয়া দিয়ে নেওয়া উচিত। নানাভাবে এই reduction করা হয় ঃ

১। Manipulation—এই পদ্ধতিতে চিকিৎসক হাত দিয়ে জোর করে টেনে ভাঙা হাড়কে কাছাকাছি যথাসম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসেন।

রোগীকে অ্যানেস্থিসিয়া দিলে মাংসপেশীসমূহে প্রসারণ ঘটে এবং তার ফলে reduction করা সহজতর হয়।

২। যান্ত্রিক টান বা mechanical traction—এ ক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে হাড়ে টান দিয়ে দুই ভাঙা অংশকে কাছাকাছি আনা হয়।

৩। অনেক সময় শল্যচিকিৎসার সাহায্যে ভাঙা হাড়কে কাছাকাছি আনা হয়। একে open reduction বলাও হয়।

Reduction করার পর x-ray করে দেখে নেওয়া উচিত reduction ঠিকমত হয়েছে কিনা।

Immobilisation বা fixation :

আসলে এটি reduction করার পর সেই হাড়ের সঠিক পজিশন ঠিকভাবে বজায় রাখতে হয় যতদিন না হাড় জুড়ে যায়। এই fixation না করলে হাড় আবার সরে যেতে পারে। নানাভাবে এটি করা যায়।

১। প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে cast বা casing-এর সাহায্যে করা যায়।

২। নানা ধরনের splint পাওয়া যায়—malleable strip splint, gutter splint, Thomas's knee splint ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩। সব সময়ের জন্য টান (continuous traction)—অ্যাডহেসিভ প্লাস্টার দিয়ে চামড়ায় surface traction দেওয়া যেতে পারে। আবার হাড়ের মধ্যে পিন বা তার ঢুকিয়ে skeletal traction দেওয়াও যায়।

৪। শল্যচিকিৎসার সাহায্যে আভ্যন্তরিণ fixation করা যায়। তবে এ পদ্ধতি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় যখন অন্য সব পদ্ধতিতে reduction করা সম্ভব হয় না। এতে অপারেশন করে ভাঙা হাড়ের অংশগুলিকে কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়, তারপর মেটালের তার, স্ক্রু বা মেটাল প্লেট দিয়ে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখা হয়। অনেক সময় হাড়ের graft করারও দরকার হতে পারে। এই শল্যচিকিৎসা হাড় ভাঙার প্রথমদিকেই করা যেতে পারে আবার delayed union বা nonunion হলেও করার দরকার হয়।

Protection :

Reduction এবং fixation করার পরেও ভাঙা হাড়ের আশেপাশের অন্য

মাংসপেশীসমূহ এবং হাড়ের সন্ধিস্থল ঠিকমত কার্যকরী রাখার ব্যবস্থা নিতে হয়। হাড় জোড়ার প্রথমদিকে বেশী ঝুঁকি নিতে নেই কেননা অল্পেই তা ভেঙে যেতে পারে। হাতের হাড় ভাঙলে প্রয়োজনমত sling, প্লাস্টার স্ল্যাব, অথবা মেটাল splint দেওয়ার দরকার হয়। আবার পায়ের ক্ষেত্রে walking plaster, caliper, iron অথবা crutch দেওয়া যেতে পারে।

রোগীর মাংসপেশীসমূহ যাতে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় এবং হাড়ের সন্ধিস্থল Stiff না হয়ে পড়ে সেদিকে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অন্যান্য সন্ধিস্থলগুলিতে যাতে active movement হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত।

ফিজিওথেরাপি :

হাড় যাতে তাড়াতাড়ি জোড়ে এবং সেই হাড়ের কার্যকারিতা ফিরে আসে, তার জন্য ফিজিওথেরাপি করার ব্যবস্থা নিতে হয়। সেখানকার রক্তচলাচল যাতে অব্যাহত থাকে, সন্ধিস্থলের mobility যাতে ঠিক থাকে, মাংসপেশীসমূহে power যাতে ঠিক থাকে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে হাড় জুড়তে দেরী হয়। অনেক সময় radiant তাপ, ইনফ্রা রেড আলো, সর্টওয়েভ ডায়াথার্মি দিলে উপকার হয়। এতে রক্তপ্রবাহ বাড়ে, ব্যথা কম হয় এবং active movement করতে সুবিধা হয়।

হাড়ের সন্ধিস্থলের নানারকম injury :

হাড়ের সন্ধিস্থলেও নানাধরনের আঘাত লাগতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে আঘাত লাগলে সন্ধিস্থলে ছিঁড়ে ফেটে contusion হতে পারে। আবার অপ্রত্যক্ষ আঘাতে বা মাংসপেশীর অস্বাভাবিক সংকোচনে স্প্রেন, আভ্যন্তরিণ বৈকল্য এবং স্থানচ্যুতি হতে পারে। এই সবই সন্ধিস্থলে প্রচণ্ড ব্যথার সৃষ্টি করে বিশেষতঃ চলাফেরার সময় অথবা নড়াচড়া করলে।

সন্ধিস্থলের penetrating ক্ষত :

ছুরি, পেরেক, কাচ ভাঙা, মোটর দুর্ঘটনা বা বুলেট ইত্যাদি দিয়ে হাড়ের সন্ধিস্থলে ক্ষত হতে পারে। এতে সন্ধিস্থলে জীবানু সংক্রমণ ঘটে। সন্ধিস্থল ফুলে ওঠে, ভিতরে জলীয় পদার্থ জমতে পারে। পরে এ থেকে arthritis হতে পারে।

সন্ধিস্থলের contusion :

হাড়ের সন্ধিস্থলের উপর প্রত্যক্ষ আঘাতের ফলে ভিতরে ছিঁড়ে যেতে পারে। ভিতরকার ক্যাপসুল, synovial membrane ছিঁড়ে যেতে পারে। এর ফলে ভিতরে রক্ত জমতেও দেখা যায়। রোগীর প্রচণ্ড ব্যথা হয়। সেখানে হাত দিয়ে চাপ দিলে রোগী ব্যথার কথা বলে। সেই সন্ধিস্থলে নড়াচড়া হলে ব্যথা আরও বেড়ে যায়। ভিতরে joint space-এ effusion হতেও পারে।

সন্ধিস্থলের sprain :

সাধারণতঃ অপ্রত্যক্ষ আঘাতের ফলেই এই স্প্রেন হয়। সন্ধিস্থলের ক্যাপসুল ছিঁড়ে যায়, লিগামেণ্টও ছিঁড়ে যেতে পারে। Synovial membrane -এ ক্ষত হতে পারে। সন্ধিস্থল খুব ফুলে ওঠে—ভিতরে জল জমে। খুবই ব্যথা হয়—নড়াচড়ায় ব্যথা বেড়ে যায়। গোড়ালিতে স্প্রেন হলে রোগী চলাফেরা করতে পারে না। আঘাতপ্রাপ্ত জায়গায় চাপ দিলে রোগী প্রচণ্ড ব্যথা পায়। যদি লিগামেণ্টসমূহ একেবারে ছিঁড়ে যায় তবে সেখানে অস্বাভাবিক mobility দেখা দিতে পারে।

সন্ধিস্থলের internal derangements :

আঘাতের ফলে এক্ষেত্রে সন্ধিস্থলের ভিতরকার intra-articular লিগামেন্ট-সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে সন্ধিস্থলের meniscus এবং synovial membrane-এর অংশ অন্য জায়গায় সরে যেতে পারে এবং তার ফলে সেই সন্ধিস্থলে অস্বাভাবিকভাবে আটক বা locking হয়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ হাঁটু এবং temporo mandibular joint-এ এই ধরনের বৈকল্য হতে দেখা যায়। এই সব সন্ধিস্থলের খুব বেশী নড়াচড়ায় হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথা হয়, অনেক সময় অল্প আওয়াজও হতে পারে। সন্ধিস্থল ফুলে ওঠে। সন্ধিস্থলের mobility বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য চিকিৎসার পর mobility আবার পুরোমাত্রায় ফিরে আসে।

Dislocations :

সন্ধিস্থলের হাড়গুলি যখন তাদের articular surface থেকে অন্যত্র সরে যায় তখন তাকে dislocation বলে। সাধারণতঃ অপ্রত্যক্ষ আঘাতের ফলেই

এ ধরনের স্থানচ্যুতি ঘটে। সাধারণতঃ মধ্য বয়স্কদের ক্ষেত্রেই এটি বেশী ঘটে। এতে ক্যাপসুল একেবারে ছিঁড়ে যায় এবং একটি হাড় ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে এসে অন্যত্র চলে যায়। সুতরাং চিকিৎসা না করলে এই স্থানচ্যুতি আপনা থেকে ঠিক হয় না।

যখন এই dislocation অসম্পূর্ণ থাকে তখন তাকে sublaxation বলা হয়। এতে হাড়ের joint surface অসম্পূর্ণভাবে একের থেকে অন্যে দূরে থাকে। এক্ষেত্রে articular surface ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসে না। এদের লিগামেন্টগুলি খুবই দুর্বল থাকে অথবা ছেঁড়া অবস্থায় থাকে।

এই সব dislocation-এ ক্যাপসুল ছেঁড়ার সংগে মাংসপেশীসমূহ, টেন্ডন, সাইনোভিয়াল মেমব্রেন, এমন কি কার্টিলেজও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সেখানে রক্তক্ষরণও হতে পারে। প্রদাহজনিত exudate সন্ধিস্থলের মধ্যে জমতে থাকে এবং এতে adhesion হওয়ার আশংকা বেড়ে যায়। পরবর্তী কালে আথ্রাইটিস, মায়োসাইটিস অথবা টেনোসাইনোভাইটিস পর্যন্ত হতে পারে।

Dislocation-এর প্রথমদিকে রোগী আক্রান্ত জায়গায় প্রচণ্ড ধরনের ব্যথা অনুভব করে। অনেক সময় রোগী বুঝতে পারে যেন হাড় প্রচণ্ডভাবে ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো। অল্প পরে ব্যথা কিছুটা কমতে পারে, তবে কোন নার্ভে চাপ সৃষ্টি করলে ব্যথা বরং আরও বেড়ে যায়। সেই জায়গায় এক অস্বাভাবিক deformity হয়। সেই সন্ধিস্থলে আর নড়াচড়া করা যায় না। সেই হাড় বা পায়ের কাজ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

শেষের দিকে রোগীর আক্রান্ত জায়গায় dull, aching ব্যথা থাকে, সেই জায়গায় অনেক বেশী ফোলা থাকে। সেখানে লাল হয়ে যেতে পারে। প্রদাহজনিত সবরকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। একটি x-ray করলে রোগনির্ণয়ে সুবিধে হয়।

Dislocation-এর চিকিৎসা :

১। প্রথমেই reduction-এর ব্যবস্থা করতে হবে। সে সময় রোগী আরও ব্যথা পেতে পারে তাই অনেক সময় অ্যানেস্থিসিয়ার সাহায্য নিতে হয়। অ্যানেস্থিসিয়ায় মাংসপেশীসমূহ শিথিল হয়ে পড়ে এবং তার ফলে হাড়কে আবার তার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে সুবিধা হয়। সাধারণতঃ একবার reduction

করে হাড়ের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনলে তা মোটামুটি ঠিকই থাকে। কেননা আশেপাশের মাংশপেশীসমূহ ভালো splint-এর কাজ করে। অন্যভাবে fixation করার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। এমনিতে reduction করা সম্ভব না হলে শল্যচিকিৎসার সাহায্যে open reduction করতে হতে পারে।

২। শরীরের আক্রান্ত জায়গা পরিপূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে। এতে ভিতরকার exudate তাড়াতাড়ি শোষিত হবে এবং নিরাময় ত্বরান্বিত হবে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শমত যথাসম্ভব সত্বর সেখানকার active movement করতে দেওয়া উচিত নতুবা সেই হাড়ের সন্ধিস্থল stiff হয়ে যেতে পারে।

৩। Rehabilitation : এ ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। সন্ধিস্থলে যাতে adhesion না হয়, মাংসপেশীসমূহ যাতে অব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। অন্যান্য সন্ধিস্থল যাতে ঠিক থাকে তার জন্য ব্যায়াম শিক্ষা দিতে হবে। Immobilisation-এর পর যাতে সম্পূর্ণ mobility ফিরে আসে এবং মাংসপেশীর জোর ফিরে আসে সেদিকেও দেখতে হবে।

Dislocation-এর কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া

১। আক্রান্ত সন্ধিস্থল stiff হয়ে যেতে পারে।

২। আশেপাশের মাংসপেশীসমূহ বহুদিন ব্যবহার না করার জন্য শুকিয়ে যেতে বা atrophy হতে পারে।

৩। Dislocation-এর সংগে অনেক সময় ফ্রাকচার থাকতে পারে। সাধারণতঃ pott's ফ্রাকচার অথবা কাঁধের dislocation-এ humerus-এর ফ্রাকচার হতে দেখা যায়।

৪। একবার reduction-এর পর অন্য সময় আবার ঐ সন্ধিস্থলেই dislocation হতে পারে। একে recurrent dislocation বলে। সাধারণতঃ shoulder joint এবং temporo mandibular joint-এ এ ধরনের বার বার স্থানচ্যুত হতে দেখা যায়।

৫। আনুষংগিক মাংসপেশীসমূহে ক্ষতি হতে পারে। মাংসপেশীসমূহ ছিঁড়ে যেতে পারে, টেন্ডনও ছিঁড়তে পারে। এসব ক্ষেত্রে রোগনিরাময়ে দেরী হতে পারে।

৬। অনেক সময় নার্ভও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কাঁধের dislocation-এ circumflex নার্ভ এবং কনুই dislocation-এ ulnar নার্ভ ছিঁড়ে যেতে পারে অথবা সেখানে অত্যধিক চাপ পড়তে পারে। সেসব ক্ষেত্রে paralysis বা paresis হয়।

৭। রক্তনালীতে ক্ষতি হলে সেখানে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হতে থাকে। রক্ত-নালীর উপর অত্যধিক চাপ পড়লে সেখানকার রক্তচলাচল ব্যাহত হয়। এক্ষেত্রে সেখানে পচন বা gangrene হওয়ার আশংকাও থাকে।

৮। ঠিকমত reduction না হলে হাত বা পা ছোট হয়ে থাকতে পারে।

হাড়ের সন্ধিস্থলের কিছু অসুখ

Synovitis :

সন্ধিস্থলের lining membrane-এ প্রদাহের ফলে এই অসুখ হয়। যখন এই প্রদাহ সন্ধিস্থলের অন্যান্য অংশে ব্যাপকতা লাভ করে, তখন তাকে arthritis বলা হয়। Synovial membrane-এ প্রদাহ সহজেই ঘটতে পারে। এখানেই প্রদাহ সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর সংগে আথ্রাইটিসও হতে দেখা যায়। আবার অনেক সময় osteoarthritis হয় কিন্তু সাইনোভাইটিস নাও থাকতে পারে। আঘাতের ফলে সাইনোভাইটিস হতে পারে, পরে জীবানু সংক্রমণও ঘটতে পারে। এ ধরনের প্রদাহ ছাড়াও osteoarthritis, gout এবং chronic rheumatism সম্পূর্ণ অন্য কারণে হয়। এগুলি সাধারণতঃ বিপাকীয় গন্ডগোলের ফলে অথবা সেখানকার রক্ত চলাচলের ব্যাহত হওয়ার জন্য হয়।

আঘাতজনিত সাইনোভাইটিস সাধারণতঃ ফ্রাকচার, ডিসলোকেশন, স্প্রেন ইত্যাদির সংগে আনুষংগিক উপসর্গ হিসাবে হতে পারে। যদি একই সন্ধিস্থলে খুব বেশী চাপ পড়তে থাকে, চলাফেরার সময় অস্বাভাবিক position হতেই থাকে তবে সাইনোভাইটিস হতে পারে। হাঁটুর সাইনোভাইটিস হতে প্রায়শই দেখা যায়।

এই প্রদাহের ফলে সন্ধিস্থলের মধ্যে খুব বেশি serous exudate জমতে থাকে এবং সন্ধিস্থল খুব ফুলে ওঠে। আঘাত যদি গুরুতর হয় তবে সেখানে

রক্ত জমতেও পারে। আক্রান্ত সন্ধিস্থল বেশ গরম হয়ে পড়ে। লাল হয়ে যায়। তবে চামড়াতে অনেক সময় বোঝা যায় না। ভিতরে এত জলীয় পদার্থ থাকতে পারে যে fluctuation test করলে ভালোই বোঝা যায়। সেই সন্ধিস্থলে খুবই ব্যথা হয়, dull, aching ধরনের ব্যথা হয়, নাড়াচাড়া করলে ব্যথা আরও বেড়ে যায়। ব্যথার জন্য রোগী আক্রান্ত সন্ধিস্থলের লিগামেন্টগুলি যাতে প্রসারিত অবস্থায় থাকে সেইভাবে রাখতে সাহায্য করে। বহুদিন মাংসপেশীসমূহ ঠিকমত ব্যবহার না করার জন্য সেগুলি শুকিয়ে যেতে বা atrophy হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে আনুষংগিক কোন হাড় ভাঙা, dislocation ইত্যাদি আছে কিনা দেখে নিতে হয়। আঘাতের জায়গায় চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে।

এই অসুখের চিকিৎসায় প্রদাহ যাতে না বাড়ে বা অন্য জায়গায় বিস্তার লাভ না করে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যথানিবারণের ব্যবস্থা করতে হবে। আক্রান্ত হাত বা পা সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে। ফোলা যাতে কমে যায় সে দিকেও নজর দিতে হবে।

অসুখের প্রথমদিকে ঠান্ডা প্রয়োগ করলে বা বরফ ব্যাগ ব্যবহার করলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। সন্ধিস্থলে বেশী ফোলা থাকলে compression ব্যান্ডেজ করে রাখতে হয়। ব্যথা এবং ফোলা কমানোর জন্য ইনফ্রা রেড তাপ অথবা সর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি করলে বিশেষ উপকার হয়। প্রথমদিকে ম্যাসাজ না করাই উচিত কেননা এতে প্রদাহ বেড়ে যেতে পারে। তবে পরে effleurage করা যেতে পারে। তাতে adhesion হওয়ার আশংকা কমে। আক্রান্ত সন্ধিস্থল ছাড়া হাত বা পায়ের অন্যান্য অংশে ম্যাসাজ করলে রক্তচলাচল বৃদ্ধি পায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে active অথবা passive movement করতে দেওয়া উচিত। তবে খুব সাবধানে করতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই রোগী ব্যথা না পায়।

যখন প্রদাহ এবং ব্যথা উভয়েই কমে যায়, তখন ভালোভাবে ম্যাসাজ, ব্যায়াম ইত্যাদি করাতে হবে। হাঁটুতে হলে quadriceps মাংসপেশীর ব্যায়াম করালে বিশেষ উপকার হয়।

Chronic synovitis :

বার বার সাইনোভাইটিস হতে থাকলে সেটি দীর্ঘস্থায়ী বা chronic পর্যায়ে

পরিণত হয়। এতে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন খুবই পুরু হয়ে পড়ে, খুব vascular এবং rough হয়ে পড়ে। ভিতরে exudation হতেই থাকে। অনেক সময় ভিতরে loose bodies থাকতেও দেখা যায়।

আক্রান্ত সন্ধিস্থলে খুবই ফোলা থাকে। ব্যথা একটা থাকেই থাকে। মাংসপেশীসমূহ খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে, লিগামেন্টগুলিতেও প্রসারণ ঘটে। ভিতরে adhesion থাকার জন্য সন্ধিস্থলের নড়াচড়া খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। হাঁটুর সন্ধিস্থলে এ ধরনের প্রদাহ খুবই দেখা যায়।

এর চিকিৎসায় আক্রান্ত সন্ধিস্থলে একটি supporting ব্যান্ডেজ করে রাখা হয়। এক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি করালে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। গরম সেঁক, সর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি দেওয়া যেতে পারে। ম্যাসাজ করলেও ভালো হয়। রোগীকে নিজে থেকে ব্যায়াম (active exercise) করতে হবে। এসবের সংগে চিকিৎসকের পরামর্শমত ওষুধ খেতে হবে। প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসাও করাতে হতে পারে।

Tenosynovitis :

হাড়ের সন্ধিস্থলের কাছাকাছি মাংসপেশীসমূহের synovial sheath-এ প্রদাহের ফলে এই টেনোসাইনোভাইটিস হয়। এটি আঘাতজনিত কারণে অথবা জীবানু সংক্রমণের ফলে হতে পারে। সাধারণতঃ গোড়ালি এবং কব্জির সন্ধিস্থলেই এই ধরনের প্রদাহ বেশী ঘটে।

আক্রান্ত মাংসপেশীসমূহ অত্যধিক কাজের ফলে, সেখানকার টেন্ডনে বেশী সংকোচন ঘটার ফলে অথবা কাছাকাছি চামড়া, fascia থেকে জীবানু সংক্রমণের ফলে এই টেনোসাইনোভাইটিস হয়। অনেক সময় অবশ্য কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না।

এক্ষেত্রে প্রদাহজনিত serous অথবা serofibrinous fluid জমতে দেখা যায়। আক্রান্ত জায়গায় ফোলা থাকে। সেখানে চাপ দিলে রোগী ব্যথা পায়। এমনিতেও বিশেষতঃ নড়াচড়ার সময় বেশ ব্যথা হতে থাকে।

এর চিকিৎসায় আক্রান্ত হাত বা পা বিশ্রামে রাখতে হবে। প্রয়োজনে splint বা strap করে রাখতে হবে। ম্যাসাজ করলে উপকার পাওয়া যায়। ব্যথার জন্য গরম সেঁক বা infra red radiation দেওয়া যায়। সর্ট ওয়েভ

ডায়াথার্মিও এসব ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। যথাসম্ভব শীঘ্র active exercise করতে দেওয়া দরকার। জীবাণু সংক্রমণ ঘটলে পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। ব্যথার জন্য ব্যথানিবারক ওষুধও দেওয়া হয়। ঠিক সময়ে পর্যাপ্ত চিকিৎসা না করলে পরবর্তীকালে scarring, contracture এবং deformity হওয়ার আশংকা থাকে। অনেক সময় সন্ধিস্থলের mobilityও সীমিত হয়ে পড়ে। প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসার সাহায্য নেওয়া হয়। এতে tendon sheath কে চিরে দেওয়া হয় যাতে টেন্ডন এবং তার sheath-এ ঘষা না লাগতে পারে।

Bursitis :

হাড়ে সন্ধিস্থলের কাছাকাছি bursa-তে প্রদাহ ঘটতে পারে। এই বার্শা সন্ধিস্থলের মধ্যে যেতেও পারে, আবার নাও যেতে পারে। বার্শার প্রধান কাজ হলো যাতে টেন্ডন এবং টেন্ডনে অথবা টেন্ডন এবং হাড়ে কোন রকমের ঘষা বা friction না ঘটে। আঘাতজনিত কারণে বার্শার প্রদাহ হতে পারে। আবার জীবাণু সংক্রমণে, রিউম্যাটিক অসুখে অথবা গেঁটে বাতে (gout) বার্শার প্রদাহ হতে পারে।

এই অসুখের উপসর্গে যথেষ্ট ব্যথা হয়, সেই সন্ধিস্থলের mobility সীমিত হয়ে পড়ে, stiff হয়ে যায়। আক্রান্ত জায়গা ফুলে ওঠে। Bursa-র মধ্যে অত্যধিক জলীয় পদার্থ জমলে অনেক সময় fluctuation পরীক্ষা করলে বোঝা যায়। এক্ষেত্রে বার্শাতেই ব্যথা হয়—হাড়ের সন্ধিস্থলে ভিতরে ব্যথা নাও থাকতে পারে।

সাধারণতঃ দুই ধরনের bursitis খুব বেশী দেখা যায়। একটি pre-patellar bursitis এবং অন্যটি subdeltoid bursitis।

Patella-র উপরে এবং চামড়ার নীচে এই বার্শা থাকে। এর প্রদাহে হাঁটু ফুলে যায়, ব্যথা হয় এবং হাঁটুতে mobility সীমিত হয়ে পড়ে। Subdeltoid bursitis সাধারণতঃ shoulder capsule এবং deltoid মাংসপেশীর মধ্যেকার বার্শার প্রদাহে ঘটে। এখানে ব্যথা হয়, ফোলা থাকে। এর সংগে অনেক সময় জ্বরও হতে পারে।

এসবের চিকিৎসায় প্রথমদিকে ফিজিওথেরাপি করা যেতে পারে। আক্রান্ত জায়গাকে বিশ্রাম দিতে হবে। ইনফ্রা রেড তাপ অথবা সর্টওয়েভ ডায়াথার্মি করা

যেতে পারে। ম্যাসাজ দিলেও উপকার হয়। আস্তে আস্তে ব্যায়াম শেখাতে হবে, তবে যেন কখনও ব্যথা সৃষ্টি না করে। প্রেসার ব্যাণ্ডেজ দেওয়া যেতে পারে। যদি রোগীর খুব বেশী অসুবিধার সৃষ্টি না করে তবে আর কিছুর দরকার হয় না। কিন্তু এসবে ভালো না হলে শল্যচিকিৎসা করানো যেতে পারে।

Infective arthritis :

হাড়ের সন্ধিস্থলে জীবাণু সংক্রমণের ফলে এই আথ্রাইটিস হয়। এই জীবাণু শরীরের ভিতর থেকে বা বাইরে থেকে এসে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। কয়েকটি বিশেষ ধরনের অসুখ থেকে—গণোরিয়া, টাইফয়েড ইত্যাদি অসুখ থেকে আথ্রাইটিস রোগ হতে পারে। প্রথমদিকে শুধু সাইনোভাইটিস হয়, পরে গোটা সন্ধিস্থল আক্রান্ত হতে পারে। ভিতরে পুঁজ জমে ওঠে, হাড় ক্ষয় হতে থাকে এবং সন্ধিস্থলের কাছাকাছি অন্য সব অংগ প্রত্যংগেও প্রদাহ ঘটে।

অসুখের প্রথমদিকে serous exudate হয়, এর পর fibrinous এবং এমন কি purulent exudate হতে থাকে। দীর্ঘস্থায়ী এই অসুখে সন্ধিস্থল (joint) একেবারে নষ্ট হয়ে যায়—সেখানে কোন mobility থাকে না।

এই অসুখের উপসর্গে রোগী প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে। সেখানকার মাংসপেশীসমূহে টান ধরে, সন্ধিস্থলের স্বাভাবিক নড়াচড়া ব্যাহত হয়। শেষ পর্যায়ে মোটেই নড়ে না—ankylosis হয়ে যায়। সন্ধিস্হলে dislocationও হতে পারে। এর সংগে জ্বরও হতে দেখা যায়। অনেক সময় পুঁজ বাইরে বেরিয়ে আসে এবং সেখানে এক sinus বা নালীপথ তৈরী হয়।

চিকিৎসা :

আক্রান্ত হাত বা পা সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে। প্রয়োজনে splint লাগাতে হবে। গরম সেঁক দিলে উপকার হয়। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ দিতে হবে। সন্ধিস্থলের ভিতরে যদি serous fluid থাকে তবে তা সিরিঞ্জ দিয়ে বের করে দেওয়া যায়। তবে ভেতরে পুঁজ জমে গেলে তা অপারেশন করে বের করে দিতে হবে। পুঁজ বের করে দেওয়ার পর অল্পস্বল্প ম্যাসাজ করা ভালো। প্রয়োজনে ultraviolet আলো অথবা zinc ionisation দেওয়া যেতে পারে। অসুখের প্রাথমিক পর্যায়ে কোন রকমের active exercise না করাই উচিত, কেননা এতে প্রদাহ অত্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী আথ্রাইটিস অসুখের ক্ষেত্রে আক্রান্ত জায়গায় তাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে। ম্যাসাজ ভালোভাবে করা উচিত। Active movements করানো দরকার। প্রয়োজনে জোর করে stretching করতে হতে পারে। অনেক সময় রোগীকে অ্যানের্স্থেসিয়া দিয়ে সন্ধিস্থলের manipulation করা হয়।

Osteoarthritis :

এটি একটি বৃদ্ধ বয়সের হাড়ের অসুখ। প্রথমদিকে একটি বড় joint-এ এই অসুখ বেশী হয়। এটি স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে হতে পারে। সাধারণতঃ একটি আঘাতের পর এই অসুখের সূত্রপাত হয়। অন্য সব সন্ধিহস্লও আক্রান্ত হতে পারে।

এই অসুখে সাইনোভিয়াল মেমব্রেনে প্রদাহ ঘটে এবং তার ফলে অত্যধিক কোষ বৃদ্ধির কারণে এই মেমব্রেন খুবই মোটা হয়ে পড়ে। সন্ধিস্থলের ভিতরে জলীয় পদার্থ জমতে পারে। হাড়ের articular cartilage নরম হয়ে যায়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এসবের ফলে হাড়ের প্রান্তদেশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। কার্টিলেজ কোষগুলি খুবই বাড়তে (proliferate) থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ছোট ছোট কার্টিলেজের মত অংশ তৈরী হয়। এগুলি হাড়ে পরিণত হয় এবং osteophytes তৈরী করে। কিছু কিছু আলাদা হয়ে গিয়ে loose bodies তৈরী হয়। হাড়ের প্রান্তদেশও নরম হয়ে যায় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এতে অনেক সময় groove দেখা যায়। তবে সন্ধিস্থলে কখনোই bony ankylosis হয় না। ইন্ট্রাআর্টিকুলার কার্টিলেজে অথবা অন্য লিগামেন্টেও ক্ষয় শুরু হয়। মাংসপেশীসমূহ এবং টেন্ডনগুলিও কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে, দুর্বল হয়ে পড়ে, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

এই অসুখের সূত্রপাত হয় ছোটখাট কিছু আঘাতের পর। রোগী প্রথম দিকে stiffness-এর কথা বলে এবং এর সংগে dull aching টাইপের ব্যথা হতে থাকে। নড়াচড়া করলে ব্যথা বাড়ে, আবার বিশ্রাম দিলে ব্যথা কিছু কমে। আক্রান্ত জায়গায় ফোলা থাকে। সেখানকার তাপমাত্রাও কিছুটা বাড়তে পারে। অনেক সময় সন্ধিস্থলে creaking আওয়াজ পাওয়া যায়। মাংসপেশীসমূহে wasting দেখা যায়। অনেক সময় deformity থাকে। সন্ধিস্থলের নড়াচড়া খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। অস্টিওআথ্রাইটিসের ব্যথা কোন কোন সময় অত্যধিক

বেড়ে যায়, আবার হয়তো কিছুদিন কোন ব্যথাই থাকে না। আক্রান্ত হাড়ের এবং সন্ধিস্থলের x-ray করলে রোগ নির্ণয় সহজ হয়।

এই অসুখের চিকিৎসা উপসর্গ অনুযায়ী করার দরকার হয়। কোন স্থায়ী septic focus শরীরে থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে। রোগীর পায়খানা যাতে পরিষ্কার থাকে তারও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। রোগীর ব্যথার জন্য ব্যথা-নিবারক ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। তাপ প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে কেননা এতে রক্তচলাচল বৃদ্ধি পায়। Radiant heat, ডায়াথার্মি ; সর্টওয়েভ থেরাপি দেওয়া যেতে পারে। রোগীকে তার প্রাত্যহিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। মেদবৃদ্ধি থাকলে শরীরের ওজন কমাতে হবে। সারভাইকাল শিরদাঁড়ায় অস্টিওআথ্রাইটিস হলে অনেক সময় টান (traction) দিতে হয়—collar ব্যবহার করতে হয়।

হাড়ের সন্ধিস্থলে mobility বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে রোগীকে অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার পর manipulation করতে হবে এবং পরে active movements করতে হবে। অনেক সময় শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয়। Arthrodesis অথবা arthroplasty করা যেতে পারে। Arthrodesis অপারেশনে সেই সন্ধিস্থল একেবারে জমিয়ে দেওয়া হয় যাতে পরবর্তীকালে এতে নড়াচড়া করতে না পারে। Arthroplasty অপারেশনে একটি নতুন joint বা সন্ধিস্থল তৈরী করে দেওয়া হয়।

হাড়ের কিছু অসুখ

অস্টিওমায়েলাইটিস (Osteomyelitis) :

হাড়ের প্রদাহের ফলে এই osteomyelitis হয়। নানা ধরনের জীবানু সংক্রমণের ফলেই এই প্রদাহ ঘটে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদের এই অসুখ বেশী দেখা দেয়। কমবয়সী ছেলেদের এই অসুখ হওয়ার প্রবণতা বেশী, কেননা এই বয়সেই হাড় বাড়তে থাকে এবং এদেরই হাড়ের আঘাত বেশী হয়। শরীরের যে কোন হাড়েই এই অসুখ হতে পারে, তবে tibia-র উপর প্রান্তে, femur-এর নীচেরদিকে, humerus-এর উপরদিকে, ulna, fibula, radius metacarpal এবং metatarsal-এ এই অসুখ প্রায়শই দেখা যায়।

হাড়ের নরম epiphyseal কার্টিলেজে প্রদাহ আরম্ভ হয়। এর পর সেখানে ফোঁড়া হয় এবং সংক্রমণ হাড়ের medullary cavity দিয়ে অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ভীষণ ধরনের সংক্রমণে হাড় নষ্ট হয়ে যায়—ভিতরকার পুঁজ আস্তে আস্তে বাইরের দিকে আসে এবং মাংসপেশী, লিগামেন্ট ইত্যাদিতেও সংক্রমণ ঘটে। দীর্ঘস্থায়ী এই অসুখে অনেক সময় sinus বা নালীপথ তৈরী হয়ে যায় এবং সেখান দিয়ে পুঁজ পড়তে থাকে। হাড়ের মধ্যে মৃত হাড়ের অংশ থেকেই যায়, সেটিকে পরে অপারেশন করে বের করে দিতে হয়।

এই অসুখের উপসর্গ হিসাবে রোগীর জ্বর হয়। আক্রান্ত হাড়ে প্রচন্ড ব্যথা হয়। সেখানে বেশ ফোলা থাকে। শেষদিকে চামড়াও লাল হয়ে যায়, গরম থাকে। পুঁজ হাড়ের বাইরের দিকে চলে এলে তা fluctuation টেস্ট করলে বোঝা যায়। অনেক সময় ফোঁড়া ফেটে যায় এবং সাইনাস দিয়ে পুঁজ বের হতে থাকে।

এই জীবাণু সংক্রমণ হাড়ের সন্ধিস্থলেও বিস্তার লাভ করতে পারে। হাড় খুব বেশী দুর্বল হয়ে গেলে নিজে থেকে বা অল্প আঘাতে ভেঙে যেতে পারে। সংক্রমণ লিভার, কিডনী, হৃৎপিন্ড ইত্যাদিতেও গন্ডগোল সৃষ্টি করে। দীর্ঘস্থায়ী এই রোগে হাড়ের deformity হতে পারে, হাড় ছোট বা বড় হয়ে যেতে পারে, সন্ধিস্থলের mobility সীমিত হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় ankylosis হতেও দেখা যায়।

এই অসুখের চিকিৎসায় সংক্রমণ দমন করতেই হবে। আক্রান্ত জায়গাকে বিশ্রাম দিতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে। যদি ভিতরে পুঁজ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তা incision এবং drainage দিতে হবে। প্রয়োজনে শল্য-চিকিৎসার সাহায্যে মৃত হাড়ের অংশ বের করে দিতে হবে (sequestrectomy)। অনেক সময় bone graft দিতেও হতে পারে।

ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থাও করা উচিত। অসুখের প্রথমদিকে বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে তাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আলট্রা ভায়োলেট তাপ দিলে উপকার হয়। ম্যাসাজ করাও যেতে পারে। Active movements প্রথম থেকেই করতে দেওয়া উচিত। তবে কখনো বেশী জোরে করা উচিত নয়, কেননা এতে সংক্রমণের বিস্তার ঘটতে পারে।

অসুখ সেরে যাওয়ার পর লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে দুর্বল মাংসপেশীসমূহ

আবার তার স্বাভাবিক সবলতা ফিরে পায় এবং সন্ধিস্থলে আবার যাতে mobility ফিরে আসে।

Acute traumatic periostitis :

এই অসুখে হাড়ের বহির্আবরণী periosteum-এ প্রদাহ ঘটে। সাধারণতঃ আঘাতের ফলেই এই ধরনের প্রদাহ হয়। যে সব হাড় চামড়ার ঠিক নীচেই থাকে সেগুলিই বেশী এ ভাবে আক্রান্ত হয়। এসব ক্ষেত্রে পুঁজ খুব একটা হয় না। হাড়ও খুব একটা নষ্ট হয় না, তবে সেরে যাওয়ার পরও আক্রান্ত জায়গা বেশী thickened হয়ে থাকে।

এই অসুখের উপসর্গে অল্প ফোলা থাকে, হাড়ে ব্যথা হয়। আক্রান্ত জায়গায় চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে। নড়াচড়াতেও ব্যথা বাড়ে।

এই অসুখ বিশ্রাম দিলেই বেশীর ভাগ সময়ে সেরে যায়। আক্রান্ত জায়গায় জলীয় পদার্থ জমলে সিরিঞ্জ দিয়ে তা বের করে দিতে হয়। সর্টওয়েভ ডায়াথার্মি দিলে ভালো হয়। আক্রান্ত হাত বা পা বিশ্রামে রাখতে হবে। আনুষংগিক উপসর্গ হিসাবে মাংসপেশীসমূহের ব্যথা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ম্যাসাজ দিলে উপকার হয়। তবে প্রদাহ যাতে না বেড়ে যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

Pott's disease :

এটি আসলে শিরদাঁড়ায় যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ। এতে রোগীর vertebral body টিউবারকিউলোসিস বা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয় এবং শিরদাঁড়ায় একটি angular deformity তৈরী করে। সাধারণতঃ ১০ বছর বয়সের কমেই এই অসুখ হতে দেখা যায়। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদেরই এই অসুখ বেশী হয়। অবশ্য পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রেও এই অসুখ হতে পারে।

Vertebral body-র উপরের বা নীচের metaphysis-এ এই রোগ প্রথম আরম্ভ হয়। সেখান থেকে অন্য ভার্টিব্রাতে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এই অসুখে ভার্টিব্রার ভিতরে হাড় একেবারে নষ্ট হয়ে যায় এবং আভ্যন্তরিণ cavity বা গর্তের সৃষ্টি হয়। শরীরের ওজনে এই সব আক্রান্ত ভার্টিব্রা বসে যায় বা collapse হয়। এর ফলে শিরদাঁড়া সামনের দিকে এবং নীচের দিকে বেঁকে যায়। সুতরাং ভিতর থেকে spinous processগুলি ঠেলে বেরিয়ে আসে এবং চামড়ার নীচে

gibbus বাইরে থেকে বোঝা যায়। সাধারণতঃ নীচের থোরাসিক এবং উপরের লাম্বার ভার্টিব্রাতে এই রোগ বেশী হতে দেখা যায়।

এই অসুখে রোগীর শিরদাঁড়ায় ব্যথা হয়। স্থানীয় জায়গায় ব্যথার সংগে অন্য জায়গাতেও ব্যথা নির্দেশিত হতে পারে। শিরদাঁড়ার নড়াচড়াতে ব্যথা আরও বেড়ে যায়। শিরদাঁড়ার spinous process-এ চাপ দিলেও রোগী প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে।

পিঠের মাংসপেশীসমূহে টান ধরে। রোগী শিরদাঁড়া শক্ত সোজা করে রাখার চেষ্টা করে, কেননা নড়াচড়া করলে বা সামনের দিকে ঝুঁকলে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। রোগীর দাঁড়ানোর ভংগিমাই পাল্টে যায়। অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী অসুখে রোগী ভালোভাবে দাঁড়াতেই পারে না। লাম্বার ভার্টিব্রা আক্রান্ত হলে রোগী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

শিরদাঁড়ার স্বাভাবিক বাঁকা ভাব পাল্টে যায় এবং angular deformity দেখতে পাওয়া যায়। Lateral angulation হতেও পারে, বিশেষতঃ যখন ভার্টিব্রার একদিকের অংশে অসুখ হয় এবং collapse হয়।

এই অসুখে নানা ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। যদি হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসে অস্বাভাবিক প্রেসার বা চাপ পড়ে তবে তাদের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। অনেক সময় এই অসুখ থেকে ফোঁড়া হতেও দেখা যায়। স্পাইনাল কর্ডে অত্যধিক চাপসৃষ্টি হলে অনেক সময় প্যারালিসিস হতে দেখা যায়।

এই অসুখে রোগীকে পর্যাপ্ত বিশ্রামে রাখতে হবে। খাদ্য এবং পুষ্টির দিকে নজর দিতে হবে। আলোবাতাসযুক্ত আবহাওয়ায় রোগীকে রাখা দরকার। প্রয়োজনীয় অ্যান্টিটিউবারকুলার ওষুধ দিতে হবে। রোগীর বুকের এবং আক্রান্ত শিরদাঁড়ার x-ray করা প্রয়োজন। রক্ত পরীক্ষাও করা উচিত।

রোগীর শিরদাঁড়ায় immobilisation করা উচিত যতক্ষণ না রোগী মোটামুটি সুস্থ হয়। শিরদাঁড়া hyperextension অবস্থায় শুইয়ে প্লাস্টার করা যেতে পারে। এতে deformity কমে, ব্যথাও কমে এবং নিরাময়ও ত্বরান্বিত হয়। এ সময় মাংসপেশীসমূহে টান, ক্ষয় অথবা চাপ ক্ষত (pressure sore) যাতে না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। রোগী সুস্থ হলে পরিমিত ব্যায়ামও শেখানো উচিত—অবশ্য এ সবই করতে হবে অভিজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টের তত্ত্বাবধানে।

ফোঁড়া (abscess) হলে অনেক সময় সিরিঞ্জ দিয়ে শোষন করতে হয়। Incision অনেক সময় পরিহার করা হয়। যাতে অন্য বীজানু সংক্রমণ না ঘটে তার দিকেও নজর রাখতে হবে। Paraplegia হলে যদি ঔষধপত্রে ৬ মাসের মধ্যে কোন কাজ না হয় তবে শল্যচিকিৎসকের সংগে পরামর্শ করা উচিত। প্রয়োজনে laminectomy করতে হতে পারে। রোগীর শিরদাঁড়া সোজা করার জন্য শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

Osteogenic sarcoma :

এটি হাড়ের একটি ক্যানসার রোগ। সাধারণতঃ femur-এর নীচের অংশে এই অসুখ বেশী হতে দেখা যায়। তবে অন্য হাড়েও এই অসুখ হতে পারে। এই ক্যানসার খুব ধীরে ধীরেই আরম্ভ হয়। হাড়ে সব সময়ের জন্য ব্যথা হতে থাকে। সেই আক্রান্ত হাড় মোটা হতে থাকে। এর সংগে চামড়ার নীচে শিরা উপশিরাও বড় হতে থাকে এবং প্রসারিত থাকে। অনেক সময় আক্রান্ত ধমনীর নাড়ীও বোঝা যায়। আশেপাশের হাড়ের সন্ধিস্থলে জলীয় পদার্থ জমতে পারে। রোগের শেষ পর্যায়ে রোগী খুবই রোগা হয়ে যায়। ক্যানসার তখন শরীরের অন্যান্য জায়গাতেও ছড়িয়ে পড়ে। ফুসফুসেও এই অসুখের secondary deposit দেখা যায়। আক্রান্ত হাড় এত বেশী দুর্বল হয়ে পড়ে, যে অল্প আঘাতে বা আপনা থেকেই তা ভেঙে যেতে পারে।

এই অসুখে রোগীর আক্রান্ত হাড়ের একটি x-ray করা একান্ত দরকার। বুকের x-ray করলে বোঝা যায় সেখানে secondary deposit আছে কি না। অনেক সময় আক্রান্ত জায়গা থেকে biopsy করে দেখা হয়। এতেও রোগ নির্ণয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

এই অসুখের পরিণাম খুবই ভয়াবহ। অসুখ প্রথমদিকে ধরা পড়লে অনেক-সময় আক্রান্ত হাত বা পা শল্যচিকিৎসার সাহায্যে বাদ দেওয়া হয়। এতে রোগীর আয়ু আরও বেশী কিছু দিন বাড়তে পারে। যে সব ক্ষেত্রে শরীরের অন্যান্য জায়গায়, বিশেষতঃ ফুসফুসে secondary deposit ছড়িয়ে পড়ে, তাদের চিকিৎসায় আর বিশেষ কিছু হয় না। তবে এদের ব্যথা উপশমের জন্য পর্যাপ্ত ব্যথানিবারক ওষুধ দিতে হবে। খাদ্য এবং পুষ্টির দিকেও নজর দিতে হবে।

Ewing's sarcoma :

এটি ক্যানসার জাতীয় হাড়ের অসুখ। এটি বড় বড় লম্বা হাড়ের মধ্যেই হয়। প্রথমদিকে এটি দীর্ঘস্থায়ী পুরানো osteomyelitis-এর মতই উপসর্গ দেখা দেয়। এতে আক্রান্ত হাড়ে ব্যথা হয়। স্থানীয় জায়গায় চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে, রোগীর জ্বর হয়। এই জ্বর মাঝে মাঝে হয়। আবার বেশ কিছুদিন রোগীর জ্বর হয় না। আক্রান্ত হাড় বেশ মোটা হয়ে পড়ে। এই হাড়ের একটি x-ray করলে রোগ নির্ণয় সহজ হয়। অনেক সময় biopsy করাও হয়।

এই অসুখের পরিণামও ভালো নয়। রেডিও থেরাপি করে চিকিৎসা করা যায়, এতে টিউমার অনেকটা ছোট হয়ে যায়। শল্যচিকিৎসার সাহায্যে amputation করলে কিছুটা উপকার পাওয়া যেতে পারে, অবশ্য যদি রোগাক্রান্ত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই করা হয়। এই অসুখের শেষপর্যায়ে শরীরের নানা স্থানে secondary deposit দেখা দিতে পারে—সেক্ষেত্রে আর বিশেষ কিছু করার থাকে না।

দশম অধ্যায়
মাথা ব্যথা

মাথাধরা বা মাথাব্যথা একটি খুব পরিচিত উপসর্গ। প্রত্যেককেই কোন না কোন সময়ে মাথাব্যথায় ভুগতে হয়। অনেকে এটিকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, আবার অনেকের কাছে এই মাথাব্যথাই অসহ্য হয়ে ওঠে। এমন অনেক অসুখ আছে যেগুলি প্রাথমিকভাবে মাথাধরা দিয়েই শুরু হয়, ঠিক সময়ে ঠিকমত রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা না হলে অনেক সময় বিপদ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মাথাধরা সাধারণতঃ হয় মাথার অথবা ঘাড়ের মাংসপেশীর এবং রক্তনালীর অসুখে। অবশ্য মস্তিষ্ক এবং আনুষংগিক স্নায়ুতন্ত্রের কারণেও মাথাব্যথা হতে পারে। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মাথাব্যথার আতিশয্য বা তীক্ষ্নতা খুব একটা দরকারী নয়—কী ধরনের ব্যথা এবং কিসের কারণে হচ্ছে—সেটাই বেশী বিবেচ্য।

মাথার মধ্যে বেশীর ভাগ জিনিষেই কিন্তু ব্যথা বেদনার অনুভূতি নেই। অস্ত্রোপচারে কেটে ফেললে অথবা বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা করলেও কোনরকমের ব্যথা হয় না—তবে এখানে স্পর্শেন্দ্রিয় থাকে। যে অল্প কয়েকটি জিনিষে ব্যথা অনুভূতি আছে সেগুলি হলো—dura mater, ধমণী, শিরাসমূহ এবং পঞ্চম, নবম এবং দশম, cranial নার্ভ যখন নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্য সব cranial নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কিন্তু ব্যথাসৃষ্টি করে না। পঞ্চম cranial নার্ভ সাধারণতঃ dura, tentorium-এর উপরিভাগ এবং anterior এবং middle fossae-র রক্তনালীতে স্নায়ু সরবরাহ করে। সুতরাং এই সব জায়গার ব্যথা মাথার সামনের দিকে এবং অক্ষিগোলকের মধ্যে নির্দেশিত বা referred হয়। Tentorium-এর নীচের দিকটি, dura এবং posterior fossa-র রক্তনালীর স্নায়ু সরবরাহ আসে নবম এবং দশম cranial নার্ভ দিয়ে। এখানকার কিছু ব্যথা অনুভূতি দ্বিতীয় সারভাইকাল নার্ভ দিয়েও মস্তিষ্কে যায়। এই সব ব্যথা মাথার পেছনের দিকে এবং ঘাড়ে সীমাবদ্ধ থাকে।

মাথার মধ্যে venous sinus খুব বেশী প্রসারিত হয়ে পড়লে, টেন্টোরিয়ামে কোন রকমের ক্ষতি হলে, dura-তে বেশীরকমের টান ধরলে বিশেষতঃ মস্তিষ্কের নীচের দিকে টান হলে প্রচন্ড ব্যথার সৃষ্টি হয়। Dura-র রক্তনালীর কোন রকমের ক্ষতি, টান, সংকোচন বা প্রসারণ ঘটলে অত্যন্ত মাথাব্যথা হয়। এদের মধ্যে middle meningeal artery খুবই ব্যথার অনুভূতিপ্রবণ।

মস্তিষ্কের বাইরের নানা কারণে মাথাব্যথা হতে পারে। এদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাথার উপরিভাগে, ঘাড়ের এবং গলার রক্তনালী যদি খুব বেশী প্রসারিত হয় তবে মাথাব্যথা হতে পারে। অত্যধিক রক্তচাপের ফলেও মাথাব্যথা হয়। এতে মাথা দপদপ (throbbing) করে। মাথাব্যথার ব্যাপ্তি নির্ভর করে কোন দিকের কত রক্তনালী প্রসারিত হয়েছে তার উপর।

মাথার, ঘাড়ের বা মুখের মাংসপেশীর সংকোচন হলে বা টান ধরলে মাথাব্যথা হয়। তখন যেন মাথায় এক চাপ সৃষ্টি হয়—মাথা টানটান হয়ে পড়ে। মানসিক চিন্তা, দুর্ভাবনায় অনেক সময় মুখের মাংসপেশীতে টান হয়—এতেও মাথাব্যথা হতে দেখা যায়।

নাকের সাইনাসে প্রদাহ হলে মাথাব্যথা হয়। এতে aching টাইপের ব্যথা হয়। কোন সাইনাসে প্রদাহ হয়েছে তার উপর নির্ভর করে মাথাব্যথার ব্যাপ্তি। সাধারণতঃ চক্ষুগোলকে, মাথায়, কপালে এবং উপরে চোয়ালে ব্যথা হয়। সাইনাসে কোন টিউমার হলে ব্যথা খুবই তীব্র এবং অনেক জায়গা জুড়ে হয়। Maxillary সাইনাসের প্রদাহে মুখেও ব্যথা হয়।

চোখের অসুখে যখন রোগী ঠিকমত দূরের অথবা কাছের জিনিষ দেখতে পায় না, তখন চোখের উপর খুবই চাপ পড়ে। Ciliary মাংসপেশীতে টান পড়ে বা সংকুচিত হয়—রোগী ভালোভাবে দেখতে চেষ্টা করে। এতেও মাথাব্যথা হয়। এই ব্যথা অক্ষিগোলকের পিছনের দিকে (retro orbital) হয়। চোখের মাংসপেশী ছাড়াও মুখের অন্যান্য মাংসপেশীতেও এই অবস্থায় টান হতে পারে—এটিও মাথাব্যথার আর একটি কারণ। অনেকক্ষণ প্রখর সূর্যের আলোকের দিকে তাকালে বা ওয়েল্ডিং করার সময় তীব্র আলোকে মাথাব্যথা করতে পারে। এই ব্যথা খুব বেশী ধরনের হতে পারে—এর স্থায়িত্বও দু'একদিন হতে পারে। তীব্র আলোকে চোখের retina ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মাথাব্যথা হয়।

মানসিক অসুখে মাথাব্যথা প্রায়শই দেখা যায়। এটি সাধারণতঃ dull aching টাইপের ব্যথা। স্থায়িত্ব কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত হতে পারে। একবার কমে গেলেও আবার পরে ব্যথা ফিরে আসতে পারে। এতে রোগী খুবই অবসাদগ্রস্ত থাকে।

Trigeminal ব্যথা বা অন্য neuralgia-র ব্যথা বেদনা খুবই তীব্র ধরনের হয়। এই ব্যথা মাঝে মধ্যে ভালো থাকে—আবার অনেক সময় তা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

কয়েকটি বিশেষ ধরনের মাথা ব্যথা

মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ কারণে মাথা ব্যথা :

মস্তিষ্কের মধ্যে নানারকম অসুখে মাথা ব্যথা হতে পারে। মেনিনজাইটিশ, মস্তিষ্কের টিউমার, aneurism ইত্যাদি অসুখের নানা উপসর্গের প্রধানতম হলো মাথা ব্যথা। এর সাহায্যেই অনেক সময় রোগ নিরূপণ সহজ হয়।

মেনিনজাইটিসে মাথা ব্যথা :

এই অসুখে মস্তিষ্কের meninges-এ প্রদাহ হয় এবং রোগীর প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হয়। Dura mater-এ ব্যথা অনুভূতি আছে, তাছাড়া আনুষংগিক রক্তনালীর প্রদাহও মাথা ব্যথার কারণ হয়। এতে সমস্ত মাথা জুড়েই ব্যথার সৃষ্টি হয়। Subarachnoid রক্তক্ষরণ হলেও অনেক সময় meningeal irritation হয়। এতে অবিরাম মাথা ব্যথা হয়। অনেক সময় occipital এবং nuchal area-তে ব্যথা সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। আবার এতে ঘাড়ের মাংসপেশীতেও টান ধরতে পারে এবং kernig's sign পজিটিভ হতে পারে। এই ধরনের মাথা ব্যথা খুবই প্রচণ্ড ধরনের হয়।

সোজাসুজি meningeal injury হলে মাথা ব্যথা :

সাধারণতঃ মস্তিষ্কের অপারেশনের পর রোগীর কয়েকদিন ধরে মাথা ব্যথা হতে পারে। এটি শুধু যে meningeal injury-র জন্য হয় তা নয়, মস্তিষ্কের আঘাতজনিত কারণও কিছু থাকে। Head injury-র সংগে meninges-এ আঘাত থাকতে পারে এবং তার জন্যও মাথা ব্যথা হতে পারে।

মস্তিষ্কের টিউমারজনিত মাথা ব্যথা :

টিউমারের প্রথমদিকে বিশেষ মাথা ব্যথা হয় না, কিন্তু যখন টিউমার অত্যধিক বেড়ে যেতে থাকে, তখন dura mater এবং রক্তনালীতে অত্যধিক চাপ পড়ার জন্য মাথা ব্যথা হতে পারে। এই টিউমারজনিত মাথা ব্যথা মাথার একটি জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকে—সাধারণতঃ যেখানকার meninges টিউমার দ্বারা আক্রান্ত হয়। Tentorium-এর উপরিভাগে টিউমার হলে মাথার সামনে এবং নীচেরদিকে টিউমার হলে মাথার পেছনের দিকে মাথা ব্যথা সীমিত থাকে।

মস্তিষ্কস্থিত aneurism :

এই aneurism-ও এক ধরনের টিউমার। খুব তাড়াতাড়ি এর বিস্তৃতি ঘটলে মাথা ব্যথা হতে পারে। এই ব্যথা খুব প্রচণ্ড ধরনের হয়। দপদপ করা (throbbing) ব্যথা হয় এবং মোটামুটিভাবে একই জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে। Posterior communicating artery-তে এই aneurism খুবই হয় এবং এটি oculomotor নার্ভের কাছাকাছি থাকে। সুতরাং বড় ধরনের aneurism হলে অনেক সময় এই নার্ভের palsy হতে দেখা যায়।

Subdural haematoma-জনিত মাথা ব্যথা :

এই haematoma তার বিস্তৃতি অনুযায়ী meningeal irritation করতে পারে এবং তার ফলে মাথা ব্যথাও হতে পারে। মাথার যেদিকে haematoma হয় সেইদিকেই ব্যথা হয়। সাধারণতঃ একদিকেই ব্যথা হয় এবং সেই ব্যথা অবিরাম হতেই থাকে।

মস্তিষ্কস্থিত অত্যধিক চাপে মাথাব্যথা :

মস্তিষ্কে বেশী চাপসৃষ্টি হলে মধ্যেকার ভেন্ট্রিকলগুলি প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং এর ফলে রক্তনালীর মধ্যে টান এবং চাপ সৃষ্টি হয়। এতে মাথা ব্যথা হয়। যত তাড়াতাড়ি প্রেসার বাড়ে, তত বেশী এবং তীব্র ধরনের ব্যথা হয়। এতে মাথার পেছনের দিকেই বেশী ব্যথা হয়। এই ব্যথা সাধারণ মাথা ধরা থেকে একেবারেই আলাদা—রোগী নিজেই সেটি ভালো বুঝতে পারে। কাশি, হাঁচি ইত্যাদিতে ব্যথা বেড়ে যায়। মাথা ব্যথার সংগে বমি বমি ভাব, চোখের গন্ডগোল

যেমন papilloedema, cranial nerve palsy ইত্যাদিও হতে পারে। স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়ার পরে এই ধরনের মাথা ব্যথা হতে পারে।

মস্তিষ্কস্থিত অত্যধিক চাপ হ্রাসে মাথা ব্যথা :

স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়ার পরে যদি সুষুম্না রস (cerebrospinal fluid) বাইরে dura-র ছিদ্রপথে বেরিয়ে আসে, তবে অনেক সময় মস্তিষ্কের প্রেসার অস্বাভাবিকভাবে কমে যায় এবং তার ফলে মাথা ব্যথা হতে পারে। এমনও দেখা গেছে যে ২০ মিলিলিটার সুষুম্না রস বের করে দিলে রোগী যদি সোজা বা খাড়া অবস্থায় থাকে, তবে মাথা ব্যথা হতে পারে। প্রেসার কমানোর জন্য মস্তিষ্কের বিভিন্ন dural surface প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং এটিই ব্যথা সৃষ্টির কারণ হয়।

রক্তচাপ বৃদ্ধিজনিত মাথা ব্যথা :

সাধারণতঃ malignant hypertension-এর রোগীরা অত্যধিক মাথা ব্যথায় ভোগে। এই ব্যথা দপ দপ করা বা throbbing ধরনের হয়। রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য migraine-এর ব্যথাও অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়।

Temporal arteritis-এর জন্য মাথা ব্যথা :

এই temporal arteritis সাধারণতঃ polymyalgia rheumatica অসুখে হয়। বৃদ্ধ এবং মধ্যবয়সীদের ক্ষেত্রে এটি বেশী হয়। পুরুষদের চেয়ে স্ত্রী-লোকদের এই অসুখ বেশী হয়। এই অসুখে শরীরের মাংসপেশীসমূহ খুবই শক্ত (stiff) হয়ে পড়ে। রোগী অত্যন্ত ক্লান্তি ও অবসাদে ভোগে। শরীরের ওজনও কমতে থাকে। এদের temporal arteritis থাকলে মাথার উপরিভাগে (scalp-এ) চাপ দিলে ব্যথা হয়। মাথা ব্যথা থাকে এবং temporal artery-তে নাড়ী পাওয়া যায় না। এদের E. S. R. অত্যন্ত বেশী থাকে। Ophthalmic artery আক্রান্ত হলে রোগী অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এর চিকিৎসায় অনেক পরিমাণে স্টেরয়েড (steroid) দিতে হয়।

অ্যালকোহলজাত মাথা ব্যথা :

অত্যধিক মদ্যপানে আসক্ত লোকের প্রায়ই মাথা ধরে। সাধারণতঃ অ্যাল-কোহল শরীরে নানারকম বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং এতে meningeal irritation হয়। এতেই মাথা ব্যথা হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্যে মাথা ব্যথা :

কোষ্ঠকাঠিন্যে অনেক সময় মাথা ব্যথা হয়। এই মাথা ব্যথার জন্য বৃহদান্ত্র থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা কখনোই কাজ করে না। কোষ্ঠকাঠিন্যে শরীরের রক্তে বেশী পরিমাণে বিপাকীয় বিষতুল্য জিনিষের শোষণ হয় এবং অনেক সময় শরীরে রক্তচলাচলও ব্যাহত হতে পারে। মস্তিষ্কেও রক্তপ্রবাহ কমে যেতে পারে। এই সব কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে।

মাইগ্রেন (Migraine) :

মাইগ্রেন একটি বিশেষ ধরনের মাথা ব্যথা। এটি একটি রক্তনালীসংক্রান্ত অসুখ। অবশ্য সঠিক কি কারণে এই অসুখ হয় তা ভালো বোঝা যায়নি।

মাইগ্রেনের মাথা ব্যথা আরম্ভ হওয়ার আগে রোগীর কিছু উপসর্গ হয় এবং বুঝতে পারে, খানিক পরেই মোটামুটি আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যেই মাথা ব্যথা আরম্ভ হবে। এই উপসর্গগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—যেমন বমি বমি ভাব, চোখে দেখার অসুবিধা, নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ দেখা, নানারকমের sensory hallucinations ইত্যাদি। এই অসুখের কারণ সম্বন্ধে নানারকমের মতবাদ আছে। তার একটিতে বলা হয় যে অত্যধিক মানসিক আবেগে, উচ্ছাসে বা চাপে মাথার এবং মস্তিষ্কের কিছু কিছু রক্তনালীতে সংকোচন ঘটে। তার ফলে সেই সব শরীরের অংশে রক্ত সরবরাহ বিঘ্নিত হয় এবং তাতেই রোগীর এই সব উপসর্গ হয়। অত্যধিক রক্তচলাচল ব্যাহত হলে এই সব রক্তনালী পরে প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং এদের vascular tone একেবারে থাকে না। রক্তচাপের দরুন এগুলি তখন খুব বেশী প্রসারিত হয়ে পড়ে এবং অস্বাভাবিকভাবে স্পন্দন হতে থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যেকার এবং বাইরের রক্তনালীও এইভাবে আক্রান্ত হতে পারে। এই সবের জন্যই মাইগ্রেনে এত অসহ্য মাথা ব্যথা হয়। কতটা এবং কী ধরনের ব্যথা হবে তা নির্ভর করে কতটা মস্তিষ্কের অংশ অথবা brain stem-এ রক্তচলাচল ব্যাহত হয়েছে তার উপর। সাধারণতঃ external carotid artery-র বিভিন্ন ধমণীই আক্রান্ত হয়। এই মাইগ্রেনের ব্যথা দপ দপ করা বা throbbing টাইপের।

Posterior cerebral artery আক্রান্ত হলে occipital lobe ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে রোগীর চোখের দেখার গন্ডগোল দেখা দেয়। যখন brain stem-এর

কাজ বিঘ্নিত হয় তখন বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, রক্তচাপ হ্রাস, cranial nerve palsy এবং অনুভূতির অস্বাভাবিকতা (paresthesia) দেখা যায়। Middle cerebral artery আক্রান্ত হলে শরীরের অর্ধাংশ অবশ অসাড় হয়ে যেতে পারে।

আর একটি মতবাদে বলা হয় যে রক্তপ্রবাহে বেশী serotonin থাকার জন্যই এই অসুখ হয়। এই সেরোটোনিন রক্তনালীর সংকোচন ঘটায়। স্বাভাবিকভাবেই রক্তের অনুচক্রিকায় এই সেরোটোনিন থাকে। মাইগ্রেনে আক্রান্ত হবার ঠিক আগে রক্তে সেরোটোনিনের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়, আবার আক্রান্ত হবার পরে মাত্রা আস্তে আস্তে কমে যায়। এই সেরোটোনিন রক্তনালীর সংকোচন ঘটিয়ে cerebral cortex এবং brain stem-এ ischaemia করে এবং পরে সেরোটোনিনের মাত্রা কমে গেলে রক্তনালীর প্রসারণ ঘটায় এবং মাথা ব্যথার কারণ হয়।

মাইগ্রেনের চিকিৎসা :

অনেক সময়েই সাধারণ ব্যথা বেদনানাশক ওষুধে ভালোই কাজ দেয়। অবশ্য এর সংগে ergotamine tartrate ১ থেকে ২ মিলিগ্রাম জিভের নিচে ট্যাবলেট হিসাবে দিলে ভালো উপকার পাওয়া যায়। এই ওষুধটি রক্তনালীর সংকোচন ঘটায় এবং মাথা ব্যথাও ম্যাজিকের মত ভালো হয়ে যায়। এই ওষুধ অসুখের প্রথম দিকেই দেওয়া উচিত, নচেৎ ভালো ফল পাওয়া যায় না। Ergotamine inhaler হিসাবেও শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে দেওয়া যায়। এতে তাড়াতাড়ি ওষুধটি শোষিত হ'য়ে রক্তপ্রবাহে মিশে যায়। এর মাত্রা কখনোই দিনে ৪ মিলিগ্রামের বেশী হওয়া উচিত নয়। আর্গটামিন করোনারী অসুখে, Raynaud's অসুখে এবং গর্ভবতী মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করাই ভালো। কেননা এতে রক্তনালী সংকোচনের ফলে এই সব অসুখ আরও গুরুতর হয়ে যেতে পারে এবং গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে গর্ভপাত হয়ে যেতে পারে।

কিছু serotonin antagonist ওষুধও বিশেষভাবে ব্যবহার করা যায় এই সব ক্ষেত্রে। এই সব ওষুধের মধ্যে methysergide (দৈনিক ১ থেকে ৪ মিলিগ্রাম), cyproheptadine (দৈনিক ৮ থেকে ৩২ মিলিগ্রাম), এবং pizotifen (দৈনিক ১ থেকে ৩ মিলিগ্রাম) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এসব ছাড়াও clonidine দৈনিক ০.০২৫ থেকে ০.০৭৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় দিলে

মাইগ্রেন হবার আশংকা থাকে না। এটি প্রতিষেধক (prophylactic) ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

যখন কোন ওষুধেই বিশেষ কাজ হয় না, তখন propranolol দিয়ে দেখা যেতে পারে। এটি একটি ভালো adrenergic β blocker ওষুধ। এডরেনালিন যে রক্তনালীর প্রসারণ ঘটায়—এই ওষুধ সেটি ঘটতে দেয় না। Monoamine oxidase inhibitor ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে, কেননা এটি রক্তে সেরোটোনিন লেভেল বাড়াতে সাহায্য করে। এই ওষুধ খুব সাবধানে এবং বিশেষ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা উচিত।

Migranous neuralgia :

একে অনেক সময় cluster headache বলা হয়। এটি মস্তিষ্কস্থিত রক্তনালীর অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের জন্যই হয়। এই মাথা ব্যথা আরম্ভ হওয়ার আগে রোগী মোটেই বুঝতে পারে না। আগে কোনরকম উপসর্গ দেখা দেয় না। সাধারণতঃ পূর্ণবয়স্ক পুরুষদেরই এই ধরনের মাথা ব্যথা হতে দেখা যায়।

এতে মুখে, কপালে এবং চক্ষুকোটরে প্রচণ্ড রকমের ব্যথা হয়। সাধারণতঃ শরীরের একদিকেই ব্যথা হয়, তবে অন্য সময়ে আবার অন্যদিকে ব্যথা হতে পারে। একই সময়ে দুই দিকেই ব্যথা হওয়া খুবই অস্বাভাবিক। এটিও throbbing ধরনের ব্যথা। এই ব্যথা হওয়ার সময় মুখের চামড়ায় রক্তনালীর প্রসারণ ঘটে, চোখে conjunctival রক্তনালীসমূহ প্রসারিত হয়, নাক বন্ধ হয়ে যায়, এবং নাক দিয়ে অনবরত জল পড়তে থাকে।

এই ব্যথার একটি নিজস্ব ধরন আছে। অনেক সময় রোগী রাত্রে ব্যথায় জেগে ওঠে—পর পর কয়েকদিন একই ঘটনা ঘটতে থাকে। আবার কিছুদিন পর সব সেরে যায়—কোন ব্যথাই থাকে না। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে দিনেও এই ব্যথা আরম্ভ হতে পারে এবং ব্যথার কোন সময় অসময় থাকে না।

অনেক সময় internal carotid artery এই অসুখে আক্রান্ত হয় এবং বেশ প্রসারিত হয়ে পড়ে। তার ফলে কাছাকাছি সংবেদী (sympathetic) নার্ভে অনেক সময় চাপ পড়ে—বিশেষতঃ skull-এর base-এ। পরিণামে সেইদিকের চোখে ptosis এবং চোখের তারা ছোট হয়ে পড়ে।

এই অসুখে রক্তে হিস্টামিনের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু সেরোটোনিন

মোটেই বাড়ে না। রক্তনালী যদি আগে থেকে অনুভূতিপ্রবণ (sensitized) অবস্থায় থাকে তবেই হিস্টামিন এই সব ক্ষেত্রে রোগাক্রমণ ঘটাতে পারে।

এই মাইগ্রেনজনিত নিউর‍্যালজিয়ার চিকিৎসা সাধারণতঃ মাইগ্রেনের মতই। এতে ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। Ergotamine tartrate এ ক্ষেত্রেও ভালোই কাজ করে। অনেক সময় methysergide বেশী মাত্রায় দৈনিক ৮ থেকে ১০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়।

ট্রাইজেমিনাল নিউর‍্যালজিয়া (Trigeminal neuralgia) :

এই অসুখ tic douloureux বলেও পরিচিত। এতে প্রচন্ড ব্যথা হয় এবং অসহ্য যন্ত্রণায় রোগীর মুখ বিকৃত হয়ে পড়ে। এই অসুখ সাধারণতঃ মধ্য-বয়স্কদের বেশী হয়। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদেরই বেশী হয়। ট্রাইজেমিনাল নার্ভের আংশিক বা পুরো অংশে এই নিউর‍্যালজিয়া হতে পারে। এই ব্যথার প্রকোপ বার বার আসে। এই ব্যথা শরীরের একভাগেই সীমাবদ্ধ থাকে—অন্য দিকে যায় না। কিছু না কিছু trigger point থাকে। কোন জায়গার চাপ, স্পর্শ, খাবার খাওয়ার সময়, চিবানোর সময় বা কথা বলার সময় এই অসুখের প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে। তবে এই ব্যথা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না—কয়েক মিনিট মাত্র থাকে। পরে ব্যথা একবারেই চলে যায়। দুইটি প্রকোপের মাঝে কোন ব্যথা থাকে না।

যদি নার্ভের প্রথম বিভাগ (division) আক্রান্ত হয়, তবে গালে ব্যথা হয়। এর পর যখন এই ব্যথা উপরের চোয়ালে, ঠোঁটে এবং চোখেও ছড়িয়ে পড়ে, তখন বুঝতে হবে নার্ভের দ্বিতীয় বিভাগও আক্রান্ত হয়েছে। আর তৃতীয় বিভাগ আক্রান্ত হলে কানে, গালে এবং জিভে অত্যধিক ব্যথা হয়। একবার আক্রান্ত হবার পর অনেকদিন আর কোন ব্যথা নাও হতে পারে। কমবয়সী লোকেদের এই ধরনের ব্যথা হলে অন্য কোন মস্তিষ্কের অসুখ আছে কিনা তা নির্ণয় করা দরকার।

ট্রাইজেমিনাল নিউর‍্যালজিয়ার চিকিৎসা :

এই অসুখে সব থেকে ভালো কাজ করে carbamazepine। এটি tricyclic imipramine গ্রুপের ওষুধ। দৈনিক ৬০০ মিলিগ্রাম হিসাবে দেওয়া হয়

কয়েকটি ভাগে ভাগ করে। অবশ্য রোগের প্রকোপ অনুযায়ী এর চেয়ে বেশী মাত্রাতেও দেওয়া হয়। এই ওষুধের অনেক কুফলও আছে—যেমন রক্তের নানা রকম প্রতিক্রিয়া, extrapyramidal কিছু উপসর্গ, নাড়ীর গতিবৃদ্ধি, রক্তচাপ-হ্রাস ইত্যাদি। এই ওষুধ কয়েকটি ক্ষেত্রে না দেওয়াই উচিত। যে সব রোগীর glaucoma আছে, যারা monoamine oxidase inhibitor ওষুধ খায় এবং যাদের রক্তের কোনরকমের অসুখ আছে—তাদের এ ওষুধ না দেওয়াই ভালো।

এছাড়াও phenytoin দিলেও অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। এই সমস্ত ওষুধ সবই খিঁচুনি নিবারক (amtiepileptic)। তাই অনেকের মতে এই নিউর্যালজিয়ার ব্যথা কেন্দ্রীয় trigeminal nucleus-এর মাধ্যমেই আসে। আবার অনেকের মতে এই ব্যথার সবটাই প্রান্তীয় বা peripheral।

শল্যচিকিৎসা :

এই ট্রাইজেমিনাল নিউর্যালজিয়ার ব্যথা যখন কোন ওষুধে সারে না অথবা ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ওষুধ বেশী দেওয়া যায় না, তখনই শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এই চিকিৎসায় নার্ভকে তার গতিপথের যে কোন জায়গায় ছেদন করা হয়, যাতে কোন ব্যথা অনুভূতি না যেতে পারে। এই শল্যচিকিৎসায় মুখের সেইদিকে কোন অনুভূতি থাকে না—সেই অসাড়তা আবার অনেকে সহ্য করতে পারে না। সুতরাং একান্ত দরকারে এবং রোগীকে ঠিকমত বুঝিয়ে তবেই এই শল্যচিকিৎসা করা হয়।

প্রান্তীয় নার্ভগুলি infraorbital foramen অথবা supraorbital notch-এ ব্লক করা যায়। এখানকার নার্ভগুলিকে অ্যালকোহল বা ফেনল ইঞ্জেকশন দিয়ে ব্যথা অনুভূতি কমানো যায়। Trigeminal ganglion-এও এইভাবে ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে। তবে পরে নার্ভের আবার regeneration হতে পারে এবং ফলে ব্যথাও আবার ফিরে আসতে পারে।

Gasserian ganglion-ও অনেক সময় ব্লক করা হয়। এতেও অ্যালকোহল বা গ্লিসারিনমিশ্রিত ফেনল ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

শল্যচিকিৎসায় ট্রাইজেমিনাল নার্ভকে ছেদন করা হয়—ganglion-এর আগেই, যাতে পরে কোনরকমে regeneration না হতে পারে। ট্রাইজেমিনাল নার্ভের sensory এবং motor root মাথার খুলির মধ্যে আলাদাভাবে চিনে নিয়ে ঠিক

sensory root-টিকেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। এতে motor root ঠিক থাকে এবং চোয়ালের কাজে কোন অসুবিধা হয় না। তবে অনেক সময় এই শল্য-চিকিৎসা আশানুরূপ ফল নাও দিতে পারে।

Radiofrequency coagulation :

এটি ট্রাইজেমিনাল নিউর‍্যালজিয়ার একটি অত্যাধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি। এতে ঠিক শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু ফল অনুরূপই হয়। এই পদ্ধতিতে একটি সূঁচ ইলেকট্রোড foramen ovale দিয়ে পাঠানো হয়—মুখের ১½ ইঞ্চি পাশ থেকে। এই সূঁচটি শেষের ৫ মিলিমিটার ছাড়া পুরোটাই অপরি-বাহী পদার্থ দিয়ে মোড়া থাকে (insulated)। সূঁচটি ধীরে ধীরে পাঠানো হয়—যতক্ষণ না সুষুম্না রস আসে। তারপর বৈদ্যুতিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করা হয়। এতে রোগীর ঝিনঝিনে ব্যথা অনুভব হয় এবং ঠিক কোন জায়গা থেকে বেশী ব্যথা হয় তা রোগী বুঝতে পারে। ঠিক সেই জায়গায় সূঁচের অগ্রভাগ রেখে radiofrequency heat coagulation করা হয়। এতে ব্যথা বেদনা একেবারেই চলে যায় কিন্তু একেবারে অসাড় হয়ে পড়ে না। তবে এতে অ্যানেস্থিসিয়া dolorosa হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

অ্যানেস্থিসিয়া dolorosa :

ট্রাইজেমিনাল নার্ভকে তার গতিপথে নষ্ট করে দেওয়ার পর এই নতুন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এতে যদিও মুখের আংশিক বা পুরো অংশ অসাড় থাকে—তবুও রোগী অনেক সময় ব্যথা অনুভব করে। অনেক সময় এই ব্যথা রোগীর কাছে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই উপসর্গ যাতে না হয় তা একান্তভাবেই দেখা উচিত। Differential radiofrequency coagulation করে ট্রাইজে-মিনাল root নষ্ট করার সময় কিছু ব্যথা অনুভূতি বোধ হয় রেখে দেওয়াই ভালো। এতে অ্যানেস্থিসিয়া dolorosa হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

Glossopharyngeal neuralgia :

এতেও ট্রাইজেমিনাল নিউর‍্যালজিয়ার মত প্রচন্ড ব্যথা হয়। কিন্তু এই glossopharyngeal নিউর‍্যালজিয়া খুব একটা হয় না। রোগীর খাওয়ার সময়, ঢোক গেলার সময় এবং জিভ নড়াচড়া করার সময় এই ব্যথার প্রকোপ হয়

বেশী। এর চিকিৎসা হিসাবে glossopharyngeal নার্ভ ব্লক করা হয়। শল্যচিকিৎসার দ্বারা এই নার্ভের ছেদন করলেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

মাথা ব্যথায় আকুপাংচার :

আকুপাংচারের সাহায্যে ব্যথাউপশম করা এখন একটি প্রচলিত পদ্ধতি। সব ব্যথার মত মাথা ব্যথার ক্ষেত্রেও আকুপাংচার ভালোভাবে কাজ করে। মাইগ্রেনের ক্ষেত্রে যেখানে অন্য কোন চিকিৎসায় বিশেষ কাজ হয় না অথবা অন্য আধুনিক চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব হয় না, সেখানে আকুপাংচার পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী হতে পারে। তবে এই পদ্ধতি প্রয়োগের আগে অন্য কোন neurological অসুখ যে নেই—সেটা নির্ণয় করে নেওয়া দরকার। আকুপাংচারের আগে রোগীর মানসিক অবস্থার কথাও বিচারবিবেচনা করা উচিত। মাথা ব্যথাকে একটি উপসর্গ বলেই মনে রাখা উচিত। আকুপাংচারের সাহায্যে তাড়াতাড়ি হয়তো ব্যথা বেদনা কমানো যায় বা উপশম করা যায় কিন্তু নিরাময় হয় না।

সমস্ত মাথা ব্যথার ক্ষেত্রে সুচিকিৎসার জন্য কয়েকটি বিশেষ জিনিষ মনে রাখা দরকার।

১। মস্তিষ্কে যাতে রক্তপ্রবাহ যথাযথ থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে।

২। শরীরের বিভিন্ন হরমোন যাতে সুসমঞ্জস থাকে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

৩। মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহে গন্ডগোল থাকলে তা ঠিক করতে হবে।

৪। রোগীর মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

৫। মাথা ব্যথা একটি রোগের উপসর্গ। সুতরাং রোগীর সবতন্ত্রই যথাযথ পরীক্ষা করতে হবে। রোগ নির্ণয় যথাযথ হওয়া দরকার।

৬। যথেষ্ট ধৈর্যসহকারে এসব রোগীর চিকিৎসা করতে হবে এবং অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করে যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

একাদশ অধ্যায়
দীর্ঘস্থায়ী নানান ব্যথা

ফাইব্রোসাইটিস (fibrositis) :

এটি একটি রিউম্যাটিক (rheumatic) অসুখ। সাধারণভাবে মাংসপেশীতে এটি হয়। এতে মাংসপেশীসমূহ আড়ষ্ট এবং শক্ত হয়ে পড়ে এবং ব্যথা হয়। সাধারণতঃ বড় বড় মাংসপেশীসমূহেই এই ব্যথা দেখা যায়। এই ব্যথা আরও বেড়ে যায় যদি মাংসপেশী অচল অবস্থায় থাকে, ঠান্ডা এবং স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এবং রোগীর অত্যধিক ক্লান্তি এবং অবসাদে। এই ব্যথা সবসময়ের aching ধরনের হয়, মোটামুটি সীমাবদ্ধই থাকে। সে জায়গায় চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে। অবশ্য অনেক সময় এর নির্দেশিত ব্যথাও থাকতে পারে। চাপ দিলে যে জায়গায় সব থেকে বেশী ব্যথা অনুভূত হয়, তাকে trigger পয়েন্ট বলে।

এই ফাইব্রোসাইটিসের ব্যথাউপশমের জন্য অনেক ধরনের চিকিৎসা করা হয়। রোগীকে ভালো বিশ্রামে রাখা দরকার। ব্যথার জায়গায় একটু গরম সেঁক দিলে ভালো হয়। দরকার মত ব্যায়াম করানো যেতে পারে।

ব্যথাউপশমকারী ওষুধের মধ্যে অ্যাসপিরিন, প্যারাসিটামল ইত্যাদি খুবই ভালো কাজ দেয়। তবে দরকার হলে এর চেয়েও কড়া ধরনের ওষুধ দিতে হবে। কিছু প্রদাহনিবারক ওষুধ যেমন indomethacin দিতে হতে পারে।

এই ব্যথার জায়গায় লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দিলে ব্যথার উপশম হয়। অনেক সময় এই ব্যথা একেবারেই সেরে যায়—ব্যথা আর ফিরে আসে না। ব্যথা ফিরে এলে পরে আবার ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

Trigger পয়েন্টকে উদ্দীপনা করলে ব্যথা অনেক সময় কমে যায়। উদ্দীপনা নানাভাবে করা যায়—যেমন শুধুমাত্র সূঁচ ফুটিয়ে, ঐ জায়গায় চাপ সৃষ্টি করে, হাইপারটোনিক স্যালাইন ইঞ্জেকশন দিয়ে অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাহায্যে। এতে অনেক সময়ই ভালো কাজ হতে দেখা যায়।

এই সব ক্ষেত্রে আকুপাংচার খুবই সুচারুভাবে ব্যথানিবারণ করতে পারে।

রিউম্যাটিক পলিমায়ালজিয়া (Rheumatic polymyalgia) :

এটি খুবই খারাপ ধরনের অসুখ। এটি সাধারণতঃ বেশী বয়সের অসুখ, পুরুষদের অপেক্ষা মেয়েদেরই বেশী হয়। হঠাৎ আরম্ভ হয়। মাংসপেশীতে টান এবং ব্যথা হয়। ঘাড় এবং গলায় শুরু হয় এবং পরে কোমরের মাংসপেশীতেও ব্যথা হয়। সকালের দিকে ব্যথা এবং মাংসপেশীর আড়ষ্টতা বেশী থাকে। এর সংগে মাথা ব্যথাও থাকে। মাথায় চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে। অনেক সময় রক্তনালীতে প্রদাহ থাকে।

এদের ঠিক মত রোগ নির্ণয় হওয়া দরকার। এদের প্রচুর মাত্রায় steroid দিতে হয়। ব্যথা উপশমের জন্য ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া হয়।

টেনিশ কনুই (Tennis elbow) :

এটি হাতের এবং কনুইর কিছু extensor মাংসপেশীর প্রদাহের ফলে হয়। সাধারণতঃ যে সব extensor মাংসপেশী humerus হাড়ের পাশের epicondyle-এ লাগে তাদেরই প্রদাহ। প্রথমদিকে কোন রকমের আঘাতের ফলে হয়। ঠিকমত চিকিৎসা না হলে এটি দীর্ঘস্থায়ী হয়। এটিও এক ধরনের ফাইব্রোসাইটিস।

এতে রোগী হাত নাড়াচাড়া করতে ব্যথা অনুভব করে। এই অসুখে কিন্তু কনুইয়ের গ্রন্থির কোন গণ্ডগোল থাকে না। প্রথম দিকে রোগীর হাতটিকে যথেষ্ট বিশ্রাম দিলেই সেরে যায়। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দিয়ে ইঞ্জেকশন দিলে কিছু উপকার হতে পারে। কিন্তু পরে এ ব্যথা আবার ফিরে আসতে পারে এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যথায় পরিণত হতে পারে। শেষে শল্যচিকিৎসার দরকার হতে পারে।

স্কন্ধে ব্যথা (Painful shoulder) :

স্কন্ধে বা কাঁধে ব্যথা একটু বেশী বয়সের স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। এই স্কন্ধ গ্রন্থিতে অনেক মাংসপেশী, টেন্ডন, বার্সা, ক্যাপসুল, লিগামেণ্ট ইত্যাদি জড়িত থাকে। এই সব জিনিষের প্রদাহ এবং এর সংগে

হাড়ের ক্ষয় এবং প্রদাহ—সব মিলে এই গ্রন্থিটিকে অকেজো করে ফেলে এবং প্রচণ্ড ব্যথার সৃষ্টি হয়। রোগীর হাত মাথার উপর তোলা, পেছনে বা সামনে ফেরানো ইত্যাদি খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

এর চিকিৎসায় রোগীর হাতকে বিশ্রামে রাখতে হবে। হাতে একটি স্লিং দিয়ে ঝুলিয়ে রাখলে ভালো হয়। ব্যথানাশক ওষুধ দিতে হবে। গরম সেঁক বা শর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি দিলে উপকার পাওয়া যায়। চিকিৎসকের পরামর্শমত physiotherapy অত্যাবশ্যক। গ্রন্থিতে অনেক সময় লোকাল অ্যানেস্থিসিয়া ওষুধ এবং স্টেরয়েড মিশিয়ে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়—এতে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। বার বার এই ইঞ্জেকশন দিতে হয়। প্রদাহনিবারক হিসাবে indomethacin দেওয়া যেতে পারে।

Frozen shoulder বা জমাট-স্কন্ধ অনেক সময় করোনারী থ্রম্বোসিস অসুখের পরে দেখা যেতে পারে পরবর্তী উপসর্গ হিসাবে। এই periarthritis সুচিকিৎসায় বিশেষতঃ ডায়াথার্মি প্রয়োগ করে, পরামর্শমত হাতের ব্যায়াম এবং physiotherapy করে সেরে যেতে পারে। অ্যানেস্থিসিয়ায় হাতের এবং কাঁধের গ্রন্থির manupulation করাও যেতে পারে।

গেঁটে বাত (Gout) :

এটি purine metabolism-এর গন্ডগোলে এবং রক্তে ইউরিক এসিড বেশী মাত্রায় থাকার জন্য গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়। সাধারণতঃ পুরুষদেরই এই রোগ ফুলে বেশী হয়। প্রথমে পায়ের বুড়ো আঙুলের গ্রন্থিতে হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথা হয়—ফুলে যায়। এই ব্যথা দু'এক সপ্তাহ থাকে। আপনা থেকেই সেরে যেতে পারে। তবে অনেকদিন ভালো থাকার পর আবার ব্যথা হয় এবং অন্য সব গাঁটেও ছড়িয়ে পড়ে। এর ব্যথা জ্বালা করা হতে পারে, দপ দপ করা (throbbing) হতে পারে। সে আঙুল নাড়াচাড়া করা যায় না। সে জায়গার তাপও বেড়ে যায়, লাল হয়ে পড়ে। গোড়ালি, হাঁটু, কব্জি, কনুই ইত্যাদি গ্রন্থিতেও এই ব্যথা হয়। দীর্ঘস্থায়ী গাঁটের বাতে হাতের বা পায়ের আঙুল বেঁকে যেতে পারে।

গাঁটে uric acid crystal ছাড়াও pyrophosphate এবং hydroxyapatite-এর crystal জমতে পারে। তবে hydroxyapatite crystal বেশীর ভাগ কাঁধের গ্রন্থিতেই জমতে দেখা যায়, তবে উরুসন্ধি এবং হাঁটুতেও হতে পারে।

গেঁটে বাতের রোগীদের রক্তে ইউরিক এসিড বেশী মাত্রায় থাকে কেননা পিউরিন বিপাকে মনো সোডিয়াম ইউরেট বেশী তৈরী হয় এবং প্রস্রাবের সংগে এদের নির্গমনও বেশী হয় না। সুতরাং এইসব রোগীদের খাওয়ার দিকে বেশী নজর দিতে হয়। পিউরিন আছে এমন খাদ্য সর্বদাই পরিহার করা উচিত। লিভার এবং কিডনীতে পিউরিন বেশী থাকে।

অসুখের প্রথম দিকে সংগে সংগেই চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত। রোগীকে বিশ্রাম দিতে হবে। আঙুলটি যাতে নড়াচড়া না করে এবং কোন চাপ যাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। রক্তের ইউরিক এসিডের মাত্রা নির্ণয় করা দরকার। ব্যথার জন্য phenylbutazone ২০০ মিলিগ্রাম দিনে চার বার করে দেওয়া হয়। Naproxen এই অসুখে ভালো কাজ করে। প্রথম দিকে বেশী মাত্রায় ৭৫০ মিলিগ্রাম হিসাবে দেওয়া হয়, পরে মাত্রা কমিয়ে ২৫০ মিলিগ্রাম দিনে চার বার দেওয়া হয়।

দীর্ঘস্থায়ী গেঁটে বাতের চিকিৎসায় কয়েকটি বিশেষ ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়, যাতে শরীর থেকে ইউরিক এসিড প্রস্রাবের সংগে বেরিয়ে যেতে পারে এবং তার ফলে রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা কমে। এই সব ওষুধের মধ্যে sodium salicylate এবং probenecid বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোডিয়াম স্যালিসিলেট দৈনিক ৬০ থেকে ১৪০ গ্রেন দেওয়া হয়। অবশ্য এর সংগে সোডিয়াম কার্বোনেটও দিতে হয়। Probenecid ০.৫ থেকে ১ গ্রাম দৈনিক দু'বার করে দেওয়া হয়। এটি খুবই ভালো ওষুধ এবং নিরাপদে অনেক দিন রোগীকে দেওয়া যায়। মাঝে মাঝেই রক্ত পরীক্ষা করে দেখা উচিত, রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা স্বাভাবিক আছে কি না।

রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস (Rheumatoid arthritis) :

এটি বিভিন্ন হাড়ের গ্রন্থিতে প্রদাহজনিত অবস্থা (polyarthritis)। এই অসুখ পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের ৩ গুণ বেশী হয় এবং পৃথিবীর সর্বত্র এই অসুখ দেখা যায়। সাধারণতঃ ২০ থেকে ৪৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই হয়, তবে যে কোন বয়সে হতে পারে।

এই অসুখে শরীরের সকল তন্ত্রই আক্রান্ত হয়। এতে জ্বর হয়, শরীরের ওজন কমতে থাকে, ক্ষুধা কমে যায় এবং মানসিক অবসাদ হয়। এর পর হাড়ের

গ্রন্থিতে প্রদাহ আরম্ভ হয়। পরে আশেপাশের connective tissueও আক্রান্ত হয়। অনেক সময় চামড়ার নীচে ছোট ছোট গুটিকা বা nodule পাওয়া যায়।

রোগের প্রধান উপসর্গগুলি হলো প্রচণ্ড ব্যথা, মাংসপেশীতে টান ও শক্ত হয়ে যাওয়া, শরীরে ক্লান্তি এবং মানসিক অবসাদ। এই অসুখ যে কেন হয় তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উপসর্গ অনুযায়ীই এর চিকিৎসা করা হয়। এই অসুখের প্রকোপ একবার বাড়ে, একবার কমে। গর্ভবতী হলে বা ন্যাবা হলে অনেক সময় উপসর্গ অনেক কমে যায়। কিন্তু প্রসব হওয়ার পরে প্রকোপ অত্যন্ত বেড়ে যায়।

প্রথমে হাতের ছোট ছোট মাংসপেশীগুলি আক্রান্ত হয়—আঙুলগুলি ক্রমশঃ বেঁকে যায়। এরপর শরীরের অন্য জায়গায়, পায়ে, কব্জিতে, গোড়ালিতে, কনুইতে, কাঁধে, চোয়ালে, হাঁটুতে এবং ঊরুসন্ধিতে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি শিরদাঁড়াও আক্রান্ত হতে পারে। গ্রন্থিগুলি যখনই আক্রান্ত হয় তখন তার আশেপাশের মাংসপেশীগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অংগের নানারকমের বিকৃতি ঘটায়।

এই সব রোগীর খুবই যত্ন সহকারে রোগ নির্ণয় করা দরকার। এদের পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। আক্রান্ত গ্রন্থিসমূহ যাতে নড়াচড়া না করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যথার জন্য ব্যথা উপশমকারী ওষুধ দিতে হবে। প্রদাহনাশক ওষুধও দিতে হবে।

Phenylbutazone-এ সব ক্ষেত্রে ভালো বেদনানাশক ওষুধ। সাধারণতঃ ২০০ মিলিগ্রাম দৈনিক তিন বার করে দেওয়া হয়। তবে এই ওষুধের ফলে নানান উপসর্গ হতে পারে, যেমন—বমি, হাত পা ফোলা, রক্তক্ষরণ, চামড়ায় এলার্জি, রক্তে agranulocytosis ইত্যাদি।

দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার জন্য gold খুবই উপযোগী ওষুধ। রোগের প্রথম দিকে এই ওষুধে বহু উপসর্গই কমে যায়। কিন্তু এই ওষুধ কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া যায় না, যেমন লিভারের গণ্ডগোল থাকলে, বহুমূত্র অসুখে, অত্যধিক রক্তাম্লতা থাকলে, colitis অসুখে, গর্ভাবস্থা থাকলে এবং রক্তের জমাট বাঁধার কোন গণ্ডগোল থাকলে। Gold দিয়ে চিকিৎসা করলে কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যেমন চামড়ার অসুখ, ফোঁড়া, আন্ত্রিক রোগ, রক্তাল্পতা এবং কিডনির গন্ডগোল।

Penicillamine অথবা chloroquine দিয়েও অনেক সময় চিকিৎসা করা হয়। বেশীমাত্রায় স্টেরয়েডও দেওয়া যেতে পারে।

রোগের প্রদাহ অনেকটা কমে গেলে হাড়ের গ্রন্থিগুলি যাতে নড়াচড়া করতে পারে তার উৎসাহ দেওয়া হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত physiotherapy দেওয়া দরকার। অত্যধিক ব্যথা এবং মাংসপেশী শক্ত হওয়ার জন্য রোগী ভালোভাবে শরীরের অংগপ্রত্যংগ নাড়াচাড়া করতে পারে না। এদের অ্যাসপিরিন দিলে ব্যথা কমে এবং প্রদাহ নিবারণও হয়। তবে অনেক দিন ধরে এই ওষুধ খেতে হয় বলে অনেকে ঠিকমত সহ্য করতে পারে না। তখন প্যারাসিটামল দেওয়া যেতে পারে। Indomethacinও এই সব ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ দেয়।

এই সব রোগী প্রচন্ড ব্যথা, শারীরিক বিকৃতি এবং কোন রকম কাজ না করতে পারার জন্য মানসিক বৈকল্যেও ভোগে। সুতরাং যথেষ্ট সহানুভূতির সংগে এদের চিকিৎসা করা বাঞ্ছনীয়।

অস্টিওআথ্রাইটিস (Osteoarthritis) :

এই অসুখ হাড়ের গ্রন্থিতে ক্ষয় বা degeneration হওয়ার জন্য হয়। এটি সাধারণতঃ মধ্যবয়সে এবং বৃদ্ধ বয়সে হয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই এই রোগ হতে পারে। প্রধানতঃ বড় বড় গ্রন্থিতেই এই অসুখ হয়, তবে ছোট ছোট গ্রন্থিতেও হতে পারে।

এ অসুখ ধীরে ধীরেই আসে। এতে মাংসপেশী শক্ত হওয়া এবং ব্যথা দুইই হয়। সেই সব গ্রন্থির আশেপাশের মাংসপেশী খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। হাড়ের সন্ধিস্থলও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার ফলে সহজেই আঘাতপ্রাপ্ত হয়। যে সব সন্ধিস্থলে শরীরের ওজন বেশী পড়ে, সেই সব জায়গায় প্রভূত ব্যথা হয়। শরীরের, হাতের, পায়ের ইত্যাদির নড়াচড়া খুবই ব্যথাদায়ক হয়। মাংসপেশীতে টান ধরে—এতেও ব্যথা হয়।

উরুসন্ধিস্থল এই অসুখে আক্রান্ত হলে চলাফেরা খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। এতে sciatic ব্যথার মত ব্যথা হতে পারে। দাঁড়ালে ব্যথা বেড়ে যায়। দীর্ঘস্থায়ী এই অসুখে একটি পা খুব অল্প ছোট হয়ে যেতেও পারে।

এই অস্টিওআথ্রাইটিস অসুখের রোগ নির্ণয়ের জন্য x-ray করা একান্ত

দরকার। ব্যথা বেদনার জন্য অ্যাশপিরিন এবং কোডিন ব্যবহার করা হয়। Phenylbutazone এক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রদ—দৈনিক ২০০ থেকে ৪০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয় এবং এ ওষুধ অনেক দিন ধরে বেশ নিরাপদেই দেওয়া যেতে পারে। সন্ধিস্থলে ২৫ থেকে ৫০ মিলিগ্রাম হাইড্রোকর্টিশোন ইঞ্জেকশন করে দিলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

Physiotherapy এই অসুখে একান্ত দরকার। শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি দিলে রক্তপ্রবাহ উন্নত হয় এবং ব্যথা নিবারণও হয়। মাংসপেশীর টানও এতে অনেক কমে যায়। রোগী যাতে নিজে অংগপ্রত্যংগ ঠিক মত চালনা করে তা দেখতে হবে। পরিমিত ব্যায়াম করা একান্ত দরকার।

কিছু কিছু সন্ধিস্থল খুব বেশী আক্রান্ত হলে শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় synovectomy করলে উপকার হয়। উরুস্থলে arthroplasty করলে অথবা ঠিকমত prosthesis স্থাপন করলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়।

এনকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস (Ankylosing spondylitis) :

এই অসুখে শরীরের অনেক সন্ধিস্থলে প্রদাহ হয় এবং তার ফলে সন্ধিস্থলের নড়াচড়া সীমিত হয়ে পড়ে এবং শক্ত হয়ে যায়। প্রথমদিকে প্রদাহের ফলে articular cartilage নষ্ট হয়ে যায় এবং হাড়ের গাত্র পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়ে এবং পরে জুড়ে যায়।

সাধারণতঃ ১৬ থেকে ৪০ বৎসর বয়সের লোকদেরই হয়। মেয়েরাও আক্রান্ত হতে পারে। রোগের প্রথমদিকে অল্প অল্প ব্যথা হয় বিশেষতঃ কোমরের নীচের দিকে। আক্রান্ত জায়গায় মাংসপেশীসমূহ শক্ত হয়ে পড়ে, নড়াচড়া সীমিত হয় এবং ব্যথাও হয়। অনেক সময় সায়েটিক নার্ভের গতিপথে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। শিরদাঁড়ার উপরদিকে আক্রমণ ঘটলে বুকের চতুর্দিকে ব্যথা হয়। এখানকার মাংসপেশীসমূহের সংকোচনের ফলে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত হতে পারে। অনেক সময় হাতের বা পায়ের শক্তি কমে যায়। শিরদাঁড়ার সাধারণ বাঁকগুলি নষ্ট হয়ে যায়। রোগীর স্বাভাবিক ভংগিমার বিকৃতি ঘটে। রোগী সোজা এবং স্বাভাবিক ভংগিমায় দাঁড়াতে, বসতে বা চলতে পারে না। Costovertebral সন্ধিসমূহ জুড়ে গেলে শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য বেশী প্রসারণ ঘটতে পারে না এবং

এদের শ্বাসকষ্ট হয়। অনেক সময় উরু এবং স্কন্ধের সন্ধিগুলিও আক্রান্ত হয়।

অসুখের প্রথমদিকে সঠিক রোগ নির্ণয় এবং সুচারু চিকিৎসা হওয়া দরকার। শিরদাঁড়া এবং অন্যান্য হাড়ের সন্ধিস্থলের x-ray করলেই রোগ নির্ণয় সহজ হয়। অনেক সময় লিগামেন্টে ক্যালসিয়াম জমতে থাকে এবং পরে প্রায় হাড়ে পরিণত হয়। শিরদাঁড়া সোজা বাঁশের মত (bamboo spine) দেখায়।

রোগের প্রথমদিকে রোগীর ভালো বিশ্রাম দরকার। নড়াচড়া যাতে কম হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। ব্যথার জন্য indomethacin এবং phenylbutazone দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এতে মাংসপেশীর সংকোচন বা টানও কমে। বেশী মাত্রায় স্টেরয়েডও দেওয়া হয়।

এদের কাজকর্মে উৎসাহ দেওয়া দরকার বিশেষতঃ দীর্ঘস্থায়ী অসুখের ক্ষেত্র। ঠিকমত physiotherapy করতে হবে। শিরদাঁড়া যাতে ঠিকমত নমণীয় থাকে, স্বাভাবিকভাবে বাঁকানো যায় তা দেখতে হবে। পরিমিত ব্যায়াম করতে হবে, সঠিক ভংগিমা (posture) মেনে চলতে হবে। দরকার হলে সুষ্ঠু শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ব্যায়াম (breathing exercise) করতে হবে। ব্যথার জন্য সর্টওয়েভ ডায়াথার্মি খুব উপকারে লাগে। এই অসুখের চিকিৎসায় রেডিও থেরাপি একটি উপযোগী পদ্ধতি। Sacroiliac সন্ধিস্থলে এবং শিরদাঁড়ায় রেডিও থেরাপি দিলে অনেক সময় প্রচন্ড ব্যথাও কমে যায়।

সবরকমের চিকিৎসা করেও অনেক সময় এই অসুখকে ঠেকানো যায় না। সুতরাং এই সব রোগী যাতে মোটামুটি কাজের উপযোগী থাকে, ব্যথা বেদনা থেকে রেহাই পায়, তার দিকে যথেষ্ট সহানুভূতির সংগে বিচার বিবেচনা করা উচিত।

পিঠে ব্যথা (Back pain) :

পিঠের বা কোমরের ব্যথায় অনেক লোকেই ভোগেন। এই ব্যথা অনেক সময় পায়েও ছড়িয়ে পড়ে। এটি অনেক কারণেই হতে পারে।

১। সুষুম্নাকাণ্ডের নীচের দিকে কোন টিউমার

২। শিরদাঁড়ার কোন টিউমার

৩। শিরদাঁড়ার ক্ষয় রোগ

৪। Sacrum বা ileum-এ টিউমার

৫। অস্টিও আথ্রাইটিস
৬। উরুর সন্ধিস্থলে আথ্রাইটিস
৭। Pelvis এর মধ্যে কোন টিউমার
৮। এনকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস
৯। Intervertebral discএর prolapse বা বিচ্যুতি
১০। রক্তনালীর মধ্যে রক্তপ্রবাহের কোন বাধা
১১। স্পনডাইলোলিসথেসিস
১২। কোমরে কোন আঘাত

সাধারণভাবে শিরদাঁড়ার নড়াচড়ায় এবং এর ভংগিমায় কোমরে বা পিঠে ব্যথা হয়। এই ব্যথা শিরদাঁড়াকে বিশ্রাম দিলেই অনেক কমে যায়, আবার হাঁচি, কাশি ইত্যাদিতে বেশ বেড়ে যায়। সাধারণ ব্যথা কাজকর্মে বেড়ে যায় কিন্তু এনকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস বা ঐ জাতীয় অসুখে কাজকর্মে ব্যথা কমে যায় এবং বিশ্রাম দিলে ব্যথা বেড়ে যায়।

সুতরাং পিঠে ব্যথা ঠিক কি কারণে হচ্ছে তা নির্ণয় হওয়া দরকার। রোগের আনুপূর্বিক ইতিহাস ভালোভাবে জানতে হবে। রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। রোগীর শিরদাঁড়া, দাঁড়ানোর ভংগিমা এবং চলাফেরার ধরন ঠিকমত দেখতে হবে। রোগীর কোমর কোন দিকে বেঁকে আছে কিনা, শিরদাঁড়ার স্বাভাবিক বাঁক ঠিক আছে কিনা, ঠিক কোন জায়গায় ব্যথা হয়, ব্যথা কি ধরনের, ব্যথা কিসে কমে বা বাড়ে, অন্য কোন দৃশ্যমান বিকৃতি আছে কি না—এ সবই বিশদ বুঝতে হবে। লাম্বার ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের বিচ্যুতি (prolapse) থাকলে, শিরদাঁড়া সামনের দিকে ঝুঁকলে খুব ব্যথা হয় কিন্তু পেছনের দিকে বাঁকালে বিশেষ ব্যথা বোঝা যায় না।

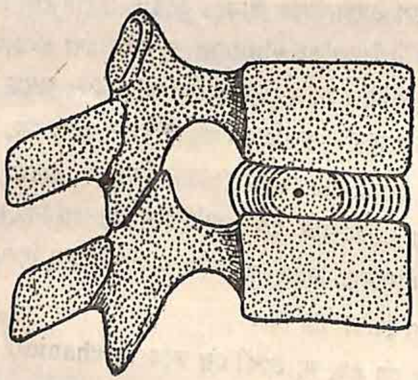
ব্যথা যদি হঠাৎ হয় এবং খু বেশী হয় তবে mechanical বিকৃতির ফলেই হয়েছে বুঝতে হবে, আর ব্যথা যদি অনেকদিন ধরে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তবে তা প্রদাহ বা টিউমারজনিত কারণেই হতে পারে।

ঠিকমত রোগ নির্ণয়ের জন্য pelvis, শিরদাঁড়া, উরুর সন্ধিস্থল ইত্যাদির x-ray করা দরকার। দরকার হলে lumbar puncture এবং myelography করতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শে রক্তপরীক্ষা করা দরকার। E. S. R. এবং রক্তে acid এবং alkaline phosphataseএর মাত্রা দেখাও দরকার। প্রস্রাব পরীক্ষাও করা উচিত।

এই কোমরে এবং পিঠের ব্যথার চিকিৎসা খুবই ধৈর্য সহকারে করা দরকার। ঠিক মত বিশ্রাম দিতে হবে—শিরদাঁড়া যাতে নড়াচড়া না করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অনেকসময় প্লাষ্টার জ্যাকেট করে দিলে সুবিধে হয়। এদের মাঝে মধ্যে পায়ে বা কোমরে টান বা traction দিতে হতে পারে। পরে সার্জিকাল কর্শেট (corset) ব্যবহার করতে দিতে হয়, এতে আক্রান্ত জায়গা বেশ supported অবস্থায় থাকে। চিকিৎসকের পরামর্শমত physiotherapy এবং সীমিত ব্যায়াম করতে হবে। ব্যথা উপশমের জন্য শর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি দিতে হবে, ব্যথানাশক ওষুধ এবং প্রদাহনিবারক ওষুধও খেতে হবে। অসুখের কারণ অনুযায়ী অনেক সময় শল্যচিকিৎসারও প্রয়োজন হয়।

ইণ্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের স্থানচ্যুতি (Prolapsed intervertebral disc) :

একটি ইণ্টারভার্টিব্রাল ডিস্কে তিনটি জিনিষ থাকে—একটি কার্টিলেজের প্লেট, nucleus pulposus এবং annulus fibrosus. ডিস্কের ঠিক মাঝখানে



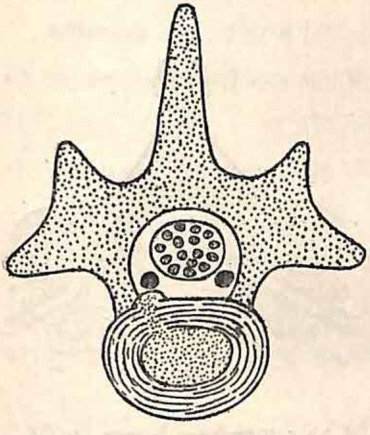
চিত্র ১৫ : স্বাভাবিক ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক

nucleus pulposus থাকে এবং এটি খুব নরম fibrocartilage। এটি সংকোচনশীল নয়, তবে এর বিকৃতি ঘটতে পারে। এই nucleus pulposus-এর চারদিকে থাকে annulus fibrosus (চিত্র ১৫)। এই annulus fibrosus খুবই শক্ত এবং এটি শিরদাঁড়ার প্রচুর চাপ সহ্য করতে পারে।

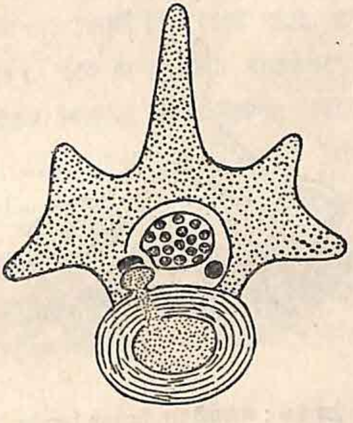
ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্কের নিজস্ব কোন রক্তনালী নেই, সাধারণতঃ কার্টি-

লেজের প্লেট থেকে রক্তসরবরাহ হয়। সেই রক্তসরবাহ যদি কমে যায় তাহলে ডিস্ক খুবই সরু হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ বয়সেও এই ডিস্ক সরু হয়ে যায়। এতে nucleus pulposus-এর স্বাভাবিক কার্যকারিতা কমে যায়। তখন শিরদাঁড়ার উপর চাপ এই ডিস্ক সহ্য করতে পারে না এবং এর ফলে আস্তে আস্তে ডিস্কের ক্ষয় (degeneration) হতে থাকে।

ক্ষয়প্রাপ্ত ডিস্ক চতুর্দিকে ফুলে ওঠে এবং চারপাশে বেরিয়ে পড়ে। সামনের এবং পাশের দিক দিয়ে বের হলে খুব একটা কিছু ক্ষতি হয় না। তবে পেছনের দিকে ফুলে উঠলে বা বের হলে এটি intervertebral foramen-এ চলে আসে এবং সুষুম্মাকাণ্ডে বা তার স্নায়ুতন্ত্রে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এটিকে নরম



চিত্র ১৬ : ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের বিচ্যুতি
(নার্ভের উপর এখনও চাপ পড়ে নি)



চিত্র ১৭ : ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের বিচ্যুতি
(নার্ভের উপর চাপ সৃষ্টি)

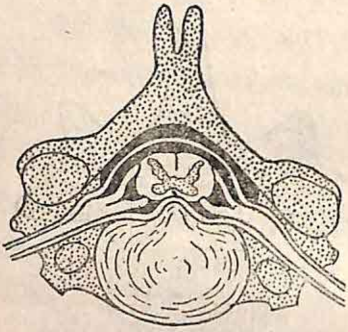
বা soft ডিস্ক বলা হয়। এই ডিস্কের স্থানচ্যুতির সময় জেলীর মত nucleus pulposus কমজোরী অথবা ছিদ্রযুক্ত annulus fibrosus দিয়ে বেরিয়ে আসে। এটি ঠিক মধ্যভাগ দিয়ে আসলে সুষুম্নাকাণ্ডে চাপ পড়ে। যদি তারও পাশ দিয়ে আসে, তবে সুষুম্নাকান্ড বা স্নায়ুতে অথবা দুয়েতেই চাপ পড়ে। আর একেবারে পাশ দিয়ে বের হলে শুধুমাত্র স্নায়ুতেই চাপ পড়ে। তবে সাধারণভাবে পেছনের দিকের পাশ থেকেই ডিস্কের স্থান বিচ্যুতি দেখা যায় (চিত্র ১৬ এবং ১৭)। ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের স্থানচ্যুতি শিরদাঁড়ার তিন জায়গাতে হতে

পারে—সারভাইকাল (cervical), থোরাসিক (thoracic) এবং লাম্বার (lumbar) ডিস্কের স্থানচ্যুতি।

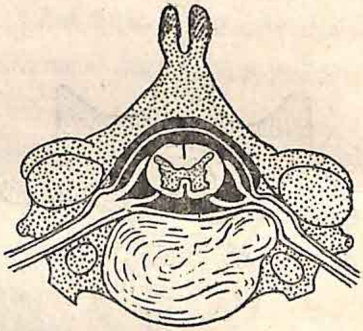
সারভাইকাল ডিস্কের স্থানচ্যুতি :

সারভাইকাল ডিস্কের স্থানচ্যুতি লাম্বার ডিস্কের স্থানচ্যুতির চেয়ে অনেক কম হয়। সারভাইকাল ডিস্কের স্থানচ্যুতিতে ঘাড়ে ব্যথা হয় এবং ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। এই ব্যথা হাতে পর্যন্ত যেতে পারে। এতে সুষুম্নাকাণ্ডেও চাপ পড়তে পারে।

সাধারণতঃ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ সারভাইকাল মধ্যবর্তী অথবা ষষ্ঠ এবং সপ্তম সারভাইকাল মধ্যবর্তী ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক আক্রান্ত হয়। অবশ্য অন্য



চিত্র ১৮ : সারভাইকাল ডিস্কের বিচ্যুতি (সুষুম্নাকাণ্ডে চাপ সৃষ্টি)



চিত্র ১৯ : সারভাইকাল ডিস্কের বিচ্যুতি (স্পাইনাল নার্ভে চাপ সৃষ্টি)

সারভাইকাল ডিস্কেও এটি হতে পারে, কিন্তু খুবই কম হয়। এখানেও বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রে nucleus pulposus annulus fibrosus-এর পেছনের দিকের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসে আবার ঠিক মাঝখান দিয়েও আসতে পারে। তবে পাশ দিয়ে বের হলে শুধু নার্ভের উপর চাপ পড়ে, কিন্তু মাঝখান দিয়ে বের হলে একেবারে সুষুম্নাকাণ্ডেই চাপ পড়ে (চিত্র-১৮ এবং ১৯)।

রোগীর ঘাড়ে অল্প আঘাত লাগার ফলে এটি আরম্ভ হতে পারে। প্রথমদিকে রোগী বুঝতেই পারে না—কোন ব্যথাও হয় না। কয়েক ঘন্টা বা দু'একদিন পরে ঘাড় শক্ত হয়ে যায় এবং প্রচন্ড ব্যথা হতে থাকে। এই ব্যথা কাশলে বেড়ে

যায় এবং পরে হাতেও এই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। ঘাড়ের নড়াচড়া খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। মাংসপেশীসমূহ ক্ষীণ (wasting) হতে দেখা যায় এবং অনুভূতির গণ্ডগোল দেখা দেয়। অবশ্য মাঝখানে স্থানচ্যুতি ঘটলে সুষুম্নাকাণ্ডের চাপের জন্যই উপসর্গ দেখা দেয়। x-ray করে সঠিক রোগ নির্ণয় করা হয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সারভাইকাল মধ্যবর্তী ডিস্ক আক্রান্ত হলে ঘাড়ে, কাঁধে এবং হাতের পাশে ব্যথা হয়। বুড়ো এবং তর্জণী আঙুলের অনুভূতি কমে যেতে পারে। Biceps মাংসপেশী দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

ষষ্ঠ এবং সপ্তম সারভাইকাল মধ্যবর্তী ডিস্ক আক্রান্ত হলেও ব্যথা ঘাড়ে এবং কাঁধে ব্যথা হয়। তবে তর্জণী এবং মধ্য আঙুলের অনুভূতি কমে যায়। Triceps মাংসপেশী দুর্বল হয়ে পড়ে।

অনেকসময় অল্প আক্রান্ত হলে এটি আপনা থেকেই সেরে যেতে পারে, তবে ছয় মাস কি তারও বেশী সময় লাগতে পারে। তবে ব্যথার জন্য ব্যথাউপশমকারী ওষুধ দিতে হবে। রোগীর সারভাইকাল শিরদাঁড়া যাতে নড়াচড়া করতে না পারে, বিশ্রাম পায় তার জন্য কলার (collar) দেওয়া হয়। দরকার হলে traction দিতে হবে। এর পর চিকিৎসকের পরামর্শমত physiotherapy দেওয়া উচিত। সর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি বা radiant heat এসব ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী—এতে ব্যথা কমে যায়, মাংসপেশীর টান কমে যায় এবং রক্তপ্রবাহ ভালো হয়। অসুখের গুরুত্ব অনুযায়ী অনেক সময় শল্যচিকিৎসা করা দরকার হয়ে পড়ে।

থোরাসিক ডিস্কের স্থানচ্যুতি :

থোরাসিক ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের স্থানচ্যুতি খুবই কম ঘটে। স্বাভাবিক কারণে থোরাসিক শিরদাঁড়ায় নড়াচড়া খুবই সীমিত এবং এতে চাপও খুব কমই পড়ে। তবে এখানকার ডিস্কের স্থানচ্যুতি ঘটলে সুষুম্নাকাণ্ডে চাপ পড়তে পারে। এখানকার নার্ভেও চাপ পড়ে ক্ষতি হতে পারে। এতেও অত্যধিক ব্যথা হয়, অনুভূতির গণ্ডগোল হয়।

X-ray করে ঠিকমত রোগ নির্ণয় করা দরকার। শিরদাঁড়ার বিশ্রাম, ব্যথানাশক ওষুধ, physiotherapy ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। অনেক সময় শল্যচিকিৎসারও দরকার হয়।

লাম্বার ডিস্কের স্থানচ্যুতি :

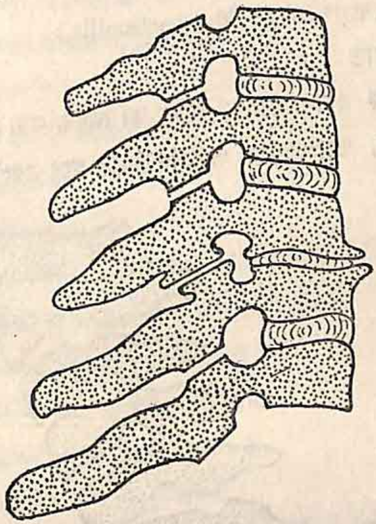
সাধারণতঃ পঞ্চম লাম্বার এবং প্রথম সেকরাল মধ্যবর্তী অথবা চতুর্থ লাম্বার এবং পঞ্চম লাম্বার মধ্যবর্তী ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের স্থানচ্যুতি হতে দেখা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পেছনের দিকের পাশ থেকেই nucleus pulposus কমজোরী annulus fibrosus দিয়ে বেরিয়ে আসে। এখানেও নার্ভের উপর চাপ পড়ে এবং সে কারণে ব্যথা এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। সাধারণতঃ যে জায়গার ডিস্ক আক্রান্ত হয় তার নীচের স্পাইনাল নার্ভেই চাপ পড়ে। যদি চতুর্থ এবং পঞ্চম লাম্বার মধ্যবর্তী ডিস্ক আক্রান্ত হয়, তবে পঞ্চম লাম্বার নার্ভে চাপ পড়ে। আবার পঞ্চম লাম্বার এবং প্রথম সেকরাল মধ্যবর্তী ডিস্ক আক্রান্ত হলে প্রথম সেকরাল নার্ভের উপর চাপ সৃষ্টি হয়।

এই অসুখ ১৮ বছর বয়সের বেশী যে কোন স্ত্রী বা পুরুষের হতে পারে। অল্প আঘাতের ইতিহাস থাকে। বেশীর ভাগ রোগী শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে ভারী ওজন তোলার কথা বলে। সে সময় হয়তো কোন ব্যথাই হয় না, তবে পরে ব্যথা হতে থাকে। কাশি, হাঁচি বা শিরদাঁড়া নড়াচড়ার সংগে এই ব্যথা খুবই বাড়তে থাকে। পরের দিকে এই ব্যথা কোমরে, পাছায়, ঊরুদেশে এবং পায়েও ছড়িয়ে পড়ে। পায়ে ঝিনঝিন হতে পারে, অনুভূতি কমে যেতে পারে। শিরদাঁড়া অস্বাভাবিক ভাবে বেঁকে যেতে পারে, একে lumbar scoliosis বলে। রোগী সামনের বা পেছনের দিকে ভালোভাবে বাঁকাতে পারে না। রোগীর আক্রান্ত মাংসপেশী দুর্বল এবং ক্ষীণ (wasting) হতে পারে। X-ray করলে ঠিক কোন জায়গায় ডিস্কের স্থানচ্যুতি ঘটেছে তা বোঝা যায়।

উপসর্গগুলি কমানোর জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। লাম্বার শিরদাঁড়া যাতে বিশ্রাম পায়, কোন নড়াচড়া না করে তার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। দরকার হলে প্লাষ্টার জ্যাকেটে রাখতে হবে। পরের দিকে অবশ্য সার্জিকাল কর্শেট খুবই উপযোগী হয়। খুব ব্যথা থাকলে ব্যথানাশক ওষুধ দিতে হবে। শক্ত বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, পরিপূর্ণ বিশ্রাম একান্ত দরকার। Physio-therapy, শর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি এবং পরিমিত ব্যায়াম ডাক্তারের পরামর্শমত করতে হবে। কোন ভারী জিনিষ তোলা একেবারে নিষিদ্ধ—অন্ততঃ তিন মাস পর্যন্ত। এইসব চিকিৎসায় রোগী মোটামুটি আরোগ্য লাভ করে।

তবে খুব বেশী sciatic নার্ভের ব্যথা হলে এবং ওষুধে কোন কাজ না হলে

অথবা অন্য স্নায়ুঘটিত উপসর্গ থাকলে শল্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসাও করতে হবে। মাংসপেশীসমূহের অত্যধিক টানে বা spasm-এ রোগীর প্রচন্ড ব্যথা হয় এবং সেক্ষেত্রে মাংসপেশীর মধ্যে অথবা epidural ইঞ্জেকশন দিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ৭



চিত্র ২০ : সারভাইকাল শিরদাঁড়ায় অষ্টিওআথ্রাইটিস
(Osteoarthritis of the cervical spine)

মিলিলিটার ১% লিগনোকেনের সংগে ১২০ মিলিগ্রাম methyl prednisolone acetate এপিডুরাল ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। Sacral hiatus-এ এই ইঞ্জেকশন দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৫০ মিলিলিটার ০.৫% লিগনোকেন ব্যবহার করা হয়।

ঘাড়ে ব্যথা (Neck pain) :

ঘাড়ে ব্যথা নানা কারণেই হতে পারে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঃ

১। সারভাইকাল শিরদাঁড়ায় অষ্টিওআথ্রাইটিস (চিত্র ২০)
২। সারভাইকাল এনকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস

লাম্বার ডিস্কের স্থানচ্যুতি :

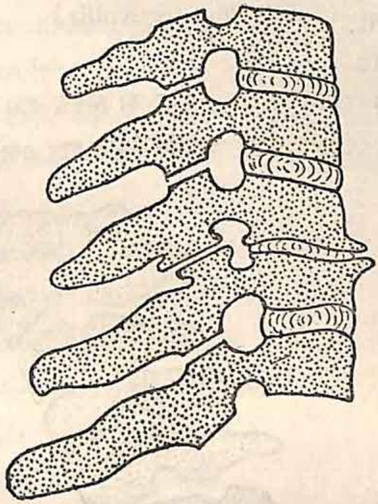
সাধারণতঃ পঞ্চম লাম্বার এবং প্রথম সেকরাল মধ্যবর্তী অথবা চতুর্থ লাম্বার এবং পঞ্চম লাম্বার মধ্যবর্তী ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের স্থানচ্যুতি হতে দেখা যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পেছনের দিকের পাশ থেকেই nucleus pulposus কমজোরী annulus fibrosus দিয়ে বেরিয়ে আসে। এখানেও নার্ভের উপর চাপ পড়ে এবং সে কারণে ব্যথা এবং অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। সাধারণতঃ যে জায়গার ডিস্ক আক্রান্ত হয় তার নীচের স্পাইনাল নার্ভেই চাপ পড়ে। যদি চতুর্থ এবং পঞ্চম লাম্বার মধ্যবর্তী ডিস্ক আক্রান্ত হয়, তবে পঞ্চম লাম্বার নার্ভে চাপ পড়ে। আবার পঞ্চম লাম্বার এবং প্রথম সেকরাল মধ্যবর্তী ডিস্ক আক্রান্ত হলে প্রথম সেকরাল নার্ভের উপর চাপ সৃষ্টি হয়।

এই অসুখ ১৮ বছর বয়সের বেশী যে কোন স্ত্রী বা পুরুষের হতে পারে। অল্প আঘাতের ইতিহাস থাকে। বেশীর ভাগ রোগী শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে ভারী ওজন তোলার কথা বলে। সে সময় হয়তো কোন ব্যথাই হয় না, তবে পরে ব্যথা হতে থাকে। কাশি, হাঁচি বা শিরদাঁড়া নড়াচড়ার সংগে এই ব্যথা খুবই বাড়তে থাকে। পরের দিকে এই ব্যথা কোমরে, পাছায়, উরুদেশে এবং পায়েও ছড়িয়ে পড়ে। পায়ে ঝিনঝিন হতে পারে, অনুভূতি কমে যেতে পারে। শিরদাঁড়া অস্বাভাবিক ভাবে বেঁকে যেতে পারে, একে lumbar scoliosis বলে। রোগী সামনের বা পেছনের দিকে ভালোভাবে বাঁকাতে পারে না। রোগীর আক্রান্ত মাংসপেশী দুর্বল এবং ক্ষীণ (wasting) হতে পারে। X-ray করলে ঠিক কোন জায়গায় ডিস্কের স্থানচ্যুতি ঘটেছে তা বোঝা যায়।

উপসর্গগুলি কমানোর জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। লাম্বার শিরদাঁড়া যাতে বিশ্রাম পায়, কোন নড়াচড়া না করে তার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। দরকার হলে প্লাষ্টার জ্যাকেটে রাখতে হবে। পরের দিকে অবশ্য সার্জিকাল কর্শেট খুবই উপযোগী হয়। খুব ব্যথা থাকলে ব্যথানাশক ওষুধ দিতে হবে। শক্ত বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, পরিপূর্ণ বিশ্রাম একান্ত দরকার। Physio-therapy, শর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি এবং পরিমিত ব্যায়াম ডাক্তারের পরামর্শমত করতে হবে। কোন ভারী জিনিষ তোলা একেবারে নিষিদ্ধ—অন্ততঃ তিন মাস পর্যন্ত। এইসব চিকিৎসায় রোগী মোটামুটি আরোগ্য লাভ করে।

তবে খুব বেশী sciatic নার্ভের ব্যথা হলে এবং ওষুধে কোন কাজ না হলে

অথবা অন্য স্নায়ুঘটিত উপসর্গ থাকলে শল্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসাও করতে হবে। মাংসপেশীসমূহের অত্যধিক টানে বা spasm-এ রোগীর প্রচন্ড ব্যথা হয় এবং সেক্ষেত্রে মাংসপেশীর মধ্যে অথবা epidural ইঞ্জেকশন দিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ৭



চিত্র ২০ : সারভাইকাল শিরদাঁড়ায় অষ্টিওআর্থাইটিস
(Osteoarthritis of the cervical spine)

মিলিলিটার ১% লিগনোকেনের সংগে ১২০ মিলিগ্রাম methyl prednisolone acetate এপিডুরাল ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। Sacral hiatus-এ এই ইঞ্জেকশন দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৫০ মিলিলিটার ০'৫% লিগনোকেন ব্যবহার করা হয়।

ঘাড়ে ব্যথা (Neck pain) :

ঘাড়ে ব্যথা নানা কারণেই হতে পারে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঃ

১। সারভাইকাল শিরদাঁড়ায় অষ্টিওআথ্রাইটিস (চিত্র ২০)

২। সারভাইকাল এনকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস

৩। সারভাইকাল স্পন্ডাইলোলিসথিসিস (চিত্র ২১)

৪। সারভাইকাল ডিস্ক

৫। শিরদাঁড়ার ক্ষয়রোগ অথবা অন্য প্রদাহ

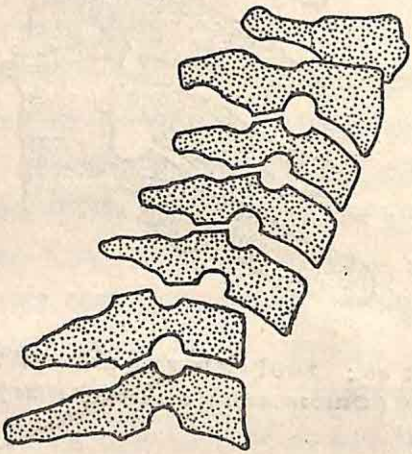
৬। শিরদাঁড়ার টিউমার

৭। ফাইব্রোসাইটিস (সারভাইকাল)

৮। ঘাড়ের মাংসপেশীসমূহে টান (torticollis)

৯। ঘাড়ে আঘাত

ঘাড়ে ব্যথা ঠিক কোন কারণে হচ্ছে তা নির্ণয় করা দরকার। ঠিক মত ইতিহাস জানতে হবে, ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং দরকার হলে x-ray



চিত্র ২১ : Cervical spondylolisthesis
(পঞ্চম এবং ষষ্ঠ সারভাইকাল ভার্টিব্রার সন্ধিস্থলে)

করতে হবে। ঘাড়ের ব্যথা অনেক সময় হাত পর্যন্ত বিস্তার হতে পারে। ঘাড়ের নড়াচড়া খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। ঘাড় শক্ত হয়ে যায়। ঘাড়ে ব্যথার সংগে মাথা ব্যথা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ঘাড়ের মাংসপেশীতে টান হয়। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথায় মাংসপেশী সমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে।

রোগের কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা করা দরকার। তবে ব্যথাউপশমের জন্য সর্ট ওয়েভ ডায়াথার্মি, ব্যথানিবারক ওষুধ, এমনকি সার্জিকাল কলার ব্যবহার করা হয়।

হাতের ব্যথা :

হাতের ব্যথা বিশেষতঃ দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা নানা কারণে হতে পারে। এদের মধ্যে কয়েকটি কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পরে।

১। সুষুম্নাকান্ডে কোন টিউমার

২। সারভাইকাল স্পন্ডিলাইটিস

৩। সারভাইকাল অষ্টিওআথ্রাইটিস

৪। সারভাইকাল ডিস্ক

৫। শিরদাঁড়ায় কোন টিউমার

৬। নার্ভ রুটের কোন টিউমার

৭। সারভাইকাল পাঁজর (cervical rib)

৮। স্কন্ধের বিশেষতঃ সন্ধিস্থলের কোন অসুখ

৯। হাতের হাড়ের কোন টিউমার, প্রদাহ ইত্যাদি

১০। টেনিস elbow, কনুই-এ arthritis

১১। নার্ভের কোন অসুখ—neuritis ইত্যাদি

১২। ফাইব্রোসাইটিস, মায়োসাইটিস ইত্যাদি

১৩। কোন আঘাত, হাড় ভাঙা ইত্যাদি

১৪। নখে প্রদাহ, আঙুলহাড়া, thenar space, midpalmar space এবং tendon sheath-এর প্রদাহ।

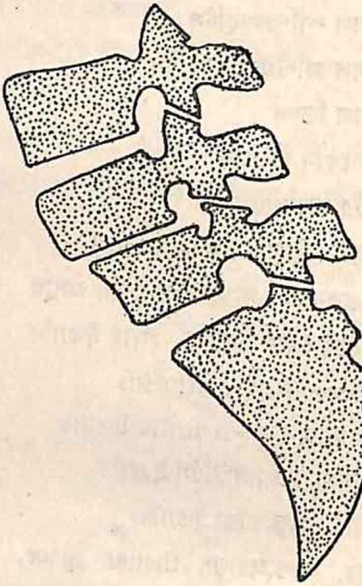
১৫। Median নার্ভের উপর চাপ (carpal tunnel syndrome)

এই সব অসুখের চিকিৎসা তার কারণ অনুযায়ীই করতে হবে। তবে ব্যথা বেদনার জন্য ব্যথাউপশমকারী ওষুধ অবশ্যই দেওয়া হয়। Brachial plexus অনেক সময় লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দিয়ে ব্লক করা হয়। এতে সাময়িকভাবে ব্যথা উপশম হয়। ক্যানসারজনিত ব্যথা বেদনার ক্ষেত্রে অ্যালকোহল বা ফেনল দিয়ে নার্ভ নষ্ট করে ফেলাও একটি প্রচলিত পদ্ধতি।

স্পন্ডাইলোলিসথীসিস (Spondylolisthesis) :

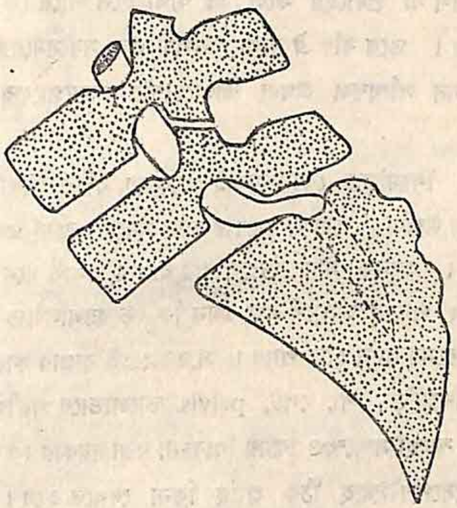
এই অসুখে একটি ভার্টিব্রার body তার নীচের ভার্টিব্রার body থেকে সামনের দিকে সরে যায়। পঞ্চম, চতুর্থ এবং এমনকি তৃতীয় লাম্বার ভার্টিব্রার

ক্ষেত্রে এই ধরনের বিচ্যুতি ঘটে (চিত্র-২২ এবং ২৩)। সারভাইকাল ভার্টিব্রার ক্ষেত্রেও স্পন্ডাইলোলিসথিসিস ঘটতে পারে। ভার্টিব্রার এই স্থানচ্যুতির ফলে শিরদাঁড়ার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। আক্রান্ত ভার্টিব্রার ossification-এর ত্রুটির ফলেই এই স্পন্ডাইলোলিসথিসিসের ঘটনা ঘটে।



চিত্র ২২ : Spondylolisthesis চতুর্থ এবং পঞ্চম লাম্বার ভার্টিব্রার সন্ধিস্থলে

লাম্বার ভার্টিব্রার ক্ষেত্রে এই স্পন্ডাইলোলিসথিসিস ঘটলে রোগী কোমরে ব্যথা (backache) অনুভব করে। অনেক সময় সেই ব্যথা পায়ের দিকেও যায়। এই ধরনের ব্যথা বিশ্রাম নিলে কমে, আবার বেশী পরিশ্রমে বেড়ে যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর কোন উপসর্গ থাকে না, আকস্মিকভাবেই এই অসুখ ধরা পড়ে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীর ব্যথা হয়, এবং সেই ব্যথা dull aching ধরনের। রোগীর কোমর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শিরদাঁড়া শক্ত বা stiff হয়ে পড়ে। খুব বেশীভাবে আক্রান্ত হলে লাম্বার curve বেড়ে যায় এবং সেকরাম (sacrum) সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আক্রান্ত জায়গার শিরদাঁড়ার সামনের দিকে বাঁকাবার (flexion) ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়তে পারে।



চিত্র ২৩ : Spondylolisthesis at lumbosacral joint

সাধারণতঃ আক্রান্ত শিরদাঁড়ার x-ray করলে রোগ নির্ণয় সুনিশ্চিত হয়। ভার্টিব্রার স্থানচ্যুতির সংগে অনেক সময় lamina-তে ভাঙাও দেখা যায়।

যে সব স্পন্ডাইলোলিসথিসিসের ক্ষেত্রে উপসর্গ খুব বেশী থাকে না, সে সব ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসারই দরকার হয় না। তবে রোগীর ব্যথা বেদনা থাকলে শক্ত lumbosacral corset ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত। সে ক্ষেত্রে ভার্টিব্রার বেশী স্থানচ্যুতির আশংকা কম থাকে। তবে এই corset বেশী ব্যবহার করলে শির-দাঁড়ার মাংসপেশীসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। রোগীর back extension ব্যায়াম নিয়মিত করা দরকার। এতে মাংসপেশীসমূহ সবল থাকে এবং তার ফলে ভার্টিব্রার আরও বেশী স্থানচ্যুতির আশংকা কমে। স্পাইনাল নার্ভে চাপ সৃষ্টি হলে রোগীকে উপযুক্ত traction দিতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

সায়েটিকা (**Sciatica**) :

এই ব্যথা সাধারণতঃ কোমরে আরম্ভ হয় এবং পায়ে ছড়িয়ে পড়ে। Sciatic নার্ভের গতিপথেই এই ব্যথা নির্দেশিত হয়। লাম্বার অথবা সেকরাল নার্ভ

তন্তুতে কোন চাপ বা প্রদাহের ফলে এই ব্যথা হতে পারে। এই ব্যথা খুবই অসহ্য ধরনের হয়। তবে যদি ঐ ব্যথা অস্পষ্ট এবং সব সময়ের ব্যথা হয়, তবে বুঝতে হবে কোন সন্ধিস্থল অথবা লিগামেন্টের গন্ডগোলের জন্য নির্দেশিত ব্যথা হচ্ছে।

অনেক সময় শিরদাঁড়ায় কোন ব্যথাই থাকে না, যদিও সেখানকার জন্যই এই সায়েটিকা ব্যথার উদ্ভব। রোগী বেশীর ভাগ সময়ে পাছায় এবং পায়ের ব্যথার কথাই ব্যক্ত করে। অনেক সময় ঊরুসন্ধির ব্যথার কথাও মনে হয়। পেটের, pelvis-এর এবং পায়ের অসুখে এবং এমন কি বড় রক্তনালীতে বাধা সৃষ্টি হলে এই সায়েটিকা ধরনের ব্যথা হতে পারে। সুতরাং এই ব্যথার কারণ নির্ণয় করতে হলে রোগীর শিরদাঁড়া, পা, পেট, pelvis ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও বিচার বিবেচনা করা দরকার।

রোগীর মাংসপেশীসমূহ ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে। কোন জায়গায় দুর্বলতা আছে কিনা, ক্ষীণ অথবা স্ফীত হয়েছে কিনা দেখতে হবে। রোগীর অনুভূতিসমূহ—স্পর্শ, পিন ফোটানো, গরম, ঠান্ডা ইত্যাদি ঠিক আছে কিনা, কোন তারতম্য হয়েছে কিনা দেখতে হবে। Reflexগুলিও পরীক্ষা করতে হবে। রোগীর শিরদাঁড়ায় কোন বিকৃতি আছে কিনা, সামনে বা পেছনে বা পাশে বাঁকালে কোন ব্যথা হচ্ছে কি না, নড়াচড়া সীমিত কিনা তাও ভালোভাবে লক্ষ্য করতে হবে। শিরদাঁড়ার সংগে অন্য সন্ধিস্থলও ভালোভাবে পরীক্ষা করা দরকার। প্রয়োজনবোধে x-ray করা উচিত।

সায়েটিকা ব্যথার কারণ অনেক রকমের হতে পারে। সুষুম্নাকান্ডে, শিরদাঁড়ায় অথবা ilium অথবা sacrum-এ কোন টিউমার হলে, শিরদাঁড়ায় ক্ষয় রোগ হলে,ঊরুসন্ধিস্থলে আথ্রাইটিসে, শিরদাঁড়ার অস্টিও লাম্বার ডিস্ক স্থানচ্যুতিতে, এনকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিসে, স্থানীয় বড় রক্তনালীতে রক্তপ্রবাহে বাধা-সৃষ্টি হলে এই সায়েটিকা ব্যথা হতে পারে। Pelvis-এ কোন টিউমার বা mass হলেও এই ব্যথা হতে পারে।

সুতরাং কারণ অনুযায়ী এই ব্যথার চিকিৎসা করতে হবে। রোগীর লাম্বার শিরদাঁড়াকে পরিপূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে। Physiotherapy, শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি, ব্যথানাশক ওষুধ ইত্যাদি ব্যথাউপশমের জন্য দিতে হবে। ক্যানসার জনিত ব্যথায় অনেক সময় স্পাইনাল বা এপিডুরাল ব্লক দেওয়া হয়। প্রয়োজন-

বোধে ফেনল, অ্যালকোহল অথবা খুব ঠান্ডা স্যালাইন দিয়ে স্পাইনল ব্লক করেও যন্ত্রণা লাঘব করা হয়।

পায়ের অন্যান্য ব্যথা :

সায়েটিকা ব্যথা যে সব কারণে হয় তা ছাড়াও অন্যান্য কারণে পায়ে ব্যথা হতে পারে। তাদের কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। পায়ের যে কোন হাড়ে প্রদাহ, টিউমার, ক্যানসার
২। উরুসন্ধিস্থলে, হাঁটুতে বা গোড়ালিতে আথ্রাইটিস
৩। রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস
৪। গেঁটে বাত
৫। প্রান্তিক নার্ভের কোন অসুখ—neuritis ইত্যাদি
৬। ফাইব্রোসাইটিস
৭। কোন আঘাত, হাড়ভাঙা, চোট লাগা ইত্যাদি
৮। নখে প্রদাহ, আঙুলহাড়া, বার্শারি প্রদাহ
৯। Intermittent claudication

গোড়ালিতে ব্যথা (**Painful heel :**)

এটিও কয়েকটি কারণে হতে পারে। যেমন :

১। ক্যালকেনিয়াম হাড়ে প্রদাহ, টিউমার বা ক্যানসার
২। গোড়ালির সন্ধিস্থলে আথ্রাইটিস
৩। Calcaneal tendon-এ যদি চোট লাগে, ছিঁড়ে যায়
৪। Calcaneal tendon-এর আশেপাশে প্রদাহ
৫। Calcaneal bursa-র প্রদাহ
৬। Planter fascia-র প্রদাহ
৭। Calcaneal apophysis-এর প্রদাহ
৮। গোড়ালির পেছনদিকে যেখানে খুব বেশী চাপ পড়ে, সেখানকার প্রদাহ
৯। গোড়ালিতে আঘাত, চোট লাগা, হাড় ভাঙা ইত্যাদি

Intermittent claudication :

ধমনীতে সংকোচনের ফলে যখন পায়ের মাংসপেশীসমূহ রক্তপ্রবাহ কমে যায়

তখন মাংসপেশীতেও টান ধরে এবং ব্যথা হয়। সাধারণতঃ অনেকক্ষণ চলার পরে ব্যথা হয়, আবার বিশ্রাম নিলে ব্যথা কমে যায়।

এটি thrombo-angitis obliterans অসুখে বেশী দেখা যায়। তবে arteriosclerosis এবং arterial embolism-এও হতে পারে। এই অসুখে মাংসপেশীতে রক্তচলাচল কম থাকে। অনেকক্ষণ চলফেরার পর বিপাকীয় পদার্থ বের হয়ে যেতে পারে না এবং এরাই ব্যথার সৃষ্টি করে। প্রথমদিকে পায়ের ডিমের (calf) মাংসপেশীতে ব্যথা আরম্ভ হয় এবং পরে অবশ্য পায়ের অন্য মাংসপেশীতেও ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণতঃ femoral এবং popliteal ধমনীই বেশী আক্রান্ত হয়। শেষদিকে বিশ্রামেও ব্যথা হতে পারে।

এই অসুখ মধ্যবয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রেই বেশী হয়। এটি আস্তে আস্তেই আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এদের পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে পায়ের সব ধমনীতেই নাড়ী পাওয়া যায় না। Posterior tibial, dorsalis pedis এবং এমন কি popliteal ধমনীতেও নাড়ী পাওয়া না যেতে পারে। অনেক সময় আঙুলে বা পায়ে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হওয়ার জন্য পচন ধরতে পারে। Arteriogram করলে ঠিক বোঝা যায় কোন ধমনীর ঠিক কোন জায়গায় বাধাসৃষ্টি হয়েছে।

ব্যথার জন্য বিশ্রাম এবং ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। স্পাইনাল বা এপিডুরাল ব্লক করলে সাময়িক ব্যথা উপশম হতে পারে। Lumbar sympathetic ganglionectomy করলে রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায় এবং এই অসুখে যথেষ্ট উপকার হয়। চিকিৎসকের পরামর্শমত কিছু কিছু ক্ষেত্রে arterial reconstruction করা যেতে পারে।

কক্সিডায়নিয়া (Coccydynia):

এই অসুখে coccyx এবং তার আশেপাশের জায়গায় প্রচণ্ড ব্যথা হয়। রোগী ভালোভাবে বসতে পারে না—ব্যথা হয়। রোগী পায়খানা করার সময়ও ব্যথা হতে পারে। রোগী দাঁড়িয়ে থাকলে বা পাশ ফিরে শুয়ে থাকলে সাধারণতঃ ব্যথা হয় না। Sacrococcygeal সন্ধিস্থলে চাপ দিলে রোগী ব্যথা অনুভব করে।

সাধারণতঃ কোন আঘাত লাগার ফলেই এই কক্সিডায়নিয়া হতে দেখা যায়। Sacrococcygeal সন্ধিস্থলে অথবা coccyx বা sacrum হাড়ের বহিআবরণীতে

(periosteum) প্রদাহ থাকতে পারে। X-ray করে বিশেষ কিছু পরিবর্তন বোঝা যায় না। তবে রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করা উচিত—sacrum বা coccyxএ কোন টিউমার আছে কিনা তা দেখা উচিত।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন চিকিৎসার দরকার হয় না। নিজে থেকেই ভালো হয়—অবশ্য অনেকদিন বা অনেক মাস লাগতে পারে। তবে ব্যথার জন্য সর্টওয়েভ ডায়াথার্মি, manipulation অথবা লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ বা হাইড্রোকর্টিশোন ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে।

কজালজিয়া (Causalgia) :

এটি যে কোন নার্ভের আঘাতে বা চোটের ফলে হয়। এতে নার্ভ অসম্পূর্ণভাবে কেটে যায় এবং প্রথমদিকে কোন ব্যথা থাকে না। প্রায় মাসখানেক পরে হাতে বা আঙুলে ঝিন ঝিনে অথবা সূঁচ ফোটানো ব্যথা অনুভূত হয় এবং আস্তে আস্তে এই ব্যথা বিরামবিহীন টেনে টেনে ধরা (dragging) বা জ্বালা করা ব্যথায় পরিণত হয়। মাঝে মাঝে এই ব্যথা খুবই অসহ্য ধরনের হয় এবং কোন কিছুতেই কমতে চায় না। রোগী মানসিক চাপে ভোগে এবং এতে ব্যথা আরও বেড়ে যায়। অনেক সময় ঠান্ডা জলে হাত রাখলে ব্যথা খানিক কমে। এই অসুখের সঠিক কারণ জানা যায়নি।

দীর্ঘস্থায়ী এই অসুখে হাতের মাংসপেশীসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। রোগী কনুই বা কব্জিতে হাত বাঁকিয়ে রাখে, হাত উপরের দিকে তুলে রাখে ও আঙুলগুলি সোজা করে রাখে। গোটা হাতটিই ক্ষীণ হয়ে যেতে থাকে। আঘাতের চার পাঁচ মাসের মধ্যে ব্যথা চরমে ওঠে এবং তারপরে ব্যথা ধীরে ধীরে কমে যায়। কিন্তু এরই মধ্যে হাতটি প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। পায়েও এই অসুখ হতে পারে।

এই অসুখের চিকিৎসায় যথাসম্ভব শীঘ্রই শল্যচিকিৎসা করানো দরকার। ব্যথার জন্য ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। Sympathectomy করলে অনেক সময় ব্যথার উপশম হয়। পায়ে এই অসুখ হলে লাম্বার sympathetic block করলে উপকার হয়।

কার্পাল টানেল সিনড্রোম (Carpal tunnel syndrome) :

Median নার্ভ যখন কার্পাল টানেল দিয়ে যায়—সেখানে transverse

carpal ligament দিয়ে নার্ভে চাপ পড়লে এই ব্যথাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ মধ্য বয়সী স্ত্রী লোকদেরই এই অসুখ হয়। এতে মাঝের তিনটি আঙুলে numbness মনে হয় এবং অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। এই ব্যথা হাতেও ছড়িয়ে পড়ে। বেশী আক্রান্ত হলে হাতের মাংসপেশীগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, ক্ষীণ হয়ে যায়।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই এদের ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসা করা দরকার। তবে ব্যথার জন্য ব্যথাউপশমকারী ওষুধ দেওয়া যেতে পারে।

শল্যচিকিৎসা পরবর্তী scar-এ ব্যথা :

অনেক সময় শল্যচিকিৎসার পরে যে scar হয় সেখানে অসহ্য ব্যথা হতে দেখা যায়। সাধারণতঃ বুকের, পেটের এবং হার্নিয়া অপারেশনের ক্ষেত্রে এই ব্যথা হয়। এই ব্যথায় ব্যথাউপশমকারী ওষুধে বিশেষ কাজ হয় না। এই ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

চিকিৎসা হিসাবে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দিয়ে ইন্টারকস্টাল নার্ভ ব্লক অথবা paravertebral ব্লক করলে কিছু উপকার হতে পারে। এই scar-এ প্রত্যক্ষভাবে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দিলে সাময়িকভাবে অনেক সময় ব্যথাউপশম হয়। কোন কিছুতে উপকার না হলে ফেনল দিয়ে ইন্টারকস্টাল নার্ভ নষ্ট করে দেওয়া যায়। প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসা করতে হতে পারে।

Spasticity :

অনেক paraplegia রোগীর disseminated sclerosis-এর জন্য মাংস-পেশীতে প্রতিবর্তী ক্রিয়া হিসাবে অত্যধিক টান হয়। এতে রোগীর অসহ্য ব্যথা হয়—অনেক সময় রাত্রে ঘুমও হয় না। এসব ক্ষেত্রে মাংসপেশীতে টান কমানোর জন্য এবং ব্যথাউপশম করার জন্য বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এগুলি সাময়িকভাবে কার্যকরী থাকে।

এ ক্ষেত্রে অ্যালকোহল বা ফেনল দিয়ে সাবএরাকনয়েড স্পাইনাল ব্লক করলে যথেষ্ট উপকার হয়। এতে ব্যথা কমে যায় এবং মাংসপেশীর টানও কমে যায়। অন্যান্য spasticity-র ক্ষেত্রেও এই ব্লক সাফল্যের সংগে করা যায়।

হারপিস পরবর্তী নিউর‍্যালজিয়া (Post-herpetic neuralgia):

হারপিস জস্টার (herpes zoster) একটি ভাইরাস সংক্রমণ এবং এতে posterior nerve root এবং তার অনুরূপ ত্বক আক্রান্ত হয়। এই ভাইরাস চিকেন পক্স বা জলবসন্তের ভাইরাসের মতই। কোন রকমের আঘাত, কোন সংক্রমণ, টিউমার, ক্যানসার, কিছু ওষুধ বিশেষতঃ আর্সেনিক এই ভাইরাস আক্রমণ ত্বরান্বিত করে। সাধারণতঃ থোরাসিক স্পাইনাল নার্ভগুলিই বেশী আক্রান্ত হয়। ট্রাইজেমিনাল নার্ভের প্রথম (ophthalmic) নার্ভটিই বেশী আক্রান্ত হয়।

সংক্রমণ হবার তিন চার দিনের মধ্যেই চামড়ায় ফোস্কা হয়—লাল হয়ে ওঠে। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে রোগী ভালো হয়ে যায়। কখনও চামড়ায় scar থাকে, কখনও বা থাকে না। রোগের প্রথমদিকে খুবই ব্যথা হয়—ফোস্কা ভালো হওয়ার সংগে ব্যথাও সেরে যায়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষতঃ বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এই ব্যথা বহুদিন বহু বছর থাকতে পারে।

যদিও এই ভাইরাস সংক্রমণ posterior root ganglion এবং posterior horn-এই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে anterior horn-ও আক্রান্ত হতে পারে এবং তার ফলে মাংসপেশীর দুর্বলতা দেখা দেয়। আবার মস্তিষ্ক আক্রান্ত হলে encephalitis-ও হতে পারে। মস্তিষ্কস্থিত নার্ভগুলির মধ্যে পঞ্চম, সপ্তম এবং নবম নার্ভগুলি আক্রান্ত হতে পারে।

হারপিস জস্টারের প্রাথমিক প্রকোপ কমে যাবার পর অনেক সময় হারপিশ পরবর্তী neuralgia হতে পারে। এই অসুখ অত্যন্ত কষ্টদায়ক। এতে যে প্রচন্ড এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা হয়, সেটি অনেক সময় চিকিৎসায় সারানো যায় না। এই হারপিস পরবর্তী neuralgia সাধারণতঃ বৃদ্ধ বয়সেই দেখা যায়।

অনেক সময় বলা হয় যে হারপিস জস্টারের প্রকোপে স্নায়ুতন্ত্রের বড় তন্তুই বেশী নষ্ট হয়, আবার যখন স্নায়ুতন্ত্রে আরোগ্যলাভ হয় তখন ছোট তন্তুই তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে। এর ফলে এই অসুখে আনুপাতিক হারে বড় স্নায়ুতন্তুই বেশ নষ্ট হয় ছোট স্নায়ুতন্তুর চেয়ে। সুতরাং ব্যথা বেদনার নিয়ন্ত্রণে gate control মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে 'gate' খোলাই থাকে এবং তার ফলে এত প্রচন্ড ধরনের ব্যথা অনুভূত হয়।

অসুখ নির্ণয়ের সংগে সংগেই চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত। এই অসুখে

স্টেরয়েড খুবই দরকারী। খুব বেশী মাত্রায় শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। আবার চামড়ার আক্রান্ত জায়গায় লাগানো যেতে পারে। Iodoxuridine আক্রান্ত জায়গায় লাগালেও ব্যথাউপশম হয়। নার্ভ ব্লক বিশেষতঃ sympathetic ব্লক করলেও ব্যথা নিরাময় হয়। এছাড়াও ব্যথাউপশমকারী ওষুধও দেওয়া চলে।

দীর্ঘস্থায়ী হারপিস পরবর্তী নিউর‍্যালজিয়ার ব্যথাউপশম করা খুবই কষ্টকর। এসব ক্ষেত্রে আকুপাংচার পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে। শুধুমাত্র ব্যথাউপশমকারী ওষুধগুলি খুব একটা কাজ দেয় না। তবে নার্কোটিক ওষুধের সংগে ফেনোথিয়াজিন গ্রুপের ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। এই সব রোগী মানসিক বৈকল্যে ভোগে। এদের মানসিক চিকিৎসা করাও দরকার। এক ওষুধ অনেক দিন না দিয়ে কিছু দিন অন্তর ওষুধ এবং চিকিৎসা বদলালে ভালো ফল পাওয়া যায়।

সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক নার্ভ যদি অ্যালকোহল বা ফেনল দিয়ে নষ্ট করে দেওয়া যায় তবে কিছুটা ব্যথাউপশম হতে পারে। খুব ঠান্ডা স্যালাইন subarachnoid space-এ ইঞ্জেকশন দিলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যেতে পারে।

ভৌতিক অংগপ্রত্যংগের ব্যথা (Phantom limb pain) :

এটি একটি অদ্ভুত ধরনের ব্যথা। কোন কারণে রোগীর পা বা হাত কেটে বাদ দেওয়া হলেও, রোগী না থাকা পায়ে বা হাতে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করে। অনেক সময়ই এই ব্যথা রোগীর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠে। এই অবস্থায় রোগীর চিকিৎসা করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এই ব্যথা সঠিক কি কারণে হচ্ছে তা বোঝা যায় না।

রোগীর হাত বা পা কেটে বাদ দেওয়ার সময় অনেক নার্ভই কাটা পড়ে। সেই কাটা নার্ভগুলির প্রান্তে অনেক সময় neuroma হয় এবং তার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম নার্ভতন্তু থাকে। এখানেই এই ভৌতিক ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে। রোগীর হাত বা পা বাদ দেওয়ার আগে যে ব্যথা ছিল, সেটি তার মস্তিষ্কে বদ্ধমূল থাকে। রোগীর সেই অংগ বাদ দেওয়ার পরও যে কোন প্রান্তিক উদ্দীপনায় সেই আগেকার ব্যথা অনুভব করে।

প্রায় সব রোগীরই অংগপ্রত্যংগ বাদ দেওয়ার পর কিছু দিন অল্পস্বল্প ভৌতিক অনুভূতি থাকে। কিন্তু সেটি বিশেষ বেদনায়ক হয় না এবং কয়েক

দিনের মধ্যেই চলে যায়। কিছু কিছু রোগী এই অস্বাভাবিক ভৌতিক অংগ-প্রত্যংগের ব্যথায় ভোগে। অনেক রোগী সত্যিই মনে করে যে তার বাদ দেওয়া অংগটি ঠিকই আছে এবং সেখানেই ব্যথা হচ্ছে। অনেকে শুধু amputation stump-এই ব্যথার কথা বলে।

এই সব রোগীর চিকিৎসা খুবই কঠিন। সাধারণ ব্যথা বেদনার ওষুধে খুব একটা কাজ হয় না। এরা মানসিক বৈকল্যে ভোগে, সুতরাং মানসিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে এবং মানসিক চিকিৎসা করতে হবে। এদের অবসাদ, দুর্ভাবনা খুবই থাকে। তাই amitriptyline দিলে বিশেষ উপকার হয়।

অনেক সময় amputation stump-এ যে নিউরোমা হয় সেখানে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দেওয়া যায়। প্রয়োজনে ফেনল ইঞ্জেকশন দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথাউপশম করা যেতে পারে। অনেক সময় শল্যচিকিৎসায় নিউ-রোমা কেটে বাদ দিলে উপকার পাওয়া যেতে পারে।

হাতের ব্যথায় বার বার sympathetic block করে কিছু ব্যথাউপশম হতে পারে। ফিমোরাল নার্ভ, সায়েটিক নার্ভ, অন্য প্রান্তিক নার্ভ, লোকাল অ্যানে-স্থিসিয়ার ওষুধের সাহায্যে ব্লক করলে এবং caudal ইঞ্জেকশন দিয়েও ব্যথা উপশমের চেষ্টা করা হয়, তবে অনেক সময় আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। আকু-পাংচার এবং dorsal column stimulation করেও ব্যথাউপশম হতে পারে।

ক্যানসারের জন্য ব্যথা (Cancer pain) :

ক্যানসার আধুনিককালে এক বিরাট স্বাস্থ্য সমস্যা। এর প্রকোপ দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এই অসুখে রোগীর মৃত্যুহার অনেক বেশী। এমন অনেক সময় হয় যে রোগীর নিরাময় কোন রকম চিকিৎসায় প্রায় অসম্ভব, সে সময় রোগীকে অন্ততঃ যে কত দিন বেঁচে আছে, ততদিন ব্যথা থেকে কিছুটা মুক্তি দেওয়া একান্ত মানবিক কারণেই দরকার। এ সব ক্ষেত্রে যখন রোগী বুঝতে পারে যে নিরাময়ের বিশেষ আশা নেই, তখন থেকেই সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং রোগের যন্ত্রণাও অনেকগুণ বেড়ে যায়। এই সব রোগীকে যথেষ্ট সহানুভূতির সংগে চিকিৎসা করতে হবে।

সাধারণতঃ জরায়ুর মুখ (cervix), মূত্রস্থলী, প্রস্টেট গ্রন্থি, বৃহদান্ত্র, মলস্থলী, ফুসফুস, মাথায় বা ঘাড়ে ক্যানসার হলে রোগী প্রচন্ড এবং অসহ্য ব্যথায় ভোগে।

এদের ব্যথা নানা ধরনের হয়। রোগীর উপর এবং নির্দিষ্ট অসুখের উপর ব্যথার গতি প্রকৃতি নির্ভর করে।

জরায়ুর ক্যানসারে যে ব্যথা হয় সেটির মোটামুটি নয়টি কারণগত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

১। রোগী radiotherapy পাওয়ার জন্য অনেক সময় আশেপাশের চামড়াও আক্রান্ত হয় এবং সেখান থেকে ব্যথা হতে পারে।

২। যদি মূত্রনালী এবং মূত্রস্থলী ক্যানসারে আক্রান্ত হয় তবে রোগীর প্রস্রাব করতে যথেষ্ট ব্যথা হয়।

৩। যদি ureter ক্যানসারে আক্রান্ত হয় এবং এই নালীতে বাধা সৃষ্টি হয় তবে hydronephrosis হয় এবং কিডনির জায়গায় ব্যথা হয়।

৪। একদিকের iliac thrombosis হলে ব্যথা হবে।

৫। যদি মলস্থলী আক্রান্ত হয় তাতেও ব্যথা হয়।

৬। জরায়ুর আশেপাশে প্রদাহ, ক্ষত এবং পচন থেকে ব্যথা হয়।

৭। ক্যানসারের ফলে কোমরে ব্যথা এবং সায়েটিকার ব্যথা হতে পারে।

৮। যদি হাড়েও ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ে তবে ব্যথা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

৯। Lumbosacral plexus আক্রান্ত হলে প্রচণ্ড ধরনের ব্যথা হয়।

ফুসফুসের ক্যানসারে সাধারণতঃ চার ধরনের ব্যথা হতে পারে।

১। যদি বুকে বা thoracic wall-এ ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ে, তখন অনেক জায়গা জুড়ে ব্যথা হতে থাকে।

২। শল্যচিকিৎসার পর ব্যথা হতে পারে।

৩। যদি brachial plexus আক্রান্ত হয় তবে প্রচণ্ড ব্যথা হয়।

৪। যদি শিরদাঁড়ায় ক্যানসারের বিস্তৃতি ঘটে, তখন সুষুম্নাকাণ্ডে এবং নার্ভ root-এ চাপ পড়ে এবং প্রচণ্ড ব্যথা হয়।

স্তনে ক্যানসার হলেও অনেক সময় chest wall-এ অসুখের বিস্তৃতি ঘটে। আবার brachial plexus এবং শিরদাঁড়াও আক্রান্ত হতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে খুবই ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক।

মোটের উপর ক্যানসার জনিত ব্যথা কয়েকটি বিশেষ কারণেই হয়।

১। কোন নার্ভ যদি ক্যানসার দ্বারা পিষ্ট হয়।

২। কোন নার্ভ যদি ক্যানসার দ্বারা নিজেই আক্রান্ত হয়।

৩। কোন রক্তনালী যদি ক্যানসার দ্বারা আক্রান্ত হয়।

৪। যদি ক্যানসার দ্বারা পাকস্থলী বা অন্ত্রে বাধা সৃষ্টি হয়।

৫। যদি ক্যানসার দ্বারা মূত্রনালী, ureter-এ বাধা সৃষ্টি হয়।

৬। যদি রক্তনালী ক্যানসার দ্বারা বন্ধ হয়ে যায়।

৭। ক্যানসারে বা তার আশেপাশের জায়গায় অত্যধিক প্রদাহ, জীবানু সংক্রমণ বা পচন ঘটলে ব্যথা হয়।

৮। ক্যানসার যদি বড় mass সৃষ্টি করে তবে সেখানে অত্যধিক চাপ বা tension ব্যথা সৃষ্টি করে।

ক্যানসারজনিত ব্যথার চিকিৎসা করা খুবই দুরূহ। অনেক সময় বোঝাই যায় না ঠিক কি কারণে ব্যথা হচ্ছে। অনেক সময় শল্যচিকিৎসায় এ অসুখ সারে, আবার কখনও বা শল্যচিকিৎসা করাই যায় না। আবার অপারেশনের পরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসুখ বা ক্যানসার ফিরে আসতে পারে। ক্যানসারের আসল জায়গা থেকে শরীরের অন্য অংশে রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। ক্যানসারের রেডিওথেরাপি চিকিৎসায় অনেক সময় চামড়ায় প্রদাহ হয়—পরে fibrosis হয়—এতেই ব্যথা হয়।

ব্যথার আনুপূর্বিক ইতিহাস জানা দরকার। কিভাবে ব্যথা আরম্ভ হলো এবং কোথায় এবং কখন ব্যথা আরম্ভ হলো—তা জানতে হবে। এই ব্যথা অন্য কোন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে কিনা, ব্যথা বেড়ে যাচেছ কিনা এবং কিভাবে ব্যথা কমে—তাও সঠিক জানতে হবে।

রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে। মাংসপেশীর কোন শিথিলতা হয়েছে কিনা, মাংসপেশীতে টান হচ্ছে কিনা, কোন জায়গায় সব থেকে বেশী ব্যথা তা নির্ণয় করতে হবে। ল্যাবরেটরীতে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষাও করা দরকার। রক্তে alkaline phosphatase, acid phosphatase, ক্যালসিয়াম লেভেল, amylase, isoenzyme ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে x-ray করতে হবে।

ক্যানসারজনিত ব্যথার চিকিৎসা হিসাবে রেডিওথেরাপি, chemotherapy

অথবা শল্যচিকিৎসা করার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু অপারেশনের আগে এবং পরেও ব্যথাউপশমের ব্যবস্থা করতেই হয়। প্রথমে ব্যথা উপশমকারী ওষুধ যেমন অ্যাসপিরিন, প্যারাসিটামল অথবা কোডিন সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা হয়। বেশী ব্যথায় মরফিন, পেথিডিন অথবা পেন্টাযোসিন ব্যবহার করা ভালো। এই সব ওষুধ ব্যবহার করার সময় সঠিক মাত্রা, কতক্ষণ অন্তর দিতে হবে—সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। দরকার মত ডায়াজিপাম, প্রোক্লোরপেরাজিন, প্রোমাজিন, ক্লোরপ্রোমাজিন ইত্যাদি ওষুধও ব্যবহার করা হয়।

দীর্ঘস্থায়ী অসহ্য ব্যথা দূরীকরণের জন্য জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ যেমন ট্রাইক্লোরোএথিলিন অথবা এন্টোনক্স (entonox) (৫০% অক্সিজেন + ৫০% নাইট্রাস অক্সাইড) ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে রোগী নিজেই ইচ্ছেমত এবং প্রয়োজনমত এই ওষুধ ব্যবহার করতে পারে। এতে রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে না, কিন্তু খুব ভালোভাবে ব্যথাউপশম হয়।

চামড়ায় বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা জাগিয়ে অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার উপশম করা হয়। যে জায়গায় সবথেকে বেশী ব্যথা অথবা ব্যথার জায়গার ডার্মাটোমে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা দেওয়া হয়। অনেক সময় প্রান্তিক নার্ভ, এমন কি নার্ভ প্লেক্সাসেও উদ্দীপনা করা হয় ব্যথাউপশমের জন্য। রোগীকে এই চিকিৎসা শিখিয়ে দেওয়া যায়, যাতে দরকারমত নিজেই এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে পারে। এই ধরনের চিকিৎসায় খারাপ উপসর্গ প্রায় কিছুই হয় না।

অনেক সময় মস্তিষ্কের cranial নার্ভ অথবা প্রান্তিক নার্ভ লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দিয়ে ব্যথা অনুভূতির গতিপথকে রুদ্ধ করা যায়। প্রয়োজনে অ্যালকোহল বা ফেনল দিয়ে নার্ভকে নষ্ট করে দেওয়াও হয়। শ্বাস-নালীর ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর শেষ পর্যায়ে superior laryngeal নার্ভ ব্লক করা যেতে পারে। ফুসফুসের ক্যানসারে প্রয়োজনে ইন্টারকস্টাল নার্ভ ব্লক করা হয়। পেটের ক্যানসারে বিশেষতঃ অগ্ন্যাশয় আক্রান্ত হলে coeliac plexus ব্লক করলে খুবই উপকার হয়।

ক্যানসারজনিত ব্যথার চিকিৎসায় অ্যালকোহল, ফেনল অথবা ক্লোরোক্রেশল দিয়ে subarachnoid ব্লক করেও ব্যথাউপশম ঘটানো যায়। এতে সুষুম্না-কান্ডের posterior nerve root-গুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং তার ফলে ব্যথা অনুভূতি কমে যায়, কিন্তু motor function মোটামুটি ঠিকই থাকে। এই

পদ্ধতিতে রোগী কয়েক মাস ভালোই থাকে—কোন ব্যথা হয় না। তবে আবার ব্যথা হলে এই ইঞ্জেকশন আবার দেওয়া যেতে পারে।

এপিডুরাল বা কডাল ইঞ্জেকশন দিয়েও ব্যথা অনুভূতি কমানো হয়। এই সব পদ্ধতি খুবই দক্ষ অবেদনবিদ্যাবিশারদ দিয়েই করানো উচিত। এতে লক্ষ্য রাখতে হবে রোগীর ব্যথা কমার জন্য যতটুকু sensory function নষ্ট করা উচিত, ততটুকুই করতে হবে—তার বেশী নয়। আবার motor function যেন মোটেই নষ্ট না হয়। এই সব পদ্ধতির নানা উপসর্গ হতে পারে। ঠিক মত ব্লক না হতে পারে, বেশী হতে পারে, motor function নষ্ট হয়ে যেতে পারে, মাংসপেশীসমূহে শিথিলতা বা দুর্বলতা হতে পারে; রোগীর প্রস্রাব এবং পায়খানার গন্ডগোল হতে পারে।

এই সব পদ্ধতি ছাড়াও অনেক সময় শল্যচিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অপারেশনের দরকার হতে পারে। Surgical rhisotomy অথবা cordotomy করা যেতে পারে। এই শল্যচিকিৎসাও খুব সহজ নয় এবং এতেও নানা খারাপ উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অনেক বিচার-বিবেচনা করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই শল্যচিকিৎসা করা উচিত। Percutaneous cordotomy এখন খুবই সাফল্যের সংগে করা হচ্ছে। এতে চামড়ার মধ্য দিয়ে সূঁচ ফুটিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ অথবা রেডিওথেরাপি দিয়ে spinothalamic tract নষ্ট করা হয়—যাতে ব্যথা অনুভূতির গতিপথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। যদি শিরদাঁড়া ক্যানসারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে অনেক সময় laminectomy করার দরকার হয়। এতে নার্ভ থেকে চাপ সরে যায় এবং তার ফলে ব্যথামুক্তি ঘটে।

দীর্ঘস্থায়ী ক্যানসারজনিত ব্যথা সারানো সত্যিই খুব দুষ্কর। এই সব রোগীর চিকিৎসায় যত্ন পরিচর্যা খুবই দরকার। এরা অত্যন্ত মানসিক চাপে ভোগে এবং বেশী আবেগপ্রবণ হয়। ডাক্তার, নার্স এবং রোগীর আত্মীয়-পরিজন-দেরও যথেষ্ট সহানুভূতির সংগে বিচার বিবেচনা করা উচিত।

থ্যালামিক সিনড্রোম (Thalamic syndrome):

এই অসুখ থ্যালামাসের posteroventral অংশটুকু নষ্ট হওয়ার ফলে হয়। সাধারণতঃ ঐ অংশের রক্তসরবরাহকারী রক্তনালীতে থ্রম্বোসিস হয়। ফলে থ্যালামাসের কিছু nuclei একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এই অসুখের উপসর্গগুলি

একটু বিচিত্র ধরনের। রোগীর আক্রান্ত দিকের অন্যদিকে অনুভূতি একেবারে চলে যায়, কেননা থ্যালামাসের relay কেন্দ্রগুলি কার্যক্ষম থাকে না। সেই দিকে অনৈচ্ছিকভাবে কিছু নড়াচড়া থাকে—মাংসপেশীতে tremor থাকে। অনিচ্ছাকৃত এই নড়াচড়া রোগী ইচ্ছে করেও বন্ধ করতে পারে না। রোগীর একটি দিকে কোন অনুভূতি না থাকলেও কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পরে রোগীর ব্যথা অনুভূতি অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। তখন কোন রকমের উদ্দীপনা হলেই রোগীর অসহ্য ব্যথা হয়। অল্প উদ্দীপনাতেও রোগীর ভীষণ ব্যথা হতে পারে। আবার অনেক সময় রোগী নিজে থেকেই নানা রকমের ভালো বা খারাপ অনুভূতিও বুঝতে পারে। কখনও মিষ্টি-মধুর অনুভূতির কথা বলে, আবার পরেই হয়তো অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির কথা বলে—এসবই রোগীর ভাবপ্রবণতার উপর নির্ভর করে।

এই বিশেষ ধরনের অসুখে থ্যালামাসের medial nuclei রক্তনালীর থ্রম্বোসিসে নষ্ট হয় না। তার ফলে এই nuclei-তে অনুভূতির গতিপথ অধিকতর সহজ এবং সরল (facilitation) হয় এবং ব্যথাও খুব বেশী ধরনের অনুভূত হয়।

এই থ্যালামিক সিনড্রোমে ব্যথা, hyperaesthesia, কিছু vasomotor disturbances এবং trophic change হতে দেখা যায়। এর ব্যথা সাধারণ ব্যথা বেদনা উপশমকারী ওষুধে বিশেষ কোন কাজ হয় না। ক্লোরপ্রোমাজিন ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। Carbamazepine খাওয়ালে অনেক সময় ব্যথা উপশম হয়। এই ওষুধ রোগের প্রকাশ অনুযায়ী দৈনিক ২০০ থেকে ১৬০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় কয়েক বারে ভাগ করে মুখ দিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

দ্বাদশ অধ্যায়

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যথা বেদনা

প্রত্যেক রোগীরই অপারেশনের পরে কিছু ব্যথা বেদনা হয়। অপারেশনের সময় শরীরের অংগপ্রত্যংগে যে কাটাকুটি হয়, অ্যানেস্থিসিয়া থাকাকালীন রোগী তার কোন ব্যথা পায় না। তবে অ্যানেস্থিসিয়া শেষ হয়ে গেলে রোগী সেই অপারেশনের জায়গা বা ক্ষত থেকে ব্যথা পায়। অনেক রোগী অপারেশনে কি হবে বা না হবে তা নিয়ে ভাবনা করে না, তাদের যত ভয় অপারেশনের পরে ব্যথা বেদনাকে। অবশ্য এই অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যথা বেদনা অনেক সময়েই অসহ্য ধরনের হতে পারে এবং এর থেকে রোগীর নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এতে অপারেশনের সুফলও অনেকাংশে কমে যেতে পারে।

অপারেশনের সময় শরীরে যে ক্ষত সৃষ্টি করা হয়, সেখান থেকে অনেক কিছু রাসায়নিক পদার্থ বের হয়। সেগুলি ব্যথা অনুভূতিকে বাড়িয়ে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। যে সমস্ত নার্ভগুলি অপারেশনের সময় কাটা পড়ে—সেখান থেকেও ব্যথা উদ্দীপনা হয়। সাধারণতঃ তিনটি জায়গা থেকে ব্যথা অনুভূতি হতে পারে—চামড়ায় বা ত্বকে, ভিতরের অনুভূতিপ্রবণ জায়গা থেকে এবং আভ্যন্তরীণ viscera থেকে। চামড়া থেকে উদ্ভূত ব্যথা খুবই তীক্ষ্ন ধরনের এবং সীমিত হয়। এর সংগে জ্বালা করা ব্যথাও থাকতে পারে। ভিতরের অনুভূতিপ্রবণ জায়গা থেকে যেমন মাংসপেশী, প্লুরা, পেরিটোনিয়াম ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত ব্যথা অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে থাকে, এই diffuse ব্যথা রোগীর অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়। আভ্যন্তরীণ viscera থেকে উদ্ভূত ব্যথা তীক্ষ্ন ধরনের বা spasmodic ধরনের হয় এবং অন্য জায়গায় এই ব্যথা নির্দেশিত হতে দেখা যায়।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী এই সব ব্যথা বেদনার সংগে রোগীর মানসিক অবস্থাও বিচার বিবেচনা করা উচিত। সে সময় রোগী সাধারণতঃ ভয়ে থাকে, একটা

অনিশ্চয়তা ভাব থাকে এবং রোগী নৈরাশ্য অনভব করে। সে সময় রোগীর ঘরে আর আত্মীয়-স্বজনকে দেখতে পায় না, নানা রকম যন্ত্রপাতি দেখে, অক্সিজেন, drip ইত্যাদি দেওয়া থাকে। নড়াচড়া করতে দেওয়া হয় না। ইঞ্জেকশন, সূঁচ ইত্যাদির ভয়ও থাকে। এই সব নানান কারণে রোগীর ভয় ভাবনা থাকেই। এই ভয় ভাবনা রোগীর ব্যথা বেদনাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এ সময় রোগী সাহচর্য এবং সহানুভূতি পেলে শান্ত হয়।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যথা বেদনার কারণ :

অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়ার পরে প্রায় সব রোগীই অল্পবিস্তর ব্যথা পায়। এদের মধ্যে কিছু রোগী ভয়ংকর ধরনের অসহ্য ব্যথার কথা বলে, কিছু রোগী মাঝামাঝি ব্যথা এবং কিছু রোগী অল্প ব্যথার কথা বলে। অবশ্য শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ রোগী কোন ব্যথার কথা বলেই না—যেটুকু ব্যথা হয় তা তারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত চারটি বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করলে রোগীর এই ব্যথার কারণ বোঝা যেতে পারে।

১। রোগীর মানসিক অবস্থা কেমন, রোগী কতটা ব্যথা সহ্য করতে পারে—এগুলি অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যথাকে নিয়ন্ত্রণ করে। রোগীর সামাজিক অবস্থা ব্যথা প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। আগে থেকে রোগীর সব কিছু জানা থাকলে রোগী ব্যথাকে সহ্য করে নিতে পারে। মেয়েরা বেশী ব্যথা বেদনার কথা বলে। রোগী ভাবপ্রবণ হলে, মানসিক চাপে থাকলে ব্যথা বেশী হয়। অপারেশনের আগে রোগীকে ব্যথানাশক ওষুধ দিলে পরেও ব্যথা বেদনা কম হয়। রোগীর ওজন, উচ্চতা বা surface area এই ব্যথা বেদনাকে বিশেষ প্রভাবিত করে না। সাধারণতঃ শিশু এবং অল্পবয়সী ছেলে মেয়েরা ভালোই ব্যথা সহ্য করতে পারে। কিন্তু বয়স্ক এবং বৃদ্ধ লোকেদের ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা কম হয়।

২। অপারেশন কোন জায়গায় এবং কি ধরনের হয়েছে তার উপরও ব্যথা নির্ভর করে। সাধারণতঃ পেটের উপরিভাগের অপারেশনে, বুকে, হাড়ের সন্ধিস্থলে, কোমরে, শিরদাঁড়ায় অথবা গুহ্যদেশের অপারেশনে স্বাভাবিক কারণেই বেশী ব্যথা হয়। পেটে এবং বুকের অপারেশনের পরে সাধারণ শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগেই ব্যথা হতে থাকে। সেই ব্যথার জন্য রোগী ভালোভাবে শ্বাস নিতে বা

কাশতে পারে না—এতে রোগীর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটতে পারে। Diaphragmatic হারনিয়া অথবা incisional হারনিয়া অপারেশনের পরে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস খুবই ব্যাহত হতে পারে এবং ব্যথাও হতে পারে।

হাড়ের সন্ধিস্থলে, উরুদেশে, হাঁটুতে, স্কন্ধে অথবা কনুই-এর শল্যচিকিৎসায় খুবই ব্যথা হয় এবং এই সব সন্ধিস্থলে একটু নড়াচড়া হলেই ব্যথা বেড়ে যায়। কোমরে, শিরদাঁড়ায় অপারেশন হলে অনেক সময় মাংসপেশীসমূহে টান ধরে এবং তার ফলে অসহ্য ব্যথা হতে পারে।

Incision বা চামড়ায় ছেদন কি ধরনের দেওয়া হয়েছে তার উপরও ব্যথার প্রকৃতি নির্ভর করে। যদি incision খুব বড় হয় এবং অনেক নার্ভ কাটা যায়, তবে স্বাভাবিকভাবেই বেশী ব্যথা হয়। যদি পেটের অপারেশনে আড়াআড়ি ভাবে incision দেওয়া হয়, তবে লম্বভাবে incision দেওয়ার চেয়ে অনেক কম ব্যথা হয়। বুকের অপারেশনে বড় incision দেওয়া হয়, এবং drain টিউব দেওয়া থাকে। এক্ষেত্রেও বেশী ব্যথা হয় এবং এদের শ্বাসপ্রশ্বাসও সীমিত হয়ে পড়ে। শরীরের অনেক অংশ জুড়ে অপারেশন হলে, বেশী tissue handling হলে, অপারেশনের সময় রোগীর ভংগিমা যদি অস্বাভাবিক থাকে, যদি অনেকক্ষণ কিডনি পজিশন বা lithotomy পজিশনে অপারেশন হয় এবং কিছু বিশেষ ধরনের অপারেশনে যেমন cross leg flap ইত্যাদিতে ব্যথা বেশী হয়।

৩। রোগীকে কি ধরনের অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া হয়েছে তার উপরও ব্যথার কম বেশী নির্ভর করে। যদি স্পাইনাল বা এপিডুরাল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া হয় এবং অপারেশনের পরেও অনেকক্ষণ তা কার্যকরী থাকে, তবে অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যথা বেদনা কম হয়। অপারেশনের পরে যদি ঠিকমত ঠিকমাত্রায় ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়া হয় তবে ব্যথা নিরাময় হয়। জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়ার কিছু ওষুধ যেমন ইথার, মেথোক্সি ফ্লুরেন অনেকক্ষণ শরীরে কার্যকরী থাকে—অপারেশনের পরেও অনেকক্ষণ রোগী ব্যথা অনুভব করে না। তবে হ্যালোথেন শরীর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়—সেক্ষেত্রে অপারেশনের পরেই ব্যথা অনুভূতি চলে আসে। সাইক্লোপ্রোপেন দিয়ে অ্যানেস্থিসিয়া দিলে রোগী পরে খুবই চঞ্চল হয়ে পড়ে। একে emergence delirium বলে। অ্যানেস্থিসিয়ার পরে রোগীর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে রোগী খুবই চঞ্চল হয়ে পড়ে। এটি অনেকসময় রোগীর ব্যথার জন্য মনে হতে পারে। এ সময় রোগীকে মরফিন,

পেথিডিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া উচিত নয়, কেননা এতে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হতে পারে এবং শরীরে আরও অক্সিজেনের অভাব ঘটাবে।

৪। অপারেশনের নিজস্ব কারণেও ব্যথার প্রকৃতি, ব্যাপ্তি এবং বিস্তৃতি নির্ভর করে। অপারেশনের আগে রোগীকে ঠিকমত তৈরী করে নিতে হয়, রোগীকে আগে থেকে সব কিছু বুঝিয়ে এবং জানিয়ে দিতে হয়, রোগীকে অপারেশনের পরে ঠিকমত যত্ন পরিচর্যা করার দরকার। এ সবে রোগীর ব্যথা অনেক কমে যায়। অপারেশনের সময় যাতে অস্বাভাবিকভাবে বেশী না হয়, তার দিকে নজর দেওয়া উচিত। বেশী tissue handling করলে ব্যথা বেশী হয়।

অপারেশনের পরে ব্যথাজনিত অন্যান্য উপসর্গ :

অ্যানেস্থিসিয়া এবং অপারেশন পরবর্তী এই ব্যথা বেদনা রোগীর অনেক ক্ষতি করতে পারে—নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে ফুসফুস সংক্রান্ত উপসর্গগুলি খুবই বেশী হয়। অত্যধিক ব্যথায়, রোগী ভালোভাবে শ্বাস নিতে পারে না, ভালোভাবে কেশে শ্বাসনালী এবং ফুসফুসের secretion বের করে দিতে পারে না। ফুসফুসে সহজেই জীবানু সংক্রমণ ঘটে। Atelectasis এবং pneumonitis এদের বেশী হয়।

এই ব্যথা বেদনায় মাংসপেশীসমূহে সংকোচন ঘটে—ফলে ব্যথা আরও বেড়ে যায়। বুকের এবং পেটের মাংসপেশীর অত্যধিক সংকোচনে শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হয় এবং তার ফলে শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। ব্যথার ভয়ে রোগী বেশী নড়াচড়া করতে পারে না—ফলে মাংসপেশী দুর্বল হয়ে পড়ে—ক্ষীণ হয়ে যায়। এতে রক্তনালীতে প্রদাহ এমনকি thrombo embolism-ও হতে পারে। রোগীর সেরে উঠতে অনেক সময় লাগে। সংকোচন বা spasm হলে আরও নানারকমের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। রক্তনালীতে সংকোচন ঘটলে রক্তচাপ বৃদ্ধি হতে পারে। শ্বাসনালীতে সংকোচন ঘটলে শ্বাস কষ্ট হয়। খাদ্যনালীতে সংকোচন ঘটলে বমি হতে পারে—পেট ফুলে ওঠে ও কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। আন্ত্রিক peristalsis কমে যায়। বৃক্কনালী এবং মূত্রস্থলীর কাজ কমে যায় এবং প্রস্রাব হতে কষ্ট হতে পারে।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যথা বেদনার চিকিৎসা :

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যথা বেদনা চিকিৎসার আগে এই ব্যথা যাতে না হয়

তার ব্যবস্থা করা দরকার। রোগীর মানসিক অবস্থার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত। প্রাক্ অ্যানেস্থিসিয়াকালে রোগীর ভয়-ভাবনা যাতে কম হয় তা দেখা দরকার। ভয় এবং দুর্ভাবনা এড়ানোর জন্য রোগীর সংগে সহানুভূতি নিয়ে ব্যবহার করা উচিত। চিকিৎসক, সেবিকা এবং অন্যান্য যারা রোগীর চিকিৎসার সংগে জড়িত তারা এবং এমন কি রোগীর আত্মীয় স্বজনরাও রোগীর সংগে ভালো ব্যবহার করবেন এবং যথাসম্ভব সাহস জোগাবেন। অনেক ওষুধ দেওয়ার চেয়ে ভালো একটু ব্যবহার অনেকসময়ই বেশী কার্যকরী হয়। রোগীকে তার অসুখ সম্বন্ধে, অপারেশন সম্বন্ধে, আনুষংগিক পারম্পর্য সম্পর্কে ভালোভাবে আগে থেকেই ওয়াকিবহাল রাখা উচিত। এতে রোগী মানসিকভাবে তৈরী থাকে—ব্যথা বেদনা সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ে এবং মনের বল বাড়ে। রোগীকে কখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখা উচিত নয়।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যথা বেদনা প্রতিরোধে শল্যচিকিৎসা এবং অবেদন-বিদ্যাবিশারদের ভূমিকাও যথেষ্ট। শল্যচিকিৎসককে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অপারেশন শেষ করতে হবে, কম tissue handling করতে হবে এবং অপারেশনের আগে এবং পরেও রোগীর ব্যথা কমানোর জন্য যথোচিত ব্যবস্থা নিতে হবে। অবেদনবিদ্যাবিশারদ দরকার মত প্রাক অ্যানেস্থিসিয়াকালে ব্যথাউপশমকারী ঔষধ দিতে পারেন। অপারেশনের সময় ঠিকমত muscle relaxant ওষুধ দেওয়া উচিত—এতে মাংসপেশীতে অযথা টান ধরে না। প্রয়োজনবোধে continuous এপিডুরাল ব্লক করা যেতে পারে। অপারেশনের আগে এবং পরেও সুষ্ঠু nursing care দরকার। রোগীকে বেশী দিন শুইয়ে রাখা উচিত নয়—যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি রোগীকে উঠে বসতে এবং চলাফেরা করতে দেওয়া উচিত।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য মরফিন, পেথিডিন বা পেন্টাযোসিন খুবই ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধগুলি সহজেই পাওয়া যায় এবং খুব সাফল্যের সংগে ব্যথা নিবারণ করে। কিন্তু এই ওষুধের মাত্রা যেন ঠিক থাকে। বেশী হলে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত হতে পারে এবং অন্যান্য উপসর্গ হতে পারে। এই ওষুধ ব্যথা থাকলে তবেই ব্যবহার করা উচিত। ব্যথার গুরুত্ব এবং প্রকৃতি বুঝে, রোগীর ওজন, বয়স, অন্য কোন অসুখ আছে কিনা দেখে তবেই ওষুধের মাত্রা ঠিক করা দরকার। যদিও এই সব ওষুধ

ভালোভাবে ব্যথাউপশম করে তবুও এদের আনুষংগিক উপসর্গ যেমন বমি, ব্যাহত শ্বাসক্রিয়া, পাকস্থলী এবং অন্ত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি হতে পারে। প্রয়োজনবোধে শিরাপথেও এই ওষুধ দেওয়া যায়, তবে অল্পমাত্রায় নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বার বার দিতে হয়। এই নার্কোটিক ওষুধ ফুসফুসের অসুখে, মস্তিষ্কের অসুখে, লিভারের অসুখে এবং MAO inhibitor পাওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত নয়।

অনেক সময় মরফিনের সংগে অল্পমাত্রায় hydroxyzine অথবা dextro-amphetamine দিলে ভালো কাজ হয়। এতে ব্যথা বেদনা ভালোভাবে নিরাময় হয় এবং তার সংগে বমি হওয়ার ঘটনা কমে যায়, রোগীর্র দুর্ভাবনাও অনেক কমে।

অল্প ব্যথার ক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন বা কোডিন দেওয়া যেতে পারে। অ্যাস-পিরিন খুবই ভালো ওষুধ। এটি ব্যথাউপশম করে, প্রদাহ কমায় এবং জ্বর কমায়। তবে এটি পাকস্থলীতে রক্তক্ষরণ করতে পারে। এটি oral anticoa-gulant ওষুধের সংগে কখনই দেওয়া উচিত নয়।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যথা নিবারণে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়া বা নার্ভ ব্লক খুবই উপযোগী। এতে ব্যথা বেদনা একেবারেই কমে যায়, মাংসপেশীসমূহে টান (spasm) থাকে না, এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হয় না। এতে রোগীর কাশতে কোন অসুবিধা হয় না, তাই রোগী কেশে শ্বাসনালী পরিষ্কার করতে পারে। রোগী তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে। কিন্তু এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও লোকাল অ্যানেস্থিসিয়া খুব একটি করা হয় না। কেননা এটি করতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, অনেক সময় এবং ধৈর্য লাগে। আবার লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার কার্যকাল ১ থেকে ২ ঘন্টার মত থাকে—তাই বার বার নার্ভ ব্লক করতে হতে পারে। অবশ্য এখন বুপিভ্যাকেনের মত ওষুধ ব্যবহার করলে এর কার্য-কারিতা ৮ থেকে ১০ ঘন্টার মত স্থায়ী থাকে। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের toxicity অথবা hypersensitivity সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকা দরকার। বার বার ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর tachyphylaxis হতে পারে, তখন আর সেই ওষুধের মাত্রায় আশানুরূপ কাজ হয় না।

ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য স্পাইনাল ব্লক বা এপিডুরাল ব্লক করা যেতে পারে। অনেক সময় paravertebral ব্লক অথবা ইন্টারকস্টাল নার্ভ ব্লক

করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইন্টারকস্টাল ব্লকে pneumothorax হওয়ার সম্ভাবনা থাকে—সেটি যাতে না হয় তার দিকে নজর দিতে হবে।

Continuous segmental এপিডুরাল ব্লক দিলে বার বার সূঁচ ফুটিয়ে ইঞ্জেকশন দিতে হয় না। প্রয়োজনবোধে এই পদ্ধতিতে বেশ কয়েকদিন ব্যথাউপশম করা যায়। এই পদ্ধতিতে একটি ক্যাথেটার এপিডুরাল স্পেসে প্রবেশ করানো থাকে এবং দরকার মত লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ক্যাথেটার দিয়ে এপিডুরাল স্পেসে দেওয়া হয়। যে কোন অপারেশনের পর বিশেষতঃ বুকের, পেটের এবং পায়ের অপারেশনের পর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। Continuous এপিডুরাল ব্লক অপারেশনের জন্যই ব্যবহার করা যেতে পারে এবং পরে অপারেশন পরবর্তী ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে। তবে এই ধরনের নার্ভ ব্লকে রোগীর রক্তচাপ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

Continuous caudal analgesia-ও একটি ভালো পদ্ধতি এবং এতে ভালোই ব্যথাউপশম হয়। তবে এই পদ্ধতি প্রয়োগে লাম্বার এবং সেকরাল নার্ভগুলি ব্লক হওয়ার জন্য মূত্রস্থলী এবং মলস্থলীর কাজ ব্যাহত হয় এবং পায়ের মাংস-পেশী সমূহ শিথিল হতে পারে। সাধারণতঃ পায়ের, মলস্থলীর এবং গুহ্যদেশের ব্যথা বেদনায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং এতে বেশী লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ লাগে না। তবে অনেক বেশী ওষুধ এই কডাল স্পেসে ইঞ্জেকশন দিলে এতে এপিডুরাল ব্লকের কাজ হয়। তবে সে ক্ষেত্রে রক্তচাপ হ্রাসের আশংকা থাকে।

অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য হিপনোসিস বা সম্মোহন বিদ্যার যথেষ্ট অবদান আছে। এতে রোগীর ভয় ভাবনা এবং মানসিক চাপ দূর হয়। এই সম্মোহন খুব সাবধানে করা উচিত। এতে মাংসপেশীর spasm বা টানও কমে যায়।

আকুপাংচার করেও এই ব্যথা বেদনা উপশম করা যেতে পারে। আবার রোগীর ব্যথার জায়গায় বা তার কাছাকাছি জায়গায় vibration ক'রে, percussion ক'রে অথবা কোন counter irritation করে সাফল্যের সংগে ব্যথাউপশম করা যেতে পারে। নার্ভে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা জাগিয়ে এই ব্যথার চিকিৎসা করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে একটি ইলেকট্রোড রোগীর ব্যথার জায়গায়,

চামড়ায় অথবা ত্বকের নীচে রাখা হয়। শরীরের যে ডার্মাটোমে ব্যথা সেখানে ইলেকট্রোড রাখাই ভালো। তারপর সেখানে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা জাগানো হয় একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রান্তিক নার্ভ অথবা নার্ভ plexus এবং প্রয়োজনবোধে সুষুম্নাকাণ্ডের dorsal column-এ বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা জাগানো হয়। এই পদ্ধতি ভালোভাবেই ব্যথা নিবারণ করতে পারে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রসব বেদনা ও তার উপশম

গর্ভস্থ শিশু গর্ভাশয় থেকে যোনিপথ দিয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়াকেই প্রসব হওয়া বলে। স্বাভাবিক নিয়মেই এই প্রসবকালে মাকে বেদনার সম্মুখীন হতে হয়। প্রসবের সময়ে গর্ভাশয়ে সংকোচন ঘটে এবং গর্ভাশয় বা uterus-এর নিম্নাংশে cervix-এ ক্রমান্বয়ে প্রসারণ ঘটতে থাকে। মোটামুটিভাবে প্রসবকালীন অবস্থাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথম নিয়মিত গর্ভাশয়ে সংকোচন আরম্ভ হওয়া থেকে cervix পুরোপুরি প্রসারিত হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থাকে প্রথম পর্যায় বলা হয়। দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় প্রথম পর্যায়ের শেষ থেকে এবং শেষ হয় শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। এই দ্বিতীয় পর্যায়েই মাকে নিজের থেকে শিশুকে গর্ভাশয় থেকে বের করে দেবার জন্য সচেষ্ট হতে দেখা যায়। সর্বশেষ তৃতীয় পর্যায়ের আরম্ভ হয় শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এবং শেষ হয় গর্ভপুষ্প (placenta) এবং আনুষংগিক membrane গর্ভাশয় থেকে বের হয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

এই প্রসবকালীন অবস্থা নানা জনের নানারকম হতে পারে। তবে যাদের প্রথম সন্তান হয় সেক্ষেত্রে প্রথম পর্যায় ১২ ঘন্টা বা তারও বেশী হতে পারে এবং দ্বিতীয় পর্যায় ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা স্থায়ী হয়। তবে যারা বার বার সন্তানসম্ভবা হয় তাদের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায় ছয় ঘন্টা এবং দ্বিতীয় পর্যায় আধ ঘন্টার মত স্থায়ী হতে পারে।

প্রসব আরম্ভ হওয়ার প্রথমদিকে গর্ভাশয়ে সংকোচন ঘটে খুবই অনিয়মিত-ভাবে এবং খুবই ধীরে ধীরে। তবে যখন ভালো গর্ভবেদনা ওঠে, তখন গর্ভাশয়ে সংকোচন ঘটে বেশ নিয়মিতভাবে—মোটামুটিভাবে দুই মিনিট অন্তর সংকোচন ঘটে এবং সংকোচন স্থায়ী হয় প্রায় ১ মিনিট। এই সময় গর্ভাশয়ের আভ্যন্তরীণ চাপ অনেক বেড়ে যায়, ৫০ থেকে ৭০ মিলিমিটার পারদচাপের মত হতে পারে। স্বাভাবিক সময়ে এই আভ্যন্তরীণ চাপ মোটামুটি ১০ মিলিমিটার পারদচাপের মত হয়।

প্রসবকালীন প্রথম পর্যায়ে মায়ের পিঠের দিকে কোমরে ব্যথা হয় এবং পরে গর্ভাশয়ের সংকোচনের ফলে মাঝে মাঝে বেশী ব্যথা হতে থাকে। এই ধরনের গর্ভাশয়ের সংকোচন যখন খুব তাড়াতাড়ি হয়, যখন অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং মা যখন নিজেই গর্ভস্থ শিশুকে বের করে দেবার চেষ্টা করে, তখন এই ব্যথা খুবই বেশী অনুভূত হয়। প্রথম পর্যায়ের শেষদিকে এই ব্যথা খুবই ভয়ংকর ধরনের হতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ে perineum খুব বেশী প্রসারিত হওয়ার জন্যও ব্যথা অনুভূত হয়।

প্রসূতির ব্যথা অনুভূতি বিভিন্ন মায়ের বিভিন্ন ধরনের হতে দেখা যায়। কেউ কেউ অল্পেই বেশী ব্যথা অনুভব করে। আবার কেউ কেউ খুব একটা বেশী ব্যথার কথা বলে না। তবে প্রসব বেদনা মায়ের জীবনের স্বাভাবিক ব্যথা অনুভূতি। রকমফের হলেও প্রত্যেক মাকেই কিছু না কিছু প্রসবকালীন ব্যথা সহ্য করতেই হয়। তবে এই ব্যথা অনুভূতি কমানোর জন্য বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে, অ্যানেস্থিসিয়ার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, এপিডুরাল ব্লকের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। আধুনিককালে ব্যথাহীন প্রসবের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। তবে সব রকম পদ্ধতির প্রয়োগের সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় যাতে গর্ভস্থ শিশুর কোন ক্ষতি যেন না হয়, প্রসবের সময়-কাল অযথা যেন বৃদ্ধি না পায়, প্রসূতির শারীরিক এবং মানসিক যেন কোন ক্ষতি না হয়।

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রসবের সময়-কাল অস্বাভাবিকভাবে অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রসবের প্রথম পর্যায়ে যদি প্রথম গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে ২০ ঘন্টার বেশী হয়, এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ১৪ ঘণ্টার বেশী হয়, তবে বুঝতে হবে প্রসব অস্বাভাবিকভাবে বিলম্বিত হচ্ছে। যখন ব্যথা থাকা সত্ত্বেও ২ ঘণ্টার মধ্যে cervix প্রসারিত হয় না অথবা শিশু যখন কিছুতেই নীচের দিকে নামে না তখন তাকেও বিলম্বিত প্রসব বলা হয়। অস্বাভাবিক দেরী অনেক কারণেই হতে পারে, যেমন —অত্যধিক ঘুমের ওষুধ, ব্যথানিবারক ওষুধ, নার্কোটিক ওষুধ, অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ প্রয়োগের ফলে দেরী হতে পারে। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে অস্বাভাবিক দেরীর কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেমন শিশুর মাথা এবং মায়ের pelvis-এ অস্বাভাবিক অসাম্য, গর্ভস্থ শিশুর position যদি সঠিক না থাকে ইত্যাদি।

প্রসবকালীন ব্যথার গতিপথ :

প্রসবকালীন প্রথম পর্যায়ে যে ব্যথা হয় তা সাধারণতঃ গর্ভাশয়ে সংকোচন এবং cervix-এর প্রসারণের জন্যেই হয়। এ ক্ষেত্রে ব্যথা উদ্দীপনা গর্ভাশয় এবং তার আশেপাশের sympathetic নার্ভতন্তুর মধ্য দিয়ে গিয়ে সুষুম্না-কান্ডের দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ থোরাসিক এবং প্রথম লাম্বার সেগমেন্টে যায়। প্রথম পর্যায়ের শেষদিকে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রসবকালে perineum খুব বেশী প্রসারিত হওয়ার ফলে বাড়তি ব্যথা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ব্যথা উদ্দীপনা pudendal নার্ভ দিয়ে যায় এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ সেকরাল সেগমেন্ট জড়িত হয়ে পড়ে।

প্রসবকালীন ব্যথাউপশম :

প্রসব সময়ে প্রসূতিকে কোন ঔষধ প্রয়োগ করতে হলে সব সময়েই কয়েকটি দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত।

১। যে সব ওষুধ গর্ভপুষ্প দিয়ে বের হতে পারে, সেই সব ওষুধ গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি করতে পারে। ঘুমের ওষুধ, নার্কোটিক ওষুধ যেমন মরফিন, পেথিডিন ইত্যাদি প্রসূতিকে প্রয়োগ করলে তা গর্ভপুষ্প দিয়ে গিয়ে শিশুকে অবদমিত করে দিতে পারে, শিশুর শ্বাসকার্যও ব্যাহত হতে পারে। মোটা-মুটিভাবে যে সব ওষুধ blood-brain barrier দিয়ে যায়, তারা placental barrier দিয়েও যেতে পারে।

২। প্রসূতিকে ওষুধ দেওয়ার ফলে যদি অত্যধিক ঘুমিয়ে পড়ে, তবে অনেক সময় প্রসূতির কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হয় না, অথচ প্রসব-কালীন দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রসূতির নিজে থেকে গর্ভস্থ শিশুকে বের করে দিতে চেষ্টা করতে হয়।

৩। এই সব ওষুধে প্রসূতির শ্বাসক্রিয়া ব্যাহত হলে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং ব্যথানিবারক ওষুধ খুবই সাবধানে দিতে হবে।

এখন কী কী ভাবে প্রসবকালীন ব্যথাউপশমের চেষ্টা করা হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রত্যেক প্রসূতিকে প্রসবের অনেক আগে থেকেই প্রসবকালীন বিভিন্ন অবস্থা

সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে রাখা উচিত। প্রসবকালীন ব্যথা কী ধরনের হয়, কখন হয় এবং সেজন্য যে ভয়ের কিছু নেই সে বিষয়ে রোগীকে বোঝানো উচিত। কখন প্রসূতিকে শিশুকে বের করে দেবার জন্য সচেষ্ট (bear down) হতে হবে, তা আগে থেকেই মোটামুটিভাবে বুঝিয়ে রাখলে ভালো হয়। প্রসূতির ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা কেমন, তার মানসিক অবস্থা কেমন, সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। প্রসূতি ব্যথাউপশম চায় কিনা সে বিষয়েও জানতে হবে। অনেক প্রসূতি অল্প ব্যথাতেই কাতর হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগ করতে হলে বা অন্য কোন পদ্ধতি, এপিডুরাল ব্লক প্রয়োগ করতে হলে প্রসূতিকে ভালোভাবে আগে থেকে বুঝিয়ে বলতে হবে। কিছু কিছু প্রসূতি মোটেই চান না যে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তাঁর চৈতন্য আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। সে অবস্থাতেও প্রসূতিকে আগে থেকে প্রসবের বিভিন্ন দিক বোঝাতে হবে এবং বিভিন্ন ব্যায়ামের সাহায্যে প্রসূতিকে আগে থেকে তৈরী করে রাখতে হবে। ঔষধ প্রয়োগ ছাড়াই প্রসূতির প্রসব বেদনা অনেক কমানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে চিকিৎসক, সেবিকা, আত্মীয় স্বজন ইত্যাদিদেরও অনেক কিছু করার আছে। ভালো সম্পর্ক, ভালো ব্যবহার, সহানুভূতি, স্বাস্থ্যসম্মত প্রসবাগার, আরামদায়ক পারিপার্শ্বিক অবস্থা —এ সবই প্রসূতির প্রসব বেদনা অন্ততঃ কিছুটা উপশম করতে সাহায্য করে।

সম্মোহনের সাহায্যে প্রসব বেদনা কমানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। এতে প্রসূতিকে কোন ওষুধ প্রয়োগ করতে হয় না। এতে ব্যথা অনুভূতি যথেষ্ট কমে যায় এবং প্রসূতিকে অচৈতন্য করতে হয় না। প্রসূতি ভালোভাবেই চিকিৎসকের কথামত সহযোগিতা করতে পারে। আবার প্রয়োজনে প্রসূতিকে নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতেও রাখা যায়। এই পদ্ধতিতে বিশেষ কোন খারাপ উপসর্গ হয় না। তবে প্রসবের পরবর্তী সময়ে প্রসূতির গর্ভাশয় অবদমিত থাকতে পারে। এই সম্মোহন পদ্ধতির প্রয়োগ সব প্রসূতির ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এই সম্মোহন পদ্ধতি বিশেষ চালু পদ্ধতি নয়, তাই সব চিকিৎসকের পক্ষেও এর প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। প্রসবের অনেক দিন আগে থেকেই অন্ততঃ ৬ মাস আগে থেকে এই সম্মোহনের ব্যাপারে প্রসূতিকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। প্রসবকালীন এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে সবসময়ের জন্য প্রসূতিকে যথেষ্ট সতর্কতার সংগে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। প্রসূতির যেন অযথা ভয় বেড়ে না যায় বা অত্যধিক মানসিক চাপ সৃষ্টি না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

আকুপাংচার :

এটি একটি প্রাচীন চৈনিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শরীরে বিভিন্ন নির্ধারিত স্থানে সূঁচ ফুটিয়ে ব্যথাউপশমের চেষ্টা করা হয়। এতে শরীরের অনেক ধরনের ব্যথাউপশম সম্ভব। এটি একটি নিরাপদ পদ্ধতি, শরীরে বিশেষ কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। রোগীকে অচৈতন্য করতে হয় না, রোগী ভালোভাবে সহযোগিতা করতে পারে। এই পদ্ধতি খুবই সহজ, কোন দামী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না, খরচও অনেক কম। যে কোন জায়গায় এমন কি গ্রামেও এটির প্রয়োগে কোন অসুবিধা হয় না।

এই আকুপাংচার পদ্ধতির প্রয়োগ প্রসব বেদনা কমানোর জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কতটা কার্যকরী সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

ঘুমের ওষুধ :

প্রসবকালীন প্রথম পর্যায়ে প্রসূতিকে ঘুম পাড়ানোর জন্য এবং ভালো বিশ্রাম দেওয়ার জন্য sedative এবং ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আগেকার দিনে সেকোবারবিটোন, পেন্টোবারবিটোন, অ্যামাইলোবারবিটোন খুবই ব্যবহার করা হতো, কিন্তু এতে অনেক সময় গর্ভস্থ শিশুও অবদমিত হতে পারে। কুইনালবারবিটোন খুব কম সময় কার্যকরী থাকে, সুতরাং এই ওষুধ ৯০ থেকে ১৮০ মিলিগ্রাম মুখ দিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। সাধারণতঃ প্রথম প্রসূতিকে প্রসবের প্রথম পর্যায়ে বারবিচুরেট দেওয়া যায়, অন্যথায় প্রসব সময় অনেক কম হলে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হতে পারে।

ক্লোরাল হাইড্রেট ২ গ্রাম অনেক সময় প্রয়োগ করা হয় এবং এতে শিশুর ক্ষতি বিশেষ হয় না।

নার্কোটিক ওষুধ যেমন মরফিন, পেথিডিন ইত্যাদি খুবই ফলপ্রদ ব্যথা-উপশমকারী ওষুধ। কিন্তু এই সব ওষুধ placental barrier দিয়ে ভালোভাবে যেতে পারে এবং তাতে শিশুর শ্বাসক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৫ বা ৬ ঘণ্টা আগে পেথিডিন অথবা মরফিন প্রসূতিকে প্রয়োগ করলে শিশুর ক্ষতি হওয়ার অনেক বেশী সম্ভাবনা থাকে। এই সব ওষুধ প্রয়োগে গর্ভাশয়ের সংকোচনক্ষমতা কমে যায় এবং প্রসব সময় অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়।

অনেক সময় প্রসূতির রক্তচাপ হ্রাসও ঘটতে দেখা যায়। সাধারণতঃ মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন দিলে পেথিডিন ৫০ থেকে ১০০ মিলিগ্রাম, শিরাপথে দিলে ২৫ থেকে ৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়। মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন দেওয়ার ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টার মধ্যে এবং শিরাপথে ইঞ্জেকশন দিলে ৫ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যথাউপশমকারী ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। এর কার্যকারিতা ৩ থেকে ৪ ঘণ্টার মত স্থায়ী হতে পারে।

ডায়াজিপাম একটি ভালো sedative ওষুধ। ব্যথাউপশমকারী ওষুধের সংগে দিলে উভয়েরই কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। প্রসূতির মানসিক দুশ্চিন্তা, ভয় ভাবনা দূর হয়, ডায়াজিপাম প্রয়োগ করলে পেথিডিনের মাত্রা অনেক কম লাগে। প্রসূতির যদি রক্তদুষ্টি (toxaemia) থাকে, তবে ডায়াজিপাম দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় এবং এতে খিঁচুনি কমতে সাহায্য করে। তবে ডায়াজিপাম placental barrier দিয়ে যেতে পারে এবং গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হতে পারে। বেশী পরিমাণে ডায়াজিপাম দিলে রোগীর মাংসপেশীসমূহ শিথিল হয়ে পড়ে, কর্মশক্তি হ্রাস পায়, দেহের তাপমাত্রাও কমে যেতে পারে। সুতরাং প্রসবকালীন সময়ে প্রয়োগ করলে ডায়াজিপামের মাত্রা খুবই অল্প হওয়া উচিত।

Phenothiazine গ্রুপের ওষুধও অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। এতে প্রসূতির ভয় ভাবনা, দুশ্চিন্তা দূর হয়, মন শান্ত হয়। অনেক সময় প্রসূতি ঘুমিয়ে পড়ে। এই সব ওষুধের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যেমন— প্রোমাজিন (২৫ থেকে ৫০ মিলিগ্রাম), ট্রাইমেপ্রাজিন (১০ থেকে ২০ মিলিগ্রাম) ট্রাইফ্লুওপ্রোমাজিন (৫ থেকে ১০ মিলিগ্রাম) প্রোমেথাজিন (২৫ থেকে ৫০ মিলিগ্রাম)। প্রোপিওম্যাজিনের কিছুটা ব্যথাউপশম করার ক্ষমতাও আছে।

Hydroxyzine অনেক সময় প্রসবকালীন সময়ে ব্যবহার করা হয়। এতেও রোগীর মন শান্ত সমাহিত থাকতে সাহায্য করে। Hyoscine ব্যবহার করেও অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। এতে প্রসূতি সুস্থির হয় এবং সাময়িক স্মৃতি-ভ্রংশ (amnesia) ঘটে। তবে অনেক সময় রোগী ছটফট করে এবং ভালোভাবে সহযোগিতা করতে পারে না।

Ketamine কম মাত্রায় দিলে প্রসূতির ব্যথা উপশম হতে পারে। সাধারণতঃ ০·২৫ মিলিগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম ওজন হিসাবে শিরাপথে অথবা মাংসপেশীতে

দেওয়া হয়। এতে প্রসূতির এবং শিশুর খুব একটা ক্ষতি হয় না, তবে বেশী পরিমাণে দিলে রোগী একেবারেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে এবং শিশুর ক্ষতি হতে পারে।

গ্যাস এবং উদ্বায়ী (volatile) তরল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ :

এই ধরনের ওষুধ প্রসবকালীন প্রথম পর্যায়ের শেষ দিকে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য এই সব ওষুধ যে মাত্রায় দেওয়া হয় এক্ষেত্রে সে মাত্রা অনেক কম দেওয়া হয়। এতে শুধুমাত্র ব্যথা উপশমই হয় এবং প্রসূতি জেগেই থাকে—অচৈতন্য হয় না। এতে রোগীর সহযোগিতাও ভালোভাবে পাওয়া যায়। এই ধরনের গ্যাস অথবা volatile অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ মুখে মাস্ক লাগিয়ে দেওয়া হয়, অনেক সময় রোগী নিজেই এটি প্রয়োগ করতে পারে। গর্ভাশয়ে যখন সংকোচন ঘটে তখনই ব্যথার সৃষ্টি হয়। সেই সময়েই এই ওষুধ প্রয়োগ করা হয় ব্যথা উপশমের জন্য। গর্ভাশয়ে যখন সংকোচন ঘটে না, তখন ব্যথাও থাকে না—সে সময় এই অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের প্রয়োজনও হয় না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রসূতিকে সব সময়েই এই গ্যাস প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রসূতি যদি খুব বেশী ঝিমিয়ে পড়ে, সহযোগিতা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, ছটফট করে, তখন অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। প্রসূতির শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা বিচার বিবেচনা করে কতটা মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে তা নির্ণয় করা দরকার। এ সময় চিকিৎসকের সর্বক্ষণ প্রসূতির কাছে থাকতে হবে, প্রসূতির সংগে কথা বলতে হবে এবং সাহস যোগাতে হবে। প্রসূতির নাড়ী, রক্তচাপ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের দিকে নজর রাখতে হবে।

এই সব অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ প্রয়োগের ফলে কিছু কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে। হঠাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে ওষুধের মাত্রা বেশী হয়ে যেতে পারে। রোগী একেবারে অচৈতন্য হয়ে যেতে পারে। বমি হতে পারে, আবার বমি শ্বাস-পথে গিয়ে ফুসফুসে প্রদাহের সৃষ্টি করতেও পারে। প্রসূতির আকস্মিক রক্তচাপ হ্রাসও ঘটতে পারে। শ্বাসক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে।

নাইট্রাস অক্সাইড :

নাইট্রাস অক্সাইড এবং বাতাস দিয়ে প্রসূতির ব্যথা উপশম করা যেতে পারে। সাধারণতঃ ৫০% নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করা হয়, তবে এতে প্রসূতির এবং শিশুর শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটতে পারে। সুতরাং এইভাবে নাইট্রাস অক্সাইড প্রসূতির হৃৎপিন্ডের অসুখ থাকলে, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট থাকলে, গর্ভস্থ শিশুর distress থাকলে, প্লাসেন্টায় রক্ত সরবরাহ বিঘ্নিত হলে—কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়। ইদানিং কালে নাইট্রাস অক্সাইড এবং অক্সিজেন ব্যবহার করে খুবই সুফল পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

আজকাল একই সিলিন্ডারে নাইট্রাস অক্সাইড এবং অক্সিজেন মিশ্রিত অবস্থায় রাখা হয়। সাধারণতঃ ৫০% নাইট্রাস অক্সাইড অক্সিজেনের সংগে মিশ্রিত থাকে। সিলিন্ডারে ১৯৮০ পাউন্ড প্রতি বর্গ ইঞ্চি প্রেসারে থাকে। সিলিন্ডারের সংগে প্রেসার কমানোর ভাল্ব লাগানো থাকে, প্রসূতির কাছে যখন এই গ্যাস যায় তখন তার প্রেসার স্বাভাবিক atmospheric প্রেসারের সমান হয়ে যায়। অত্যধিক ঠান্ডায়—৭° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি এই মিশ্রিত গ্যাস খানিকটা তরলীভূত হয়ে পড়ে এবং দুই গ্যাস খানিকটা আলাদা হয়ে পড়ে। সুতরাং সেই অবস্থায় সিলিন্ডারটি ৫ মিনিট ৩৭° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার জলে রাখতে হয় এবং অন্তত তিন বার সিলিন্ডারটি উপর নীচ ঝাঁকানি দিতে হয়। এই নাইট্রাস অক্সাইড এবং অক্সিজেন মিশ্রিত গ্যাসকে entonox বলা হয়। এই গ্যাস মোটামুটিভাবে ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে ভালোই কাজ দেয়।

ট্রাইক্লোরোএথিলিন ঃ

এই অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ বাতাসের সংগে প্রসূতিকে প্রয়োগ করা হয়। ট্রাইক্লোরোএথিলিন একটি ভালো ব্যথা নিবারক ওষুধ। এটি মেশিনের সাহায্যে ০·৩৫% থেকে ০·৫% মাত্রায় দেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে প্রসূতির শ্বাসপ্রশ্বাসের হার এবং টাইডাল ভল্যুম পর্যাপ্ত থাকতে হবে। ট্রাইক্লোরোএথিলিন প্রয়োগের পর শরীরে খানিক জমে থাকতে পারে। সুতরাং কখনও ৬ ঘন্টার বেশী এটি প্রয়োগ করা উচিত নয় এবং এটির মাত্রা যথাসম্ভব কমের দিকে রাখাই বাঞ্ছনীয়। এর প্রয়োগে শিশু অবদমিত অবস্থায় থাকতে পারে। প্রয়োজন মত

এর সংগে অক্সিজেন দেওয়াও যেতে পারে। এতে প্রসূতির শরীরে অক্সিজেনের অভাব ঘটার সম্ভাবনা কমে।

বেশী মাত্রায় ট্রাইক্লোরোএথিলিন ব্যবহার করা হলে অথবা অনেকক্ষণ ধরে এর ব্যবহার করলে গর্ভাশয়ে সংকোচন কমে যায় এবং প্রসব পরবর্তীকালে গর্ভাশয় থেকে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হতে পারে। Cardiac failure এবং cranial nerve palsy কখনও কখনও ঘটতে পারে, তবে সে রকম ঘটনার মাত্রা অতি নগণ্য।

মেথোক্সিফ্লুরেন :

মেথোক্সিফ্লুরেন একটি ভালো অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এটি একটি বিশিষ্ট যন্ত্রের মাধ্যমে প্রসূতিকে প্রসববেদনা কমানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণতঃ ০·৩৫% মাত্রার বেশী মেথোক্সিফ্লুরেন ব্যবহার করার দরকার হয় না।

মেথোক্সিফ্লুরেনও বেশী ব্যবহার করলে শরীরে জমে থাকতে পারে। অত্যধিক প্রয়োগে প্রসূতি ঝিমিয়ে পড়ে, অচৈতন্য হয়ে পড়তেও পারে। ঠিক মাত্রায় ব্যবহার করলে প্রসূতির প্রসব সময় বাড়ায় না এবং শিশুরও বিশেষ ক্ষতি হয় না। তবে প্রসূতির কিডনীর অসুখ থাকলে মেথোক্সিফ্লুরেন ব্যবহার করা উচিত নয়।

রিজিওনাল এনালজেশিয়া :

প্রসববেদনা উপশমের জন্য এই রিজিওনাল ব্লক খুবই সুপরিচিত পদ্ধতি। এক্ষেত্রে প্রসূতি অজ্ঞান হয় না অথচ ব্যথা বেদনা বুঝতে পারে না এবং প্রসবের সময় যথেষ্ট সহযোগিতা করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রসূতির খুব একটা বমি হয় না, বমি শ্বাসনালীতে গিয়ে ফুসফুসের প্রদাহ ঘটাতে পারে না। গর্ভস্থ শিশুর বিশেষ ক্ষতি হয় না। তবে রিজিওনাল ব্লক প্রয়োগের সময় প্রসূতির শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করতে হবে। শিরাপথে fluid দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হঠাৎ কোন খারাপ উপসর্গ দেখা দিলে তার চিকিৎসার জন্যও সব রকমের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পুনরুজ্জীবনের জন্য কৃত্রিম শ্বাসকার্য চালানোর ব্যবস্থা রাখা অবশ্য কর্তব্য।

সাধারণতঃ প্যারাসারভাইকলে ব্লক, কডাল এনালজেশিয়া, স্পাইনাল ব্লক, লাম্বার এপিডুরাল ব্লক পিউডেনডাল ব্লক এই প্রসবকালীন ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

প্যারাসারভাইকাল ব্লক :

এই ব্লকে প্রসবকালীন প্রথম পর্যায়ের ব্যথা অনেকাংশে উপশম ঘটতে পারে। এতে ব্রড লিগামেন্ট এবং সারভিক্সের আশেপাশের autonomic স্নায়ুতন্ত্র ব্লক হয়।

প্রসূতিকে লিথোটমি পজিশনে রাখা হয়। ৫ থেকে ৮ মিলিলিটার ১% লিগনোকেন সলিউশন সারভিক্সের পাশে ইঞ্জেকশন হিসাবে দেওয়া হয়। সূচটি vaginal fornix দিয়ে গিয়ে ২ সেন্টিমিটার ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। দুই দিকেই ইঞ্জেকশন দিতে হয়।

এই পদ্ধতি প্রয়োগের পর শিশুর হৃৎস্পন্দন অনেক কমে যেতে পারে, শিশুর শরীরে অম্লতা বৃদ্ধি পেতে পারে, শিশুর অক্সিজেনের অভাব ঘটতে পারে এবং শিশু অবদমিত অবস্থায় থাকতে পারে। এই ধরণের অবস্থা ব্লক দেওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে ঘটে এবং ৩০ মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়—এটি গর্ভাশয়ের রক্তনালী সংকোচনের ফলে ঘটতে পারে অথবা শিশুর রক্তে অত্যধিক লিগনোকেন থাকার জন্যও হতে পারে।

কডাল এনালজেশিয়া :

প্রসববেদনা ঠিকমত ওঠার পরই এই কডাল ব্লক দিয়ে ব্যথা বেদনা উপশমের চেষ্টা করা হয়। কডাল ব্লকের প্রয়োগ পদ্ধতি সপ্তদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বলা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে কডাল ব্লক খুব বেশী কার্যকরী নাও হতে পারে। এপিডুরাল ব্লকের তুলনায় কডাল ব্লকের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার আশংকা বেশী থাকে। অনেক বেশী লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দিতে হয়—তাই তা থেকে toxic প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। অনেক সময় অত্যধিক রক্তচাপ হ্রাসও ঘটতে পারে। কডাল ব্লক দেওয়ার পর pelvic floor-এর মাংসপেশীসমূহ খুবই শিথিল অবস্থায় থাকে। তার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ফরসেপসের সাহায্যে শিশুকে ভূমিষ্ঠ করাতে হতে পারে। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় খুবই সাবধানে দেওয়া উচিত নতুবা অন্য জায়গায় এমন কি শিশুর মাথাতেও ইঞ্জেকশন হয়ে যেতে পারে।

লাম্বার এপিডুরাল ব্লক :

ব্যথাহীন প্রসবের ক্ষেত্রে এই ধরনের এপিডুরাল ব্লক খুবই উপযোগী। এতে প্রসূতি অচৈতন্য অবস্থায় থাকে না, উপরন্তু ব্যথা বেদনা বুঝতে পারে না এবং প্রসূতি সহযোগিতা করতে পারে। তবে এই পদ্ধতি প্রয়োগের পর অ্যানেস্থিটিস্টকে খুব ভালোভাবে প্রসূতির দিকে নজর রাখতে হবে। ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদকেও সেখানে থাকতে হবে, কেননা যে কোন সময়ে ফরসেপসের সাহায্যে শিশুকে ভূমিষ্ঠ করানোর প্রয়োজন হতে পারে।

লিগনোকেন ১ থেকে ২%, মেপিভ্যাকেন ১% অথবা বুপিভ্যাকেন ০·৫% ব্যবহার করা যেতে পারে। সময়বিশেষে এডরেনালিন এর সংগে দেওয়া যেতে পারে।

এই এপিডুরাল ব্লকের প্রয়োগ পদ্ধতি সপ্তদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। Continuous এপিডুরাল ব্লক করার জন্য একটি নাইলন ক্যাথেটার এপিডুরাল স্পেসে রেখে দেওয়া হয়। প্রয়োজনমত এর মধ্য দিয়ে বার বার লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এপিডুরাল ব্লকে ব্যথাউপশম ঘটে, প্রসূতি কাহিল হয়ে পড়ে না এবং মানসিক দিক দিয়েও দুর্বল হয়ে পড়ে না। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এপিডুরাল ব্লক প্রয়োগ করা অপরিহার্য, যেমন—প্রসূতির রক্তদুষ্টি থাকলে, দীর্ঘস্থায়ী প্রসবকালে, প্রসূতির হৃৎপিন্ডের এবং শ্বাসক্রিয়াঘটিত অসুখ থাকলে, যখন অন্য কোনভাবে ব্যথাউপশম করা সম্ভব হয় না, যখন শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে প্রসূতির অনিচ্ছা থাকলে কখনও এই এপিডুরাল ব্লক প্রয়োগ করা উচিত নয়। রোগীর shock থাকলে, অত্যধিক রক্তচাপ হ্রাস থাকলে, রোগীর রক্তের পরিমাণ অনেক কম থাকলে, রোগীর রক্তজমাট বাঁধার কোন গন্ডগোল থাকলে, স্নায়ুঘটিত অসুখ থাকলে—ইত্যাদিতে এপিডুরাল ব্লক প্রয়োগ করা উচিত নয়।

এপিডুরাল ব্লক প্রয়োগের পর শিশু ভূমিষ্ঠ হলে শিশু মোটামুটি ভালোই থাকে, খুব একটা অবদমন দেখা যায় না। প্রসূতির রক্তদুষ্টি (toxaemia) থাকলে রক্তচাপ অল্প হ্রাস পায়, খিঁচুনিও কমে। এপিডুরাল ব্লকের সময় যাতে রক্তচাপ অত্যধিক হ্রাস না পায় এবং tolal spinal block না হয়—সে দিকে যথেষ্ট নজর রাখা দরকার।

চতুর্দশ অধ্যায়
ব্যথানাশক ঔষধপত্র

ব্যথাউপশমকারী ঔষধপত্রকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা হয়। তাদের প্রথমটি narcotic, এদের মধ্যে আছে মরফিন, পেথিডিন, পেণ্টাযোসিন ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়টি non-narcotic—যেমন স্যালিসিলেট, ফেনাসিটিন, প্যারাসিটা-মল ইত্যাদি। এই সব ওষুধ সম্বন্ধে কিছু ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা দরকার।

মরফিন (Morphine) :

এটি আফিমের একটি উপক্ষার (alkaloid)। এটি ব্যথানাশক ওষুধ হিসাবে সুপরিচিত। মস্তিষ্কের কিছু কেন্দ্রে অবদমনের ফলে এটি ঘুম পাড়ায়, মনকে শান্ত করে, শ্বাসপ্রশ্বাসের হার কমায় এবং কাশিও কমিয়ে দেয়। আবার মস্তিষ্কের কিছু কেন্দ্রে উদ্দীপনার ফলে বমি হতে পারে, চোখের তারা ছোট হয়ে পড়ে। সুষুম্নাকাণ্ডের উত্তেজনার ফলে খিঁচুনিও হতে পারে। এতে রোগীর মেজাজ খুব ভালো হয়। তবে এটি নেশায় পরিণত হতে পারে।

রোগীর খাদ্যনালীতে, অন্ত্রে, পিত্তনালীতে এবং বৃক্কনালীতে সংকোচন সৃষ্টি করতে পারে। মরফিন প্রয়োগে অত্যধিক antidiuretic হরমোন নিঃসরণের ফলে প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যেতে পারে। মরফিন শ্বাসনালীতে সংকোচন ঘটায়, তাই হাঁপানি রোগীদের এটি না দেওয়াই ভালো। মরফিন রক্তচাপ হ্রাস করে, নাড়ীর গতি হ্রাস করে। মরফিন কোষ্ঠকাঠিন্য করতে পারে। এটি রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। মরফিন প্লাসেন্টা দিয়ে বেরুতে পারে, তাই Caesarean section-এ দিলে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হতে পারে।

এই মরফিন লিভারে বিপাক হয়। এর বেশীর ভাগ প্রস্রাবের সংগে এবং কিছুটা পৌষ্টিক নালী দিয়ে বেরিয়ে যায়। মরফিন ঘাম, মুখের লালা এবং বুকের দুধের সংগেও বেরিয়ে যায়।

সাধারণভাবে মরফিন ০·২ মিলিগ্রাম প্রতি কে.জি. হিসাবে মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এটি শিরাপথেও দেওয়া যায়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে মরফিন খুব ভেবেচিন্তে দেওয়া উচিত। খুব শিশু এবং বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে, গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে, মরফিনে এলার্জি থাকলে, রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট থাকলে, অত্যধিক রক্তচাপ হ্রাস থাকলে, যাদের পিটুইটারি, এডরেনাল এবং থাইরয়েড গ্রন্থির অসুখ আছে এবং যে সব রোগী MAO inhibitor ওষুধ খাচ্ছে—এসবের ক্ষেত্রে মরফিন দিতে গেলে অনেক ভেবে চিন্তে দিতে হবে। একান্ত প্রয়োজনে কম মাত্রায় দেওয়া যেতে পারে। লিভারের অসুখে মরফিন দিলে রোগী অচৈতন্য হয়ে যেতে পারে। নিওষ্টিগমিন এবং ক্লোরপ্রোমাজিনের সংগে মরফিন দিলে মরফিনের কার্যকারিতা অনেক বেড়ে যায়।

পেথিডিন (Pethidine) :

এটি কৃত্রিমভাবে তৈরী মরফিনজাতীয় একটি ভালো ব্যথানাশক ওষুধ। এটি মরফিনের চেয়ে কম কার্যকরী। এটিও ঘুমের উদ্রেক করে। ভয়ভাবনা দূর করে এবং মনকে শান্ত করে। এতে শ্বাসপ্রশ্বাস হ্রাস পায়। এটি মস্তিষ্কের প্রেসার বাড়াতে পারে। এটিও নেশায় পরিণত হতে পারে।

পেথিডিন শ্বাসনালী, অন্ত্র, বৃক্কনালী এবং রক্তনালীর মাংসপেশীতে শিথিলতা আনে। অনেক সময় রক্তচাপ হ্রাস পায়, নাড়ীর গতিও কমতে পারে। পেথিডিন কখনও কোষ্ঠকাঠিন্য করে না।

এতে এট্রোপিনের মত কিছু কাজ হয়। মুখে শুকনো ভাব আসে। চোখের তারা বড় হতে পারে। এটি অনেক সময় হিষ্টামিন নিঃসরণ করায়। পেথিডিন প্লাসেন্টা দিয়ে বেরুতে পারে তাই Caesarean section-এ দিলে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হতে পারে।

পেথিডিন দেওয়ার পর অনেক সময় আলাদা উপসর্গ দেখা দেয়—যেমন অত্যধিক ঘাম হওয়া, অত্যধিক রক্তচাপ হ্রাস, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, হাত পা ঝিন ঝিন করা ইত্যাদি।

পেথিডিন মাংসপেশীতে অথবা শিরাপথে ইঞ্জেকশন হিসাবে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ১ থেকে ২ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে দেওয়া হয়।

যে সব রোগী MAO inhibitor ওষুধ খায় তাদের পেথিডিন দিলে চৈতন্যলোপ, খিঁচুনি এবং এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। লিভারের অসুখে,

চতুর্দশ অধ্যায়
ব্যথানাশক ঔষধপত্র

ব্যথাউপশমকারী ঔষধপত্রকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা হয়। তাদের প্রথমটি narcotic, এদের মধ্যে আছে মরফিন, পেথিডিন, পেণ্টাযোসিন ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়টি non-narcotic—যেমন স্যালিসিলেট, ফেনাসিটিন, প্যারাসিটামল ইত্যাদি। এই সব ওষুধ সম্বন্ধে কিছু ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা দরকার।

মরফিন (Morphine) :

এটি আফিমের একটি উপক্ষার (alkaloid)। এটি ব্যথানাশক ওষুধ হিসাবে সুপরিচিত। মস্তিষ্কের কিছু কেন্দ্রে অবদমনের ফলে এটি ঘুম পাড়ায়, মনকে শান্ত করে, শ্বাসপ্রশ্বাসের হার কমায় এবং কাশিও কমিয়ে দেয়। আবার মস্তিষ্কের কিছু কেন্দ্রে উদ্দীপনার ফলে বমি হতে পারে, চোখের তারা ছোট হয়ে পড়ে। সুষুম্নাকান্ডের উত্তেজনার ফলে খিঁচুনিও হতে পারে। এতে রোগীর মেজাজ খুব ভালো হয়। তবে এটি নেশায় পরিণত হতে পারে।

রোগীর খাদ্যনালীতে, অন্ত্রে, পিত্তনালীতে এবং বৃক্কনালীতে সংকোচন সৃষ্টি করতে পারে। মরফিন প্রয়োগে অত্যধিক antidiuretic হরমোন নিঃসরণের ফলে প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যেতে পারে। মরফিন শ্বাসনালীতে সংকোচন ঘটায়, তাই হাঁপানি রোগীদের এটি না দেওয়াই ভালো। মরফিন রক্তচাপ হ্রাস করে, নাড়ীর গতি হ্রাস করে। মরফিন কোষ্ঠকাঠিন্য করতে পারে। এটি রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। মরফিন প্লাসেন্টা দিয়ে বেরুতে পারে, তাই Caesarean section-এ দিলে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হতে পারে।

এই মরফিন লিভারে বিপাক হয়। এর বেশীর ভাগ প্রস্রাবের সংগে এবং কিছুটা পৌষ্টিক নালী দিয়ে বেরিয়ে যায়। মরফিন ঘাম, মুখের লালা এবং বুকের দুধের সংগেও বেরিয়ে যায়।

সাধারণভাবে মরফিন ০·২ মিলিগ্রাম প্রতি কে.জি. হিসাবে মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এটি শিরাপথেও দেওয়া যায়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে মরফিন খুব ভেবেচিন্তে দেওয়া উচিত। খুব শিশু এবং বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে, গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে, মরফিনে এলার্জি থাকলে, রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট থাকলে, অত্যধিক রক্তচাপ হ্রাস থাকলে, যাদের পিটুইটারি, এডরেনাল এবং থাইরয়েড গ্রন্থির অসুখ আছে এবং যে সব রোগী MAO inhibitor ওষুধ খাচ্ছে—এসবের ক্ষেত্রে মরফিন দিতে গেলে অনেক ভেবে চিন্তে দিতে হবে। একান্ত প্রয়োজনে কম মাত্রায় দেওয়া যেতে পারে। লিভারের অসুখে মরফিন দিলে রোগী অচৈতন্য হয়ে যেতে পারে। নিওষ্টিগমিন এবং ক্লোরপ্রোমাজিনের সংগে মরফিন দিলে মরফিনের কার্যকারিতা অনেক বেড়ে যায়।

পেথিডিন (Pethidine) :

এটি কৃত্রিমভাবে তৈরী মরফিনজাতীয় একটি ভালো ব্যথানাশক ওষুধ। এটি মরফিনের চেয়ে কম কার্যকরী। এটিও ঘুমের উদ্রেক করে। ভয়ভাবনা দূর করে এবং মনকে শান্ত করে। এতে শ্বাসপ্রশ্বাস হ্রাস পায়। এটি মস্তিষ্কের প্রেসার বাড়াতে পারে। এটিও নেশায় পরিণত হতে পারে।

পেথিডিন শ্বাসনালী, অন্ত্র, বৃক্কনালী এবং রক্তনালীর মাংসপেশীতে শিথিলতা আনে। অনেক সময় রক্তচাপ হ্রাস পায়, নাড়ীর গতিও কমতে পারে। পেথিডিন কখনও কোষ্ঠকাঠিন্য করে না।

এতে এট্রোপিনের মত কিছু কাজ হয়। মুখে শুকনো ভাব আসে। চোখের তারা বড় হতে পারে। এটি অনেক সময় হিষ্টামিন নিঃসরণ করায়। পেথিডিন প্লাসেন্টা দিয়ে বেরুতে পারে তাই Caesarean section-এ দিলে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হতে পারে।

পেথিডিন দেওয়ার পর অনেক সময় আলাদা উপসর্গ দেখা দেয়—যেমন অত্যধিক ঘাম হওয়া, অত্যধিক রক্তচাপ হ্রাস, বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, হাত পা ঝিন ঝিন করা ইত্যাদি।

পেথিডিন মাংসপেশীতে অথবা শিরাপথে ইঞ্জেকশন হিসাবে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ১ থেকে ২ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে দেওয়া হয়।

যে সব রোগী MAO inhibitor ওষুধ খায় তাদের পেথিডিন দিলে চৈতন্যলোপ, খিঁচুনি এবং এমন কি মৃত্যুও হতে পারে। লিভারের অসুখে,

পিটুইটারি, থাইরয়েড ইত্যাদি গ্রন্থির অসুখ থাকলে, শ্বাসপ্রশ্বাসের গণ্ডগোল থাকলে পেথিডিন খুব সাবধানে দিতে হয়।

পেথিডিনের শতকরা ৮০ ভাগ লিভারে নষ্ট হয়। মোটামুটি শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ অপরিবর্তিত অবস্থায় কিডনী দিয়ে বের হয়।

পেন্টাযোসিন (**Pentazocine**) :

এটি একটি আধুনিক ব্যথানাশক ওষুধ। ব্যথাউপশমের ক্ষেত্রে এর ৩০ মিলিগ্রাম, ১০ মিলিগ্রাম মরফিন এবং ১০০ মিলিগ্রাম পেথিডিনের সমতুল্য। এটিও পেথিডিন এবং মরফিনের মত শ্বাসপ্রশ্বাস কমায়। সব থেকে সুবিধা এই যে এটি নেশায় পরিণত হয় না। পেন্টাযোসিনে রক্তচাপ মোটামুটি ঠিকই থাকে। আবার অনেক সময় বেড়েও যেতে পারে। চোখের তারা ঠিকই থাকে। বমি প্রায় হয়ই না। কোষ্ঠকাঠিন্যও হয় না।

অত্যধিক মাত্রায় শ্বাসপ্রশ্বাস কমে গেলে nalorphine দিয়ে চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে nikethamide, naloxone অথবা methylphenidate দিয়েই চিকিৎসা করতে হয়।

সাধারণভাবে এই ওষুধ ০'৫ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এটি মুখ দিয়েও খাওয়ানো যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে ট্যাবলেট দেওয়া হয়। পূর্ণবয়স্কদের ৫০ মিলিগ্রাম এবং ৬ থেকে ১২ বৎসর বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে ২৫ মিলিগ্রাম দিলেই হয়।

ফেনাযোসিন (**Phenazocine**) :

এটিও একটি ভালো ব্যথানাশক ওষুধ। এর ৩ মিলিগ্রাম মরফিনের ১০ মিলিগ্রামের সমতুল্য। এতে বমি বা কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না। শ্বাসনালীর কোন সংকোচন ঘটায় না। পিত্তনালীর প্রেসার বাড়ে না। এটিও প্লাসেন্টা দিয়ে বের হওয়ার জন্য গর্ভস্থ শিশুর অবদমন ঘটাতে পারে। এটিও নেশায় পরিণত হতে পারে। MAO inhibitor গ্রুপের ওষুধ খাওয়া রোগীদের এই ফেনাযোসিন ওষুধ দেওয়া উচিত নয়। এতে যদি কখনও শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত হয়, তবে nalorphine দিয়ে ভালো চিকিৎসা করা যায়।

সাধারণতঃ ৩ মিলিগ্রাম হিসাবে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। মুখ দিয়ে খাওয়ালে ৫ মিলিগ্রাম দিতে হয়।

মেথাডোন (Methadone) :

এটি একটি সাদা রঙের পাউডার—জলে এবং অ্যালকোহলে মিশে যায়। এটি মরফিনের মত ব্যথা বেদনানাশক। এটি মুখ দিয়ে অথবা ইঞ্জেকশন হিসাবে দেওয়া যায়। এটি কাশি থামায়, কিডনীর ব্যথা কমায়, ঋতুস্রাবের ব্যথাও কমাতে সাহায্য করে। এটিও নেশায় পরিণত হতে পারে।

এই ওষুধের উপসর্গ হিসাবে মুখে শুকনো ভাব, মাথা ধরা, বমি; ঝিমুনি ইত্যাদি হতে পারে। নাড়ীর গতি কমে যেতে পারে। রক্তচাপও হ্রাস পেতে পারে। মাংসপেশীর সংকোচনে এই মেথাডোন ভালোভাবে কাজ করে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য করে না। এর প্রয়োগে বিশেষতঃ Caesarean section-এ, গর্ভস্থ শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হতে পারে।

সাধারণভাবে এর প্রয়োগ মাত্রা ৫ থেকে ১০ মিলিগ্রাম। এটি দীর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড ব্যথার চিকিৎসায় বিশেষ উপযোগী।

অক্সিমরফোন (Oxymorphone) :

এইটি মরফিনের মতই ব্যথানাশক ওষুধ। তবে এটি কাশি কমাতে খুব সাহায্য করে। এটিও নেশায় পরিণত হতে পারে। এতে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত খুবই কম হয়। অক্সিমরফোনের ১·৩৪ মিলিগ্রাম, ১০০ মিলিগ্রাম পেথিডিনের সমতুল্য। অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহার করলে নানা রকম উপসর্গ হতে পারে —শ্বাসপ্রশ্বাস কমে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে nalorphine দিয়ে চিকিৎসা করা যায়।

পূর্ণবয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে ১·৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়। তবে এটি বিশেষ ব্যবহার হয় না। এই ওষুধের গৌণ পদার্থ (derivative) naloxone খুবই ব্যবহার করা হয়।

লেভরফেনল (Levorphanol) :

এটি অনেক আগেকার দিনের ওষুধ—এখন বিশেষ ব্যবহার হয় না। তবে

মরফিনের চেয়েও বেশী কার্যকরী ব্যথানাশক ওষুধ। এটি মুখ দিয়ে খাওয়ানো হয় অথবা ইঞ্জেকশন হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। এর কার্যকারিতা মরফিনের চেয়ে বেশীক্ষণ থাকে। লেভরফেনলে খুব বেশী ঘুম আসে না। বমি হয় না। কাশিও কমায় না। এতে অন্ত্রে সংকোচন ঘটাতে পারে, সুতরাং আন্ত্রিক ব্যথায় এটি না দেওয়াই ভালো।

মুখ দিয়ে খাওয়ালে ২ থেকে ৪ মিলিগ্রাম দেওয়াই বিধেয়, আর ইঞ্জেকশন দিলে ১ থেকে ৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়।

এরই গৌণ পদার্থ levallorphan খুবই ব্যবহার করা হয়।

প্যাপাভেরিন (Papavarine) :

এটি আফিমের একটি উপক্ষার (alkaloid)। এর ব্যথা বেদনা উপশম করার ক্ষমতা খুবই কম। এটি শরীরের সমস্ত smooth মাংসপেশীর প্রসারণ ঘটায়। সুতরাং আন্ত্রিক সংকোচনে এটি ব্যবহার করা যায়। এটি রক্তনালীরও প্রসারণ ঘটায়। মস্তিষ্কে, শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজে এবং মেজাজের উপর প্যাপাভেরিনের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না।

এটি মোটামুটি ৩০ মিলিগ্রাম মাত্রায় খুব আস্তে শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। মুখ দিয়ে খাওয়ালে ১২০ থেকে ১৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া উচিত।

কোডিন (Codeine) :

এটি মিথাইল মরফিন। এতে মরফিনের অনেক গুণই আছে। ব্যথা বেদনা-উপশমের ক্ষেত্রে মরফিনের চেয়ে এক চতুর্থাংশ কার্যকরী। সাধারণতঃ এটি শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত করে না। কোষ্ঠকাঠিন্য কমই করে। এতে বমিও কম হয়। কিন্তু কাশি কমানোর ক্ষেত্রে কোডিন মরফিনের চেয়ে অনেক গুণ ভালো। এটি খুব একটা নেশায় পরিণত করে না।

সাধারণভাবে ১৫ থেকে ৬০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়। তবে ৬০ মিলি-গ্রামের বেশী মাত্রায় বাড়ালে ব্যথাউপশম আরও বেশী করতে পারে না।

ডাইহাইড্রোকোডিন (Dihydrocodeine) :

এই ওষুধের ব্যথাউপশম করার ক্ষমতা অনেক বেশী। এর ব্যবহারিক

কুফলও অনেক কম। এতে বমি বড় একটা হয় না এবং শ্বাসপ্রশ্বাসও ব্যাহত হয় না। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর প্রায় ৪ ঘন্টার মত ব্যথাউপশম হয়ে থাকে। তবে এর প্রয়োগে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে।

এটি মুখ দিয়ে অথবা ইঞ্জেকশন দিয়ে ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ ৩০ থেকে ৬০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়। এটি ট্যাবলেট হিসাবেও পাওয়া যায়। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথাউপশমের জন্য এর ব্যাপক ব্যবহার আছে।

হিরোইন (Heroin) :

এটি আসলে ডাই-এসিটিল মরফিন। এটি মেজাজে খুব ফুর্তি আনে, সুতরাং এটি নেশায় পরিণত হতে পারে। এটি মরফিনের চেয়ে দ্বিগুণ ব্যথা-উপশম করতে পারে। তবে এটি শ্বাসপ্রশ্বাসও কমিয়ে দিতে পারে। হিরোইন রোগীর কাশি কমায়। বমি হতে পারে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যও হয়। এটি ভালো-ভাবে ভয় ভাবনা দূর করতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনার ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ দেয়। কোকেনের সংগে ব্যবহার করলে আরও সুফল পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ ২˙৫ থেকে ১০ মিলিগ্রাম মাত্রায় ব্যবহার করা হয়। ইঞ্জেকশন দিলে ৩ থেকে ৬ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া উচিত।

প্যাপাভেরেটাম (Papaveratum) :

এতে আফিমের অনেক উপক্ষার এক সংগে থাকে। এই সব উপক্ষারের মধ্যে মরফিন (শতকরা ৫০ ভাগ), কোডিন, থিবেন, নারকোটিন এবং প্যাপাভেরিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণভাবে ২০ মিলিগ্রাম প্যাপাভেরেটাম, ১৩˙৩ মিলিগ্রাম মরফিনের সমতুল্য। এই ওষুধ মোটামুটি ভালোভাবেই ব্যথাউপশম করতে পারে। তবে মরফিনের মত এতে অন্য উপসর্গও হতে পারে।

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে ১০ থেকে ২০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে ০˙২৫ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে দেওয়া যেতে পারে।

ডেক্সট্রোপ্রোপক্সিফেন (Dextropropoxyphene) :

এটিও মেথাডোনের মত ব্যথাউপশমকারী ওষুধ। অনেক সময় এই ওষুধ প্যারাসিটামল (paracetamol) ওষুধের সংগে ব্যবহার করা হয়। মেথাডোনের

চেয়ে এর কার্যকারিতা কম। এটির ব্যবহারে খুব কমই অভ্যাসে পরিণত হয়। সাধারণভাবে এটি ৬৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়। এটি কেফিন, অ্যাসপিরিন এবং ফেনাসিটিনের সংগে ট্যাবলেট হিসাবেও ব্যবহার হয়।

ফেনোপেরিডিন (Phenoperidine) :

এটিও খুব ভালো ধরনের ব্যথানাশক ওষুধ। কিন্তু এটিও শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ ব্যাহত করতে পারে। ফেনোপেরিডিনের কার্যকারিতা অনেকক্ষণ স্থায়ী থাকে। এটির প্রয়োগে রোগীর ঘুম আসে না। এতে বমি হতে পারে। চোখের তারা ছোট হয়ে যায়।

ফেনোপেরিডিন সাধারণতঃ ১ থেকে ২ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়। ফেনো-পেরিডিন লিভারে বিপাক হয় এবং প্রস্রাবের সংগে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

ফেন্টানিল (Fentanyl) :

এটিও মরফিনের মত খুব ভালো ব্যথানাশক ওষুধ। বলা হয় এটি মরফিনের চেয়ে ১০০ গুণ এবং পেথিডিনের চেয়ে ৭৫০ গুণ বেশী কার্যকরী। সুতরাং ০·১ মিলিগ্রাম ফেন্টানিল মোটামুটিভাবে ১০ মিলিগ্রাম মরফিন এবং ৭৫ মিলিগ্রাম পেথিডিনের সমতুল্য।

ফেন্টানিল শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। অনেক সময় এটি মাংসপেশীসমূহে টান সৃষ্টি করে। ফেন্টানিল পিত্তনালীতে প্রেসার বাড়াতে পারে। এটি মস্তিষ্কের প্রেসারও বাড়াতে পারে। এর প্রয়োগে নাড়ীর গতি কমে যায়। হৃৎপিন্ড মোটামুটি ভালোই থাকে—কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না।

ফেন্টানিল শিরাপথে ০·০৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় দিলে ২ বা ৩ মিনিটের মধ্যে কার্যকর হয়—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ব্যথাউপশম করে এবং আধ ঘন্টার মত কার্য-করী থাকে। অত্যধিক ফেন্টানিল প্রয়োগে শ্বাসপ্রশ্বাস কমে গেলে naloxone দিয়ে চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়।

স্যালিসিলেট (Salicylate) :

স্যালিসিলেট কোডিনের চেয়ে ব্যথাউপশমকারী হিসাবে কম কার্যকরী।

এসিটিল স্যালিসিলিক এসিড—অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট হিসাবে খুবই ব্যাপক ব্যবহার করা হয়—বিশেষতঃ মাথাব্যথার ক্ষেত্রে এবং মাংসপেশীতে ব্যথার ক্ষেত্রে। স্যালিসিলেট জ্বর কমাতে সাহায্যে করে, শরীরে ঘাম নিঃসরণ হয়। অবশ্য স্যালিসিলেট বিষক্রিয়ায় রোগীর অত্যধিক জ্বর হতে পারে।

স্যালিসিলেট প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি কিছুটা বেড়ে যায়। এটি রক্তের শর্করার মাত্রা কমায়। বেশী মাত্রায় স্যালিসিলেট দিলে রক্তের কোলেস্টরল মাত্রাও কমে যায়।

রক্তের ইউরিক এসিডও কমে যায়, তাই gout বা গেঁটে বাতের রোগীর পক্ষে এটি খুবই ভালো ওষুধ এবং এতে বাতের ব্যথাও কমে যায়।

অ্যাসপিরিন ব্যবহারে কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বুক জ্বালা, পেটে ব্যথা, বমি ইত্যাদি এবং এমন কি রক্তবমিও হতে পারে। Peptic ulcer বা পাকস্থলীর ক্ষত থাকলে এই ওষুধ না ব্যবহার করাই উচিত।

অ্যাসপিরিন হচ্ছে এসিটিল স্যালিসিলিক এসিড। এর সংগে ফেনাসিটিন, কোডিন এবং কেফিন দিয়ে নানা ধরনের ট্যাবলেট বাজারে পাওয়া যায়। মাথা-ধরা এবং ব্যথা বেদনাউপশমকারী হিসাবে এর যথেচ্ছ ব্যবহার আছে। অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট দৈনিক ৩০০ থেকে ৯০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া যেতে পারে। রিউ-ম্যাটয়েড আথ্রাইটিসে অবশ্য অনেক বেশী মাত্রায় দেওয়া হয়।

ফেনাসিটিন (Phenacetin) :

ফেনাসিটিনও ভালোভাবে ব্যথাউপশম করতে পারে। কিন্তু আনুষংগিক অনেক কুফল থাকার জন্য আজকাল আর এর ব্যবহার হয় না। এটি সাধারণতঃ অন্য ওষুধের সংগে ব্যবহার করা হতো। এটি জ্বর কমাতেও সাহায্য করে। অ্যাসপিরিন, কেফিন বা কোডিনের সংগে ব্যবহার করা হয়।

ফেনাসিটিন ব্যবহারে কিডনীর কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে এবং এর ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

প্যারাসিটামল (Paracetamol) :

প্যারাসিটামল ফেনাসিটিনের এক বিপাকীয় পদার্থ এবং এটি একটি ভালো ব্যথানিবারক ওষুধ। এটি ফেনাসিটিনের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী এবং এর

আনুষংগিক কুফলও অনেক কম। এটিতে বমি হয় না এবং পাকস্থলীতে বিশেষ কোন গন্ডগোল সৃষ্টি করে না। তবে এর অত্যধিক ব্যবহারে haemolysis হতেও পারে। প্যারাসিটামল প্রদাহ কমাতে পারে না।

প্যারাসিটামল জ্বরে ব্যবহার করা হয়, কেননা এটি শরীরের অত্যধিক তাপ মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এটি ০·৫ গ্রামের ট্যাবলেট হিসাবে পাওয়া যায়। দিনে দুবার বা তিনবার খেতে দেওয়া যায়।

কিন্তু অত্যধিক মাত্রায় খেলে মৃত্যুও হতে পারে। অনেকে আত্মহত্যার কারণেও এই প্যারাসিটামল খায়। ১২ থেকে ১৪টি ট্যাবলেট খেলেই মৃত্যু হতে পারে। সাধারণতঃ এর বিষক্রিয়া লিভারের উপরই প্রতিফলিত হয় এবং তাতেই মৃত্যু ঘটে।

Narcotic antagonists :

অত্যধিক নার্কোটিক (narcotic) ওষুধের প্রভাবে অনেক সময় রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে, শ্বাসপ্রশ্বাস কমে যায় এবং রক্তচাপ হ্রাস পায়। এতে মৃত্যুও ঘটতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে কিছু narcotic antagonist খুব সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে nalorphine, levallorphan এবং naloxone সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মরফিন, পেথিডিন ইত্যাদির antagonist হিসাবে nalorphine ব্যবহার করা হয়। এটিরও অল্প ব্যথাউপশমকারী ক্ষমতা আছে। এটিও ভালো sedative। এটি অভ্যাসে পরিণত হয় না। এটি প্লাসেন্টা দিয়েও বের হতে পারে। সঠিক মাত্রায় দিলে, নার্কোটিক ওষুধের জন্য ব্যাহত শ্বাসক্রিয়া এবং রক্তচাপ হ্রাস আবার ঠিক হয়ে যেতে পারে। আফিম এবং নার্কোটিক ওষুধের বিষক্রিয়ায় এটির ব্যাপক ব্যবহার হয়। সাধারণভাবে ৫ থেকে ১০ মিলিগ্রাম মাংসপেশীতে অথবা শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

Levallorphanও একটি ভালো narcotic antagonist। এটি nalorphine-এর মতই কাজ করে এবং আরও বেশী ব্যথা বেদনাউপশম করতে পারে। এটি nalorphine-এর চেয়ে ৬ গুণ বেশী কার্যকরী। এটিও অভ্যাসে পরিণত হয় না। তবে প্লাসেন্টা দিয়ে বেরুতে পারে। আফিম এবং নার্কোটিক বিষক্রিয়ায় এর ব্যবহার আছে। সাধারণভাবে ১ থেকে ৩ মিলিগ্রাম মাত্রায় শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

Naloxone একটি আধুনিক এবং কার্যকরী narcotic antagonist। এটি nalorphine এবং levallorphan-এর চেয়ে ভালোভাবে কাজ করে। এটি আফিম এবং নার্কোটিক বিষক্রিয়া ছাড়াও পেন্টাযোসিন এবং ডেক্সট্রোপ্রোপক্সিফেনের বিষক্রিয়ায় ব্যবহার করা যায়। এটি ব্যথাউপশম করে না, মেজাজে স্ফূর্তি আনে না এবং শ্বাসপ্রশাস ব্যাহত করে না। সাধারণভাবে ০·০১ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে শিরাপথে দেওয়া হয়। তবে ২০ মিনিটের মধ্যেই এর কাজ শেষ হয়ে যায়, তাই পরে আবার দিতে হতে পারে।

আনুষংগিক কুফলও অনেক কম। এটিতে বমি হয় না এবং পাকস্থলীতে বিশেষ কোন গন্ডগোল সৃষ্টি করে না। তবে এর অত্যধিক ব্যবহারে haemolysis হতেও পারে। প্যারাসিটামল প্রদাহ কমাতে পারে না।

প্যারাসিটামল জ্বরে ব্যবহার করা হয়, কেননা এটি শরীরের অত্যধিক তাপ মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এটি ০·৫ গ্রামের ট্যাবলেট হিসাবে পাওয়া যায়। দিনে দুবার বা তিনবার খেতে দেওয়া যায়।

কিন্তু অত্যধিক মাত্রায় খেলে মৃত্যুও হতে পারে। অনেকে আত্মহত্যার কারণেও এই প্যারাসিটামল খায়। ১২ থেকে ১৪টি ট্যাবলেট খেলেই মৃত্যু হতে পারে। সাধারণতঃ এর বিষক্রিয়া লিভারের উপরই প্রতিফলিত হয় এবং তাতেই মৃত্যু ঘটে।

Narcotic antagonists :

অত্যধিক নার্কোটিক (narcotic) ওষুধের প্রভাবে অনেক সময় রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে, শ্বাসপ্রশ্বাস কমে যায় এবং রক্তচাপ হ্রাস পায়। এতে মৃত্যুও ঘটতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে কিছু narcotic antagonist খুব সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে nalorphine, levallorphan এবং naloxone সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মরফিন, পেথিডিন ইত্যাদির antagonist হিসাবে nalorphine ব্যবহার করা হয়। এটিরও অল্প ব্যথাউপশমকারী ক্ষমতা আছে। এটিও ভালো sedative। এটি অভ্যাসে পরিণত হয় না। এটি প্লাসেন্টা দিয়েও বের হতে পারে। সঠিক মাত্রায় দিলে, নার্কোটিক ওষুধের জন্য ব্যাহত শ্বাসক্রিয়া এবং রক্তচাপ হ্রাস আবার ঠিক হয়ে যেতে পারে। আফিম এবং নার্কোটিক ওষুধের বিষক্রিয়ায় এটির ব্যাপক ব্যবহার হয়। সাধারণভাবে ৫ থেকে ১০ মিলিগ্রাম মাংসপেশীতে অথবা শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

Levallorphanও একটি ভালো narcotic antagonist। এটি nalorphine-এর মতই কাজ করে এবং আরও বেশী ব্যথা বেদনাউপশম করতে পারে। এটি nalorphine-এর চেয়ে ৬ গুণ বেশী কার্যকরী। এটিও অভ্যাসে পরিণত হয় না। তবে প্লাসেন্টা দিয়ে বেরুতে পারে। আফিম এবং নার্কোটিক বিষক্রিয়ায় এর ব্যবহার আছে। সাধারণভাবে ১ থেকে ৩ মিলিগ্রাম মাত্রায় শিরাপথে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

Naloxone একটি আধুনিক এবং কার্যকরী narcotic antagonist। এটি nalorphine এবং levallorphan-এর চেয়ে ভালোভাবে কাজ করে। এটি আফিম এবং নার্কোটিক বিষক্রিয়া ছাড়াও পেন্টাযোসিন এবং ডেক্সট্রোপ্রোপক্সি-ফেনের বিষক্রিয়ায় ব্যবহার করা যায়। এটি ব্যথাউপশম করে না, মেজাজে ফূর্তি আনে না এবং শ্বাসপ্রশাস ব্যাহত করে না। সাধারণভাবে ০·০১ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে শিরাপথে দেওয়া হয়। তবে ২০ মিনিটের মধ্যেই এর কাজ শেষ হয়ে যায়, তাই পরে আবার দিতে হতে পারে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আনুষংগিক ঔষধপত্র

অনেম সময় একটি মাত্র ব্যথানাশক ওষুধ দিলে ব্যথা যতটা নিবারণ হয়, এর সংগে অন্য আর একটি ওষুধ দিলে ব্যথানিবারণ আরও ভালো হয়। এমন কি এতে প্রথমোক্ত ওষুধের পরিমাণ অনেক কম লাগতে পারে এবং তার ফলে সেই ওষুধের আনুষংগিক উপসর্গও অনেক কম হয়। মরফিন বা ঐ জাতীয় নার্কোটিক ওষুধের সংগে hydroxyzine বা dextro amphetamine দিলে ব্যথাউপশম আরও সুচারুভাবে হয় এবং মরফিনের পরিমাণও অনেক কম লাগে। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনার ক্ষেত্রে রোগীর মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ থাকে, সুতরাং ব্যথানিবারক ওষুধের সংগে ভয় ভাবনা নিবারক ওষুধ যেমন ডায়াজিপাম দিলে অনেক সময় খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। Phenothiazine গ্রুপের ওষুধ অনেক সময় অন্য ওষুধের সংগে ব্যাপক ব্যবহার করা হয়।

আবার মূল অসুখের চিকিৎসা হিসাবে যদি কোন ওষুধ দেওয়া হয়, তবে ব্যথাউপশম আরও নিপুণ হতে পারে। গেঁটে বাতের ক্ষেত্রে ব্যথাউপশমকারী ওষুধের সংগে যাতে রক্তে ইউরিক এসিডের লেভেল কমে তাও দেখতে হবে।

এই অধ্যায়ে কিছু আনুষংগিক এই ধরনের ওষুধের কথা বিবেচনা করা হবে।

ডায়াজিপাম (**Diazepam**) :

এটি benzodiazepine গ্রুপের ওষুধ। এটি মস্তিষ্ককে অবদমন করে। ভয় ভাবনা দূর করে, মানসিক চাপ কমায়, ঘুম পাড়ায় এবং মনে প্রশান্তি আনে। এটি মাংসপেশীসমূহ শিথিলতা আনে। এটি নিজে কিন্তু ব্যথানিবারণ করতে পারে না। তবে অন্য ব্যথাউপশমকারী ওষুধের সংগে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এটি শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটায় না। রক্তচাপ এবং নাড়ীর গতিপ্রকৃতি মোটামুটি ঠিকই থাকে। ডায়াজিপামে বমি হয় না। এতে অভ্যাসও হয় না।

এটি মুখ দিয়ে, মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন দিয়ে অথবা শিরাপথে দেওয়া যায়। মুখে দিলে ৫ মিলিগ্রাম দিনে তিনবার দেওয়া হয়। ইঞ্জেকশন ১০ মিলিগ্রাম অ্যাম্পুলে পাওয়া যায়। এতে convulsion বা খিঁচুনি কমে যায়। অত্যধিক মাত্রায় দিলে রোগী অচৈতন্য হয়ে যেতে পারে।

লোরাজিপাম (Lorazepam) :

এটিও ভয় ভাবনা দূর করে, ঘুম পাড়ায় এবং মনকে শান্ত করে। এতে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত হয় না। রক্তচাপ এবং নাড়ীর গতিপ্রকৃতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটায় না। এটিও মুখ দিয়ে খাওয়ানো যায়, অবার ইঞ্জেকশনও দেওয়া যায়। সাধারণতঃ ২ থেকে ৪ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়।

নাইট্রাজিপাম (Nitrazepam) :

এটি একটি ভালো ঘুমের ওষুধ। এটিও ডায়াজিপামের মতই কার্যকরী। এটি সাধারণতঃ মুখ দিয়েই খাওয়ানো হয়। পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে ৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়। তবে খাদ্যতন্ত্র থেকে এটি শোষিত হয় খুবই ধীরে। অত্যধিক মাত্রায় দিলে রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়তে পারে।

ক্লোরডায়াজিপক্সাইড (Chlordiazepoxide) :

এটিও benzodiazepine গ্রুপের ওষুধ। এটিও ভয়ভাবনা এবং মানসিক চাপ দূর করে। এটি ডায়াজিপামের মতই কার্যকরী। এটি খিঁচুনিতেও ভালো কাজ করে।

তবে অনেক সময় কিছু আনুষংগিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে—যেমন অত্যধিক ঝিমুনি, আবোল তাবোল বকা, রক্তচাপ হ্রাস, শারীরিক দুর্বলতা, চামড়ায় আমবাত, এলার্জি ইত্যাদি।

মানসিক চিকিৎসায় এর ব্যাপক ব্যবহার হয়। সাধারণতঃ মুখে ২ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে এবং মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশনে ১ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে দেওয়া হয়।

হ্যালোপেরিডল (Haloperidol) :

এটি butyrophenone গ্রুপের ওষুধ। এটি খুব ভালোভাবে বমি নিবারণ

করতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মাংসপেশীসমূহে টান সৃষ্টি করে। এটি হৃৎপিন্ড এবং রক্তনালীতে বিশেষ খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। যদিও এটি কাশি কমাতে সাহায্য করে, শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত কিন্তু হয় না।

এটি মনকে শান্ত করে, মস্তিষ্ককে অবদমিত করে। ব্যথা বেদনাউপশমকারী ওষুধের এবং বারবিচুরেট ওষুধের কার্যকারিতাকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। এতে অত্যধিক লালা নিঃসরণ (salivation) হয়।

এটি লিভারে বিপাক হয় এবং কিছুটা প্রস্রাবের সংগে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। এটি লিভারের অসুখ থাকলে, পক্ষাঘাত (paraplegia) অথবা multiple sclerosis থাকলে প্রয়োগ করা উচিত নয়। সাধারণভাবে ৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় মাংশপেশীতে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ফেনোপেরিডিনের সংগে হ্যালোপেরিডল দিয়ে neuroleptanalgesia করা হয়।

ড্রোপেরিডল (Droperidol) :

এটি একটি ভালো শান্তকারক (sedative) ওষুধ। এটি ভয়ভাবনা দূর করে। এটি বমি হতে দেয় না। অবশ্য অনেক সময় রক্তচাপ হ্রাস পেতে পারে। এটি fentanyl-এর এবং মরফিন বা পেথিডিনের ব্যথানাশক ক্রিয়াকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। এটি অনেকক্ষণ স্থায়ী ব্যথাউপশম করে। ৪ থেকে ১২ ঘন্টা রোগী ব্যথা মুক্ত থাকতে পারে।

ড্রোপেরিডল মুখ দিয়ে ০˙২ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে এবং মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশনে ০˙১ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে দেওয়া হয়। অন্যান্য আনুষংগিক উপসর্গের মধ্যে মাংসপেশীতে টান, খিঁচুনি, অবসাদ ইত্যাদি হতে পারে। ফেনোপেরিডিনের সংগে ড্রোপেরিডল দিয়েও neuroleptanalgesia করা হয়।

হাইড্রোক্সিজিন (Hydroxyzine) :

এই ওষুধ মানসিক চাপ কমায় এবং ভয়ভাবনা দূর করে। এটি ব্যথা বেদনাউপশম করে এবং বমি নিবারণ করে। মরফিন এবং পেথিডিনের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটি মস্তিষ্কের অবদমন ঘটায়। সাধারণতঃ ১˙৫ থেকে ২ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে এই ওষুধ মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। প্রধানতঃ বমিনিবারক হিসাবেই এর ব্যবহার সুপরিচিত।

প্রোমেথাজিন (Promethazine) :

প্রোমেথাজিন ফেনোথিয়াজিন গ্রুপের একটি ওষুধ। এটি ভালো ঘুম আনে এবং মানসিক চাপ দূর করে। এটিও ভালো বমিনাশক। সুতরাং মরফিন বা পেথিডিনের সংগে দিলে বমি হবার আশংকা থাকে না। এটি রক্তচাপ মোটামুটি ঠিকই রাখে। নাড়ীর গতিপ্রকৃতি খুব একটা পরিবর্তন হয় না—তবে অল্প বৃদ্ধি হতে পারে। এটি মুখে শুকনো ভাব আনে। প্রোমেথাজিন মস্তিষ্কের reticular activating system এবং hypothalamus-কে অবদমন করে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি অল্প বাড়তে পারে। শ্বাসনালীর মাংসপেশীর প্রসারণ ঘটায়। প্রোমেথাজিনের নিজের কোন ব্যথানাশক ক্ষমতা নেই, উপরন্তু এটির প্রয়োগে ব্যথা অনুভূতি বেড়ে যায়। তবে মরফিন বা পেথিডিনের সংগে দিলে এদের কার্যকারিতা অনেক বেড়ে যায়।

প্রোমেথাজিন মুখ দিয়ে খাওয়ানো যায়, আবার ইঞ্জেকশন হিসাবেও দেওয়া যায়। সাধারণতঃ পূর্ণবয়স্কদের জন্য ২৫ মিলিগ্রাম এবং শিশুদের ক্ষেত্রে ১ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে দেওয়া হয়। নার্কোটিক (narcotic) ওষুধের সংগে দিলে ব্যথাউপশম খুবই ভালো হয় এবং নার্কোটিক ওষুধের মাত্রাও কম লাগে।

পারফেনাজিন (Perphenazine) :

এটিও ফেনোথিয়াজিন গ্রুপের ওষুধ। এটি ক্লোরপ্রোমাজিনের চেয়ে ৫ গুণ বেশী কার্যকরী এবং এর আনুষংগিক কুফলও অনেক কম। এটি খুব ভালোভাবে বমি নিবারণ করে। তবে এটি গর্ভাবস্থার প্রথম ৩ মাসে না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এটি লিভারে এবং রক্তে বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। পারফেনাজিন খুব ভালো sedative ওষুধ এবং এটি মস্তিষ্ককে অবদমন করে। সাধারণতঃ ২.৫ থেকে ৫ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশন হিসাবে দেওয়া হয়।

ক্লোরপ্রোমাজিন (Chlorpromazine) :

এটি ফেনোথিয়াজিন গ্রুপের ওষুধ। এই ওষুধ মস্তিষ্ককে অবদমন করে। এটি মানসিক চাপ কমায়, মনকে শান্ত করে এবং ঘুম পাড়ায়। এটি অন্যান্য ঘুমের ওষুধ, ব্যথানাশক ওষুধ, অ্যানেস্থেসিয়ার ওষুধ এবং মাংসপেশী শিথিল-

কারী ওষুধের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। ক্লোরপ্রোমাজিন মস্তিষ্কস্থিত তাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রকেও অবদমন করে। কেন্দ্রীয় sympathetic activity কমে যায়।

ক্লোরপ্রোমাজিন রক্তনালীর প্রসারণ ঘটায় এবং তার ফলে রক্তচাপ কমে যেতে পারে। নাড়ীর গতি বৃদ্ধি হতে পারে। শ্বাসপ্রশ্বাস মোটামুটি ঠিকই থাকে, তবে অল্প কমে যেতে পারে। শ্বাসনালীতে secretion কমে যায়। এটি বমি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। মাংসপেশীসমূহে শিথিলতা আনে। এটির প্রয়োগে কাঁপুনি হতে দেয় না। এটি এট্রোপিনের মত মুখে শুকনো ভাব আনে। অল্প anti-histaminic কার্যকারিতা আছে।

ক্লোরপ্রোমাজিন পাকস্থলী এবং অন্ত্র থেকে ভালোই শোষিত হয়। এটি লিভারে বিপাক হয় এবং মলে ও প্রস্রাবের সংগে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। সাধারণতঃ ২৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় মুখ দিয়ে বা ইঞ্জেকশনে দেওয়া হয়।

বহুদিন ক্লোরপ্রোমাজিন ব্যবহারের ফলে কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে। লিভারে গন্ডগোল হতে পারে, চামড়ায় প্রদাহ হতে পারে, রক্তে agranulocytosis হতে পারে। ঝিমুনি, শারীরিক দুর্বলতা, রক্তচাপ হ্রাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, Parkinsonian syndrome ইত্যাদিও হতে পারে।

ক্লোরপ্রোমাজিন সাধারণতঃ মানসিক ব্যাধিতে ব্যাপক ব্যবহার হয়। বমি প্রতিরোধ এবং নিবারণের জন্যও এর ব্যবহার খুবই প্রচলিত। অন্যান্য ব্যথা-উপশমকারী ওষুধের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য এক সংগে ক্লোরপ্রোমাজিন প্রয়োগ করা হয়।

ট্রাইফ্লুওপ্রোমাজিন (Trifluopromazine) :

এটি অনেকটা ক্লোরপ্রোমাজিনের মত কার্যকরী ওষুধ। এটিও ভালোভাবে বমি নিবারণ করতে পারে, ভালোভাবে ঘুম আনতে পারে। এটি vasomotor tone কমানোর জন্য রক্তচাপ হ্রাস করে। দেহের তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে। শরীরে বিপাকীয় হারও কমে।

ট্রাইফ্লুওপ্রোমাজিন ব্যথাউপশমকারী ওষুধের, বারবিচুরেট, অন্যান্য অ্যানেস্থেসিয়ার ওষুধের কার্যকারিতা বাড়ায়। এই ওষুধ মানসিক ব্যাধিতে ব্যাপক ব্যবহার হয়। বমি নিবারক হিসাবেও ব্যবহার হয়। সাধারণতঃ ৫ থেকে ১০ মিলিগ্রাম মাত্রায় মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে ০·২ মিলিগ্রাম প্রতি কে.জি. হিসাবে দেওয়া যেতে পারে।

আনুষংগিক উপসর্গ হিসাবে রক্তচাপহ্রাস, মুখের শুকনো ভাব, Parkinsonism হতে পারে। জণ্ডিস (ন্যাবা) বা agranulocytosis সাধারণতঃ হয় না।

প্রোপিওম্যাজিন (Propiomazine) :

এটিও ফেনোথিয়াজিন গ্রুপের একটি ভালো ঘুমের ওষুধ। এটির প্রোমেথাজিনের সংগে অনেক সাদৃশ্য আছে। এটিও বমি নিবারণ করতে পারে। এটি হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালীর উপর বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে না। রক্তচাপ মোটামুটি ঠিকই থাকে। নাড়ীর গতি অপরিবর্তিতই থাকে।

তবে এর anticholinergic এবং antihistaminic কার্যকারিতা খুবই কম। সাধারণতঃ ২০ থেকে ৪০ মিলিগ্রাম মাত্রা মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন হিসাবে দেওয়া হয়।

প্রোমাজিন (Promazine) :

এটিও ফেনোথিয়াজিন গ্রুপের ওষুধ। এটি ক্লোরপ্রোমাজিনের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ কার্যকরী। এর আনুষংগিক উপসর্গ খুব একটা হয় না। এটি রক্তচাপহ্রাস ঘটায় না। এতে লিভারের কার্যক্ষমতা কমে না। রক্তে agranulocytosis সাধারণতঃ করে না। বমি হয় না। মানসিক চাপ কমায়।

এটি একটি ভালো শান্তকারক (sedative) ওষুধ। সাধারণতঃ ২৫ থেকে ৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় ইঞ্জেকশন হিসাবে দেওয়া হয়।

প্রোক্লোরপেরাজিন (Prochlorperazine) :

প্রোক্লোরপেরাজিন একটি ভালো বমিনিবারক ওষুধ। সেদিক থেকে এটি ক্লোরপ্রোমাজিন এবং প্রোমেথাজিনের চেয়েও বেশী কার্যকরী। এটির antihistaminic এবং spasmolytic কার্যকারিতা খুবই কম। রক্তচাপ মোটামুটি ঠিকই থাকে। এটিও বারবিচুরেট এবং অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে। প্রেক্লোরপেরাজিন শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি ব্যাহত করে না।

প্রোক্লোরপেরাজিন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বমি উপশমের জন্যই ব্যবহার করা হয়। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে, শিশুদের বমিতে এবং অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী

বমনের ক্ষেত্রে এই ওষুধ বিশেষভাবে উপযোগী। এটি মাইগ্রেনে এবং মানসিক ব্যাধিতেও ব্যাপক ব্যবহার হয়। বহুদিন ব্যবহার করলেও এর আনুষংগিক উপসর্গ খুব একটা দেখা যায় না। ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে অন্য ব্যথানিবারক ওষুধের সংগে প্রোক্লোরপেরাজিনও ব্যবহার করা হয়।

সাধারণতঃ প্রোক্লোরপেরাজিন ১২˙৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে ইঞ্জেকশন হিসাবে দেওয়া হয়। ট্যাবলেট হিসাবে মুখ দিয়েও খাওয়ানো চলে। শিশুদের ক্ষেত্রে ২˙৫ থেকে ৫ মিলিগ্রাম মাত্রা মুখ দিয়ে খাওয়ানো হয়।

ক্লোরাল হাইড্রেট (Chloral hydrate) :

এটি আসলে একটি ঘুমের ওষুধ। এটির সলিউশন মুখ দিয়ে খাওয়ানো হয়। কিন্তু এটির স্বাদ অত্যন্ত খারাপ এবং এটি পাকস্থলীর ক্ষতি করে। এই ওষুধ অন্ত্র থেকে ভালোই রক্তে শোষিত হয় এবং খাওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যেই ঘুম আসে। সাধারণভাবে ঘুম ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এটি লিভার এবং কিডনিতে বিপাক হয়। এর বিপাকীয় পদার্থ trichloroethanol-ও খুবই ভালো ঘুমের ওষুধ।

ঘুমের জন্য এই ওষুধ ০˙৫ থেকে ২ গ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়। ক্লোরাল হাইড্রেট লিভার এবং কিডনির অসুখে এবং পাকস্থলীর ক্ষত থাকলে ব্যবহার করা উচিত নয়।

মেপ্রোবামেট (Meprobamate) :

এটিও ভালো ঘুমের ওষুধ এবং শান্তকারক ওষুধ (sedative)। এটি মনকেও শান্ত করে। ঘুমের জন্য মুখ দিয়েই এই ওষুধ খাওয়ানো হয়। সাধারণতঃ ৪০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় এটি খাওয়ানো হয়। তবে কখনও কখনও Parkinsonian tremor এবং myoclonic epilepsy হতে পারে। এটি ডায়াজিপাম বা ঐ জাতীয় ওষুধ থেকে কম কার্যকরী। এটি এখন আর বিশেষ ব্যবহার হয় না।

গ্লুটেথিমাইড (Glutethimide):

এটিও ঘুমের ওষুধ। মুখ দিয়েই খাওয়ানো হয়। সাধারণতঃ ২৫০

থেকে ৫০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়। এটি প্রায় ৬ ঘণ্টার মত কার্যকরী থাকে।

এই ওষুধেও খিঁচুনি হতে পারে। স্নায়ুতন্ত্রে এবং রক্তে গণ্ডগোল হতে পারে। এটি অভ্যাসেও পরিণত হতে পারে। অত্যধিক সেবনে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। এর বিষক্রিয়ায় রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে, খিঁচুনি হয়, papilloedema হয়। মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ প্রেশার বেড়ে যায় এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটে।

মেথাকুয়ালোন (Methaqualone):

এটি ঘুমের ওষুধ। সাধারণতঃ ঘুমের জন্য ১৫০ থেকে ৪ ০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়। এটি প্রায় ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার মত কার্যকরী থাকে।

মেথাকুয়ালোন ২৫০ মিলিগ্রামের সংগে ২৫ মিলিগ্রাম ডাইফেন হাইড্রামিন মিশিয়ে ম্যানড্রাক্স (mandrax) তৈরী হয়। এটিও ঘুমের ওষুধ হিসাবে ব্যবহার হতো। কিন্তু এটিতে অনেক খারাপ উপসর্গ দেখা দেয় এবং কুঅভ্যাসে পরিণত হতে পারে। এ সবের জন্য এই ওষুধ এখন আর ব্যবহার করা হয় না।

অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহার করলে মাংসপেশীতে টান ধরে এবং অনেক সময় খিঁচুনি হতে পারে। ফুসফুসীয় শোথ (pulmonary oedema) এবং হৃৎস্পন্দনের ছন্দবৈকল্য (cardiac irregularities) হতে পারে। রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা কমে যায় এবং অনেক সময় জীবন সংশয় হয়।

প্যারালডিহাইড (Paraldehyde) :

এটি একটি নিরাপদ এবং ভালো ঘুমের ওষুধ। কিন্তু এটির গন্ধ অতি খারাপ। এটি একটি দাহ্য পদার্থ কিন্তু কখনও বিস্ফোরণ ঘটায় না। এটি ৫ থেকে ১০ মিলিলিটার মাত্রায় মুখ দিয়ে অথবা ইঞ্জেকশন হিসাবে দেওয়া হয়। গুহ্যদ্বারপথেও এটি দেওয়া যায়। অত্যধিক মাত্রায় দিলে রোগী অচৈতন্য হয়ে যেতে পারে। খাওয়ার ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যেই ঘুম আসে এবং তা থাকে প্রায় ৮ ঘণ্টার মত।

প্যারালডিহাইড ১০ থেকে ৩০% শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে শরীর থেকে বেরিয়ে

যায় এবং সে সময় এই ওষুধের গন্ধও পাওয়া যায়। এটি লিভারে বিপাক হয়। সুতরাং লিভারের অসুখে এই ওষুধ না দেওয়াই ভালো।

প্যারালডিহাইড ঘুমের জন্যই বেশী ব্যবহার হয়। তবে খিঁচুনি কমানোর জন্যও এটি মৃগী রোগীদের ক্ষেত্রে, টিটেনাস অসুখে এবং গর্ভকালীন রক্তদুষ্টিতে (eclampsia) ব্যবহার হয়।

অ্যাণ্টিএনালজেসিক ওষুধ (Antianalgesics) :

খুব কম মাত্রায় বারবিচুরেট প্রয়োগের পর দেখা যায় যে রোগীর স্বাভাবিক ব্যথা অনুভূতি অনেক বেড়ে যায়। যতটুকু উদ্দীপনায় যতটুকু ব্যথা অনুভূতি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে—বারবিচুরেট প্রয়োগের পর সেটুকু ব্যথা অনুভূতিই অনেক বেশী হয়। সুতরাং এই ওষুধ ব্যথানিবারণ তো করেই না, উপরন্তু ব্যথা অনুভূতি বাড়িয়ে দেয়। তাই একে anti-analgesic বলা হয়। এই বারবিচুরেট স্বাভাবিক মাত্রায় দিলেও পরে যখন এই ওষুধের মাত্রা শরীরে কম হয়ে আসে—তখনও ব্যথা অনুভূতি বেশী হয়ে যেতে পারে।

প্রোমেথাজিন বা হায়োসিন বা অল্প মাত্রায় (০·৫%) হ্যালোথেন দিলেও অনেক সময় ব্যথা অনুভূতি বেড়ে যেতে পারে।

অ্যামফিটামিন (Amphetamine) :

ব্যথা উপশমের চিকিৎসায় মরফিন বা পেথিডিনের সংগে অ্যামফিটামিন দিলে মরফিন বা পেথিডিনের কার্যকারিতা অনেক বেড়ে যায়। বিশেষতঃ যে সব রোগী মানসিক অবসাদে ভোগে, অত্যধিক ভয়ভাবনায় মুষড়ে থাকে—তাদের প্রভূত উপকার হয়। ব্যথা উপশম তো হয়ই, উপরন্তু এদের শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে না, রোগীর ভয়ভাবনা থাকে না এবং মেজাজও ভালো থাকে। বলা হয় ১০ মিলিগ্রাম ডেক্সট্রোঅ্যামফিটামিনের সংগে ১২ মিলিগ্রাম মরফিন দিলে ২৪ মিলিগ্রাম মরফিনের মত কাজ করে। অনেকের মতে অ্যামফিটামিন শরীরে এনকেফালিন এবং এণ্ডর্ফিন নিঃসরণ করে এবং তার ফলেই ব্যথা উপশম হয়।

Tricyclic antidepressants :

দীর্ঘস্থায়ী অসহ্য ব্যথা বেদনার সংগে দুশ্চিন্তা এবং মানসিক অবসাদ জড়িয়ে থাকে। সুতরাং এই সব ক্ষেত্রে imipramine, amitryptyline ইত্যাদি ওষুধ

ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় এর সংগে ফেনোথিয়াজিন গ্রুপের ওষুধও দেওয়া হয়। এতে ঝিমুনি এবং মুখের শুকনো ভাব কম হয়। সাধারণতঃ কজালজিয়া (causalgia), হারপিস পরবর্তী নিউর‍্যালজিয়া, ভৌতিক অংগপ্রত্যংগ (phantom limb) ইত্যাদির প্রচণ্ড ব্যথায় এই সব ওষুধ দেওয়া হয়।

এইভাবে চিকিৎসার উপসর্গ হিসাবে কোষ্ঠকাঠিন্য, নাড়ীর ছন্দপতন, রক্ত-চাপহ্রাস ইত্যাদি হতে পারে। সুতরাং বেশী দিন এই চিকিৎসা করা উচিত নয় এবং আস্তে আস্তে ওষুধের মাত্রা কমিয়ে আনা উচিত।

Monoamine oxidase inhibitors :

এই সব ওষুধ মানসিক অবসাদে ব্যবহৃত হয়। এরা কিছুটা ব্যথা বেদনা উপশমও করে। সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী ব্যথায় বিশেষতঃ হারপিস পরবর্তী নিউর‍্যালজিয়া এবং ইণ্টারকস্টাল নিউর‍্যালজিয়াতে এই ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এই সব ওষুধের মধ্যে phenelzine সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ওষুধ ব্যবহারের সময় tyramine আছে এমন কোন খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ। কেননা এতে hypertensive crisis হতে পারে।

MAO inhibitor ওষুধ খাওয়ার আনুষংগিক উপসর্গ হিসাবে লিভারের গণ্ডগোল, রক্তচাপবৃদ্ধি, মাথা ব্যথা, খিঁচুনি ইত্যাদি হতে পারে। MAO inhibitor ওষুধ খাচ্ছে এমন রোগীকে মরফিন বা পেথিডিন দেওয়া উচিত নয়। কেননা এতে অত্যধিক রক্তচাপহ্রাস, চৈতন্যলোপ, খিঁচুনি, অত্যধিক জ্বর, শ্বাসপ্রশ্বাসে ব্যাঘাত ইত্যাদি হতে পারে।

উপরোক্ত নানা ধরনের ওষুধ ছাড়াও এমন কিছু ওষুধ আছে যেগুলি ব্যথার মূলই বিনাশ করে। প্রথমে ব্যথা কী কারণে হচ্ছে তা দেখা দরকার এবং সেই কারণেরই চিকিৎসা করা দরকার। যেমন—অন্ত্রে টান বা spasm হলে যে 'টেনে ধরা' ব্যথা হয়, তা এট্রোপিন বা বেলেডোনা গ্রুপের ওষুধ দিলেই ব্যথা উপশম হয়। আবার মাইগ্রেনে যে রক্তনালীর প্রসারণ ঘটিয়ে ব্যথা সৃষ্টি করে তা ergotamine ওষুধ দিয়ে সংকোচন করলেই ব্যথা কমে যায়। Gout বা গেঁটে বাতের ব্যথায় colchicine দিয়ে ব্যথা নিরাময় হয়, কেননা এই ওষুধটি সুনির্দিষ্টভাবে এই বাতের ব্যথা এবং প্রদাহ দমন করে। এইসব ওষুধগুলি ঠিক মস্তিষ্ককে অবদমন না করিয়েই ব্যথা উপশম করে।

ফেনিলবিউটাযোন (Phenylbutazone) :

এটি pyrazolone গ্রুপের ওষুধ। এটি ব্যথা বেদনা উপশমকারী ওষুধ এবং এটি রিউম্যাটিক অসুখে ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। এটি গেঁটে বাতেও খুব ভালো কাজ করে। এর ব্যবহারে রক্তের ইউরিক এসিডের মাত্রা কমে। এটি প্রদাহ কমাতেও সাহায্য করে। তাই রক্তনালীর থ্রম্বোসিসে এবং giant cell arteritis অসুখে এর ব্যবহার হয়। এনকাইলোজিং স্পণ্ডিলাইটিসে ব্যথানিবারণের জন্যও এর ব্যবহার আছে।

এই ওষুধ মুখ দিয়ে খাওয়ানো হয়। তবে অনেকদিন ধরে বেশী মাত্রায় এই ওষুধ খাওয়ালে রক্তে এই ওষুধের মাত্রা অনেক বেড়ে যেতে পারে এবং তার ফলে কুফলও ফলতে পারে। সুতরাং দৈনিক ৪০০ মিলিগ্রামের বেশী মাত্রায় এই ওষুধ দেওয়া উচিত নয়।

এই ওষুধের ব্যবহারে কিছু আনুষংগিক খারাপ উপসর্গ হতে পারে। এতে খাদ্যতন্ত্রে নানা গণ্ডগোল হতে পারে। পাকস্থলীতে ক্ষত থাকলে perforation হয়ে যেতে পারে। রক্তবমি এবং রক্তপায়খানা হতে পারে। সুতরাং পাকস্থলীতে ক্ষত থাকলে কখনও এই ওষুধ দেওয়া উচিত নয়। রোগীর কিডনি বা লিভারের অসুখ থাকলে, হৃৎপিণ্ডের গণ্ডগোল থাকলে এই ওষুধ ব্যবহার না করাই ভালো। এতে চামড়ায় আমবাত (rash), হাত পা ফোলা, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, চোখে দেখতে অসুবিধা, রক্তের গণ্ডগোল যেমন agranulocytosis, aplastic anaemia ইত্যাদি হতে পারে।

অক্সিফেনবিউটাযোন (oxyphenbutazone) সেই দিক থেকে অনেক ভালো। এটি ফেনিলবিউটাযোনের মতই কার্যকরী এবং এর কুফল অনেক কম।

ফেনাযোন (Phenazone) :

এটিও pyrazolone গ্রুপের ওষুধ। এটিও ব্যথা বেদনা উপশম করতে পারে। এটি রিউম্যাটিক অসুখে ব্যবহার করা হতো, কিন্তু এটি এখন আর ব্যবহার হয় না। কেননা এর ব্যবহারে খুবই agranulocytosis হওয়ার আশংকা থাকে। এর অন্য উপসর্গের মধ্যে চামড়ায় আমবাত, ঝিমুনি, অত্যাধিক ঘাম হওয়া, কাঁপুনি ইত্যাদি অন্যতম।

এমাইডোপাইরিন (Amidopyrine) :

এটিও pyrazolone গ্রুপের ওষুধ। এরও ব্যবহার খুবই সীমিত। তবে এটিও ব্যথা উপশম করতে পারে, জ্বর কমাতে পারে এবং প্রদাহ কমায়। অন্যান্য নানান উপসর্গের সংগে এটিও agranulocytosis করতে পারে।

সালফিপাইরাযোন (Sulphipyrazone) :

এটি ফেনিলবিউটাযোনের মত একটি ভালো কার্যকরী ওষুধ। এই ওষুধ খাওয়ানোর সময় প্রস্রাব যাতে ক্ষারীয় থাকে তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। বেশী পরিমাণে জলও খাওয়াতে হবে, নতুবা crystaluria হতে পারে। প্রথম দিকে ৫০ মিলিগ্রাম দিনে দু'বার দিতে হয়, পরে বাড়িয়ে ১০০ মিলিগ্রাম দিনে ৪ বার পর্যন্ত দেওয়া যায়। পরে অবশ্য মাত্রা কমানো হয়। পেপটিক ক্ষত (ulcer) থাকলে রোগীকে এ ওষুধ দেওয়া উচিত নয়।

ইন্ডোমেথাসিন (Indomethacin) :

এটি indol গ্রুপের ওষুধ। এটি খুব ভালোভাবে ব্যথানিবারণ করতে পারে। প্রদাহ কমাতে পারে, জ্বর কমাতে সাহায্য করে এবং রক্তে ইউরিক এসিডের মাত্রা কমায়। যখন ফেনিলবিউটাযোন বিশেষ কার্যকরী হয় না, তখনই ইন্ডোমেথাসিন সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাধারণতঃ ২৫ মিলিগ্রাম দিনে তিনবার হিসাবে দেওয়া হয়। তবে গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এবং যে সব রোগীর পাকস্থলীতে ক্ষত আছে—তাদের দেওয়া উচিত নয়। ইন্ডোমেথাসিনের পারিপার্শ্বিক উপসর্গ হিসাবে পাকস্থলীতে রক্তক্ষরণ, মাথাধরা, শরীর ম্যাজম্যাজ করা, ঝিমুনি, কান ভোঁ ভোঁ করা, অবসাদ, মানসিক বৈকল্য, চামড়া আমবাত ইত্যাদি হতে পারে। এতেও রক্তের গণ্ডগোল যেমন agranulocytosis এবং aplastic anaemia হতে পারে।

আইবুপ্রোফেন (Ibuprofen) :

এটি ফেনিলবিউটাযোন এবং ইন্ডোমেথাসিনের মতই কার্যকরী ওষুধ। এর খারাপ উপসর্গগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এটি রিউম্যাটিক আথ্রাইটিসে, এনকাইলোজিং স্পণ্ডিলাইটিসে এবং অস্টিওআথ্রাইটিসে ব্যাপক ব্যবহার করা হয়।

সাধারণতঃ পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে মোট ৬০০ থেকে ১২০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় চার ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। এটি ভালোভাবে ব্যথানিবারণ করে এবং প্রদাহ কমায়।

এর প্রয়োগে কিছু আনুষংগিক উপসর্গ হতে পারে। পাকস্থলীতে রক্তক্ষরণ, মাথাধরা, মাথাঘোরা, চোখে দেখতে অসুবিধা, রক্তের গণ্ডগোল বিশেষতঃ thrombocytopenia ইত্যাদি হতে পারে।

ন্যাপ্রোক্সেন (Naproxen) :

এটিও ব্যথা উপশম করে, প্রদাহ কমায় এবং জ্বর কমাতে সাহায্য করে। এটি অস্টিওআর্থ্রাইটিসে এবং এনকাইলোজিং স্পণ্ডিলাইটিসে সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা হয়।

পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে ২৫০ থেকে ৪০০ মিলিগ্রাম দিনে দু'বার হিসাবে দেওয়া হয়। এটি স্যালিসিলেটের মত নানা উপসর্গের সৃষ্টি করতে পারে। এতেও পাকস্থলী এবং অন্ত্রে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

আর্গোমেট্রিন (Ergometrine) :

এটি একটি ergot alkaloid। এটি প্রধানতঃ uterus-এর মাংসপেশীতে সংকোচন ঘটানোর জন্যই ব্যবহার করা হয়। তবে মাইগ্রেন অসুখেও এর ব্যাপক ব্যবহার হয়, কেননা এটি রক্তনালীর smooth মাংসপেশীতে উদ্দীপনা জাগায় এবং সংকোচনে সাহায্য করে। Arteriole-এ সংকোচন ঘটায়—এতে রক্তচাপ কিছু বাড়তে পারে, সেখানকার রক্তপ্রবাহ কমতে পারে। মস্তিষ্ক কিছু অবদমিত হতে পারে। অনেক সময় বমি, বুকে ব্যথা, খিঁচুনি, মাংসপেশীতে ব্যথা, hemiplegia ইত্যাদি খারাপ উপসর্গ হতে পারে। মাইগ্রেন অসুখে মুখে ০.৫ মিলিগ্রাম হিসাবে দেওয়া হয়।

কলচিসিন (Colchicine) :

এই ওষুধ গেঁটে বাতের পক্ষে খুবই উপকারী। এর প্রয়োগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ব্যথা এবং প্রদাহ অনেক কমে যায়। কলচিসিন ইউরিক এসিডের ক্রিস্টাল তৈরী হতে দেয় না। এতে কোষে ল্যাকটিক এসিড তৈরীও কম হয় এবং

কোষের pH পরিবর্তনও কম হয়। এইভাবে কলচিসিন গেঁটে বাতের প্রদাহ কমায়।

কলচিসিন মুখ দিয়ে খাওয়ানো হয়। প্রথমে ১ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয় এবং তার পর ০.৫ মিলিগ্রাম ২ ঘন্টা অন্তর অন্তর দেওয়া হয় যতক্ষণ না রোগীর উপসর্গের উপশম হয়। অবশ্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে এই ওষুধ বন্ধ করে দিতে হবে। সাধারণতঃ ৪ থেকে ৮ মিলিগ্রামেই ভালো কাজ হয়, তবে ১০ মিলিগ্রামের বেশী কখনোই দেওয়া উচিত নয়। গেঁটে বাতের প্রতিষেধক হিসাবে সাধারণতঃ দিনে একবার বা একদিন অন্তর ০.৫ থেকে ১ মিলিগ্রাম খাওয়ালে কাজ হয়। কলচিসিন শিরাপথেও দেওয়া যায়।

এই ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসাবে পেটে ব্যথা, বমি, উদরাময় ইত্যাদি হতে পারে। অনেকদিন প্রয়োগে কিডনির গন্ডগোল এবং রক্তের গন্ডগোল দেখা দিতে পারে।

প্রোবেনেসিড (Probenecid) :

এই ওষুধও গেঁটে বাতে ব্যবহার করা হয় এবং ইউরিক এসিড শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে। এটি কিন্তু ব্যথানিবারক ওষুধ নয়। কিডনির টিবিউলে ইউরেটের পুনঃশোষণ ব্যাহত হয় এবং প্রস্রাবের সংগে তা বেরিয়ে যায়। কিডনির গন্ডগোল থাকলে এ ওষুধে বিশেষ কাজ নাও হতে পারে।

প্রোবেনেসিড মুখ দিয়ে খাওয়ানো হয়। এটি শরীরে কিছুটা বিপাক হয় এবং কিছুটা অপরিবর্তিত হিসাবে প্রস্রাবের সংগে বেরিয়ে যায়। গেঁটে বাতের প্রতিষেধক হিসাবে ০.৫ থেকে ১ গ্রাম দিনে দু'বার হিসাবে দেওয়া হয়। এতে রক্তের ইউরিক এসিডের লেভেল কমে যায়। প্রস্রাবে ইউরিক এসিডের ক্রিস্টাল দেখা যেতে পারে, তাই অনেক বেশী পরিমাণে জল খাওয়াতে হয় এবং প্রস্রাব যাতে ক্ষারীয় থাকে তার জন্য পটাসিয়াম সাইট্রেট বা সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দিতে হবে।

এই ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় পেট ব্যথা, বমি, উদরাময় ইত্যাদি হতে পারে। প্রোবেনেসিড থেরাপির প্রথম চার সপ্তাহের মধ্যে গেঁটে বাতের প্রকোপ বাড়তে পারে, যদিও রক্তের ইউরিক এসিডের লেভেল কম থাকে। ইউরিক এসিডের ক্রিস্টালগুলি ওষুধের প্রভাবে বেশী ভেঙে যাওয়ার জন্যই এমন হয়।

(Allopurinol) অ্যালোপিউরিনল :

এই ওষুধে শরীরে ইউরিক এসিড তৈরী হতে পারে না। ইউরিক এসিড তৈরী হওয়ার আগেই বাধা সৃষ্টি করে। তার ফলে যে সব যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয় সেগুলি সহজেই প্রস্রাবের সংগে বেরিয়ে যায়। অল্প কিডনির গন্ডগোল থাকলেও কোন অসুবিধা হয় না। সুতরাং অন্য uricosuric ওষুধে কাজ না হলে এই অ্যালোপিউরিনল ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রোপানথেলিন (Propantheline) :

এটি একটি সিন্থেটিক anticholine ওষুধ। এটি পাকস্থলীর এবং ডুওডেনামের ক্ষতের অসুখে খুবই সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা হয়। এটি এট্রোপিনের মতই কাজ করে। তবে ganglion blocking effect খুব কম। বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করলে neuromuscular junction-এ কিউর্যারির মত কাজ করে। সেক্ষেত্রে মুখ অত্যধিক শুষ্ক হয়ে পড়ে, চোখে ঝাপসা দেখে, কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, প্রস্রাবেও কষ্ট হয়। হঠাৎ ভংগিমা পরিবর্তনে রক্তাচাপহ্রাস (postural hypotension) হতে পারে।

এই ওষুধে পাকস্থলীর রস নিঃসরণ কম হয়। পাকস্থলী থেকে খাদ্য অন্ত্রে যেতেও সময় নেয়। সুতরাং এই প্রোপানথেলিনের সংগে অম্লনাশক (antacid) ওষুধ দিলে পাকস্থলীতে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। তার ফলে অম্লতা অনেক পরিমাণে কমতে সাহায্য হয়। এতে পাকস্থলীর ক্ষতজনিত ব্যথাও অনেক কমে। বস্তুতপক্ষে এই দুই ওষুধ একসংগে দিলে অম্লনাশক ওষুধ সাধারণ মাত্রার চেয়ে কম মাত্রায় দিলেও চলে।

সাধারণতঃ ১৫ মিলিগ্রাম দিনে ৪ বার মুখে ট্যাবলেট হিসাবে দেওয়া হয়। পেপটিক আলসার ছাড়াও গ্যাসট্রাইটিস এবং কোলাইটিস অসুখেও এটি ব্যবহার করা হয়। গ্লকোমা এবং আন্ত্রিক শিথিলতা (atony) থাকলে এই ওষুধ ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

অক্সিফেনোমাইড (Oxyphenomide) :

এটিও একটি anticholine ওষুধ। পেপটিক ক্ষত, গ্যাসট্রাইটিস, hyperacidity, অন্ত্রের hypermotility ইত্যাদিতে এই ওষুধ খুবই ব্যবহার করা

হয়। এটি অন্ত্রের smooth মাংসপেশীর টান (spasm) কমায় এবং পাকস্থলীর রস নিঃসরণও কমায়। মুখে খাওয়ালে ৪ থেকে ৬ ঘন্টা কার্যকরী থাকে। এই ওষুধ spasmজনিত ব্যথায় খুবই উপকারী। পাকস্থলীর, অন্ত্রের, পিত্তনালীর এবং বৃক্কনালীর spasm-এ অক্সিফেনোমাইড ব্যবহার করা যায়।

সাধারণতঃ ৫ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট হিসাবে বাজারে পাওয়া যায়। পেপটিক আলসারের চিকিৎসায় ৫ মিলিগ্রাম দিনে চার বার দেওয়া যেতে পারে—তবে তা খাবার খাওয়ার আধ ঘন্টা আগে খাওয়া উচিত। আনুষংগিক উপসর্গ হিসাবে মুখ শুকনো হয়ে যাওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা ইত্যাদি হতে পারে।

সিমেটিডিন (Cimetidine):

এই ওষুধটি পেপটিক আলসার অসুখে খুবই ফলপ্রদ। এটির প্রয়োগে পাকস্থলী নিঃসৃত রসের অম্লতা কমাতে সাহায্য করে এবং তার সংগে পাকস্থলী নিঃসৃত রসের পরিমাণও অনেক পরিমাণে কমে।

সাধারণতঃ ২০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দিনে ৪ বার মুখে খাওয়ানো হয়, তবে অসুখের অবস্থা বিশেষে ৪০০ মিলিগ্রাম দিনে ৪ বার দেওয়া যেতে পারে। অসুখের উপসর্গ কমে গেলেও এই ওষুধ ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ খেয়ে যেতে হয়। সাধারণ ভাবে তখন ৪০০ মিলিগ্রাম দিনে ২ বার করে খেলেই হয়।

এই ওষুধের অন্যান্য উপসর্গ হিসাবে ঝিমুনি, cholestasis ইত্যাদি হতে পারে। রক্তের সিরামে ক্রিয়েটিনিন (creatinine) লেভেলও বেড়ে যেতে পারে। যে সব রোগীর কিডনির গন্ডগোল থাকে, তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধের মাত্রা কম দিলে ভালো হয়। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এটি খুবই সাবধানে দিতে হয়, কেননা এটি প্লাসেন্টা দিয়ে বের হতে পারে এবং গর্ভস্থ শিশুর রক্তেও তা যেতে পারে। তবে এতে নবজাত শিশুর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। যে সব রোগী মুখ দিয়ে anticoagulant জাতের ওষুধ খায়, তাদের ক্ষেত্রে সিমেটিডিন ব্যবহার না করাই উচিত, কেননা সিমেটিডিন anticoagulant ওষুধের কার্যকারিতা অনেক বাড়িয়ে দেয়।

গ্লাইকোপাইরোলেট (Glycopyrrolate):

এটি একটি সিন্থেটিক quaternary অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড। এটি খুব

কার্যকরী anticholinergic ওষুধ। এর প্রয়োগে লালা নিঃসরণ অত্যন্ত কমে যায়। এট্রোপিন বা হায়োসিন ওষুধের থেকেও এটি খুব ভালোভাবে পাকস্থলীর রস নিঃসরণ কমায় এবং তার অম্লতাও কমে। এটির প্রয়োগে রোগীর মস্তিষ্কে বিশেষ উদ্দীপনা জাগে না। গ্লাইকোপাইরোলেট হৃৎপিণ্ডে এবং রক্তসংবহন-তন্ত্রে খুব একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। নাড়ীর গতি অল্প বাড়ে, তবে dryshythmia এট্রোপিনের সংগে তুলনামূলকভাবে কম হয়।

গ্লাইকোপাইরোলেট সাধারণতঃ 0.004 মিলিগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম হিসাবে মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন হিসাবে দেওয়া হয়। এটি অনেক সময় শিরাপথেও দেওয়া হয়।

রোগীর হাঁপানি অথবা গ্লকোমা থাকলে এই ওষুধ না দেওয়াই ভালো। এই ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসাবে মুখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া, প্রস্রাব retention হওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, চোখের আভ্যন্তরীণ চাপ বেড়ে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা, নাড়ীর গতি অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়া, মাথাধরা, ঝিমুনি, দুর্বলতা, বমি, অনিদ্রা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি হতে পারে।

এট্রোপিন সালফেট (Atropine sulphate) :

এট্রোপিন সালফেট একটি এলকালয়েড এবং এটি প্যারাসিমপ্যাথেটিক বা পরাসংবেদী স্নায়ুতন্ত্রকে অবদমিত করে। যে সব গ্যাংলিয়ন পরবর্তী প্রান্তিক স্নায়ুতে এসিটিল কোলিন নিঃসৃত হয়—সেখানেও অবদমন করে এবং তার ফলে nerve impulse-এর transmission ব্যাহত হতে পারে (anticholinergic, parasympatholytic)।

এট্রোপিনের প্রভাবে রোগী অল্প ঝিমুনি হয় যদিও এর মস্তিষ্কে বিশেষ কোন কাজ নেই। অত্যধিক প্রয়োগে restlessness এবং excitement হতে পারে। এটির প্রয়োগে চোখের তারকা প্রসারিত হয়ে পড়ে। চোখের মধ্যকার চাপ (intraocular pressure) বেড়ে যায়। এট্রোপিন মুখের লালা নিঃসরণ কমায় এবং শ্বাসনালীর secretion-ও কমায়। এই সব secretion অনেক সময় খুবই মোটা ও ঘন হয়ে পড়ে। ব্রংকাশের মাংসপেশীসমূহ কিছুটা প্রসারিত হয়। ঘাম নিঃসরণও কমে যায়। এতে অনেক সময় বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এট্রোপিন basal metabolic rate বাড়ায়।

এট্রোপিন প্রয়োগে নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়, তবে অল্প মাত্রায় দিলে প্রথম দিকে নাড়ীর গতি হ্রাসও পেতে পারে। অনেক সময় dysrhythmia হতে দেখা যায়। এট্রোপিনের প্রয়োগে রক্তনালী খুব একটা প্রভাবিত হয় না। তবে অত্যধিক মাত্রায় দিলে রক্তনালীর প্রসারণ ঘটে। এমনিতে রক্তচাপ মোটামুটি ঠিকই থাকে। এট্রোপিন অনেক সময় মুখে flushing ঘটায়, এমনকি rashও দেখা দিতে পারে।

পাকস্থলী নিঃসৃত রস পরিমাণে অনেক কমে যায়। তবে এই রসের অম্লতার বিশেষ কোন হেরফের হয় না। শরীরের সব রকম secretion কমে গেলেও এট্রোপিনের প্রভাবে দুগ্ধ নিঃসরণ কমে না। এট্রোপিন বমি কমাতে সাহায্য করে।

শরীরের smooth মাংসপেশীসমূহ এট্রোপিন প্রয়োগে প্রসারিত হয়। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মাংসপেশীর tone কমে যায় এবং peristalsis কমে যায়। কোন কারণে এই সব smooth মাংসপেশীসমূহে spasm বা টান হলে এট্রোপিন প্রয়োগে তা নিবারিত হয়। মরফিন প্রয়োগের ফলে যে টান হয় তাও এট্রোপিন কমাতে সাহায্য করে, তবে পিত্তনালীর spasm কমে না। এট্রোপিন শ্বাসনালীর smooth মাংসপেশীসমূহেও প্রসারণ ঘটায়।

এট্রোপিন মুখ দিয়ে খাওয়ালেও কাজ হয়। মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন হিসাবে এবং এমনকি শিরাপথেও দেওয়া যায়। সাধারণতঃ ০.৬ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়। এট্রোপিন লিভারে বিপাক হয়, অবশ্য কিছুটা অপরিবর্তিত অবস্থায় প্রস্রাবের সংগে বেরিয়ে যায়।

এট্রোপিন বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করলে বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে। মুখ শুকনো হয়ে যায়, অক্ষি তারকা (pupil) খুবই প্রসারিত হয়ে পড়ে, রোগী চোখে ভালো দেখতে পায় না। চামড়া খুবই শুষ্ক হয়ে পড়ে, গরম হয়ে পড়ে। রোগীর অত্যধিক জ্বর হতে পারে। রোগী ছটফট করে, ভুল বকে। রোগীর অস্বাভাবিক hullucination হতে পারে। রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

হায়োসিন হাইড্রোব্রোমাইড (Hyoscine hydrobromide) :

এটিকে স্কোপোলামিনও (scopolamine) বলা হয়। এটিও একটি এলকালয়েড। এটিও এট্রোপিনের মত parasympatholytic এবং anticholinergic ওষুধ। এর কার্যকারিতা অনেকাংশে এট্রোপিনের মতই।

হায়োসিন প্রয়োগে মস্তিষ্ক অবদমিত হয়। এতে রোগীর ঘুম হয়। রোগীর ঝিমুনি হয়। এর প্রভাবে রোগীর সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ (amnesia) হতে দেখা যায়। বৃদ্ধদের এই ওষুধ দিলে অনেক সময় রোগী ছটফট করে, উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মরফিন, পেথিডিন ইত্যাদির সংগে হায়োসিন দিলে এদের ব্যথা-নিবারক কর্মক্ষমতা কমে যায়।

হায়োসিন এট্রোপিনের চেয়ে বেশী secretion কমায়, লালা নিঃসরণ কমায়। এতেও অক্ষি তারকা (pupil) প্রসারিত হয়। এতে শ্বাসপ্রশ্বাস অল্প উজ্জীবিত হতে পারে। এতে নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়। হৃৎপিন্ডে, অন্ত্রে এবং শ্বাস-নালীতে হায়োসিনের কাজ এট্রোপিনের চেয়ে কিছুটা কম।

সাধারণভাবে ০.৬ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া হয়। অনেক সময় ভালো seda-tion-এর জন্য হায়োসিন ০.৪ মিলিগ্রামের সংগে পেথিডিন ১০০ মিলিগ্রাম দেওয়া হয়। প্যাপাভেরেটাম ২০ মিলিগ্রাম সংগে দিলেও ভালো কাজ হয়।

হায়োসিন বিউটিলব্রোমাইড (Hyoscine butylbromide) :

এটিও একটি parasympatholytic ওষুধ। এটির প্রয়োগে শরীরের smooth মাংসপেশীসমূহে খুবই প্রসারণ ঘটে। এটি মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন হিসাবে অথবা শিরাপথেও দেওয়া যায়। পাকস্থলী বা অন্ত্রের spasm হলে বা colic ব্যথা হলে এই ওষুধ সাফল্যের সংগে প্রয়োগ করা যায়। পিত্তনালীতে spasm হলে, খাদ্যনালীতে spasm হলে (oesophagospasm, cardio-spasm), পাকস্থলীর অথবা ডুওডেনামের ক্ষতে এই ওষুধ দেওয়া যায়।

সাধারণতঃ ১০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট দিনে ৩ থেকে ৫ বার দেওয়া যেতে পারে। ইঞ্জেকশন হিসাবে ২০ মিলিগ্রাম দিতে হতে পারে। গ্লকোমা রোগীর ক্ষেত্রে এ ওষুধ না দেওয়াই ভালো, কেননা এতে চোখের আভ্যন্তরীণ প্রেসার আরও বেড়ে যেতে পারে।

সোনাজাত ওষুধ (Gold compounds) :

এদের মধ্যে সোডিয়াম অরোথায়োম্যালেট, অরোথায়োগ্লুকোজ এবং অরো-থায়োগ্লিকানাইড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিসে অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ সপ্তাহে ৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় ৩ থেকে

৬ মাস দিতে হয়। চামড়া, লিভার এবং কিডনির অসুখে এই ওষুধ ব্যবহার না করাই উচিত। এতে অনেক সময় agranulocytosis, লিভারের অসুখ এবং exfoliative dermatitis হতে পারে।

পেনিসিলামাইন (Penicillamine) :

এটি একটি immunosuppresive ওষুধ। এটিও খুব ভালোভাবে প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। এটি রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিসের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসার সময় steroid অথবা অন্য ব্যথা-নাশক ওষুধ যেমন অ্যাসপিরিন ইত্যাদিও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কখনও সোনাজাত ওষুধপত্র পেনিসিলামাইনের সংগে ব্যবহার করা উচিত নয়, কেননা এতে দুয়ের খারাপ উপসর্গগুলি মিলেমিশে রোগীর আরও ক্ষতি করতে পারে। প্রথমে দিনে ২৫০ মিলিগ্রাম দিয়ে দেখা হয় কোন খারাপ উপসর্গ হচ্ছে কিনা বা রোগী সহ্য করতে পারছে কিনা। এর পর আস্তে আস্তে ওষুধের মাত্রা বাড়াতে হবে। তবে দৈনিক ১ থেকে ১.৫ গ্রামের মাত্রাতেই ওষুধ দেওয়া বিধেয়।

এর খারাপ উপসর্গের মধ্যে চামড়ায় আমবাত হতে পারে, কিডনির অসুখ হতে পারে, রক্তের অসুখ যেমন agranulocytosis হতে পারে, এমনকি সব থেকে খারাপ myasthenia gravis হতেও পারে।

হাইড্রোকর্টিশোন (Hydrocortisone) :

এটি এডরেনাল গ্রন্থি নিঃসৃত একটি হরমোন। এটি শরীরে সোডিয়াম ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং পটাশিয়াম বের করে দিতে সাহায্য করে। এটি রক্তের শর্করার মাত্রা বাড়ায়। অনেক সময় প্রস্রাবের সংগেও শর্করা বেরিয়ে যেতে পারে। বহুদিন ব্যবহারে মাংসপেশীসমূহ ক্ষীণ হয়ে পড়ে, হাড়ে osteoporosis হয়। শরীরের প্রোটিনের স্থিতি হয় না, উপরন্তু প্রোটিনের ক্ষয় হতে থাকে। কাঁধে, মুখে এবং পেটে অস্বাভাবিক চর্বি জমতে থাকে। শরীরে অ্যান্টিবডি কমতে থাকে। রক্তে eosinophil কমে যায়। প্রস্রাবের সংগে ইউরিক এসিড বেশী বেরিয়ে যায়। Allergy অথবা hypersensitivity-র কমাতে সাহায্য করে। অনেক অসুখেই এটি ব্যবহার হয়। হাঁপানি, acute lymphatic leukae-

mia, haemolytic anaemia, রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস, এনকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস, চামড়ার কিছু অসুখে, গেঁটে বাত ইত্যাদিতে খুবই উপকার হয়। এটি মুখ দিয়ে বা ইঞ্জেকশনে প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় হাড়ের সন্ধিস্থলেও ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। শরীরে adrenocortical insufficiency থাকলে স্টেরয়েড (steroid) দিয়েই চিকিৎসা করতে হবে।

রোগীর বহুমূত্র থাকলে, মানসিক ব্যাধিতে, পাকস্থলীতে ক্ষত থাকলে, মৃগীরোগে, যক্ষ্মারোগে, রক্তচাপবৃদ্ধি থাকলে বা হার্টের অসুখে স্টেরয়েড ব্যবহার না করাই ভালো।

ষোড়শ অধ্যায়

অ্যানেস্থিসিয়া সংক্রান্ত ঔষধপত্র

লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার কিছু ঔষধপত্র

এই ওষুধগুলি স্নায়ুর মধ্যে ব্যথা বেদনার গতিপথকে সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে এবং এগুলি ইঞ্জেকশনের সাহায্যে স্নায়ুর নির্দিষ্ট জায়গায় প্রয়োগ করা হয়। ব্যথা অনুভূতির সংগে স্পর্শ, চাপ, গরম এবং ঠান্ডা অনুভূতিও সাময়িক ঐ সীমাবদ্ধ জায়গায় লোপ পায়।

শরীরের বহির্ভাগে চামড়ায় অথবা mucous membraneএ 8% লিগনোকেন মলম বা স্প্রে হিসাবে ব্যবহার ক'রে সেই জায়গা অসাড় করা যায়। আবার ০.৫% থেকে ১% লিগনোকেন বা ঐ জাতীয় ওষুধ চামড়ার নীচে ইঞ্জেকশন দিলেও সাময়িকভাবে ঐ সব জায়গা ব্যথা বেদনা অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও একটি বিশেষ নার্ভকে ব্লক করা যায় এবং তার ফলে ঐ নার্ভ শরীরের যে অংশকে অনুভূতিপ্রবণ রাখে, সাময়িকভাবে সেই জায়গাটি অসাড় হয়ে যায়। এইভাবে একটি নির্দিষ্ট নার্ভ প্লেক্সাসকেও ব্লক করা যায়।

সুষুম্নাকান্ডের একটি নির্দিষ্ট অংশকেও এইভাবে ব্লক করা যায়। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ সাবএরাকনয়েড স্পেসে (subarachnoid space) ইঞ্জেকশন দিয়ে স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া হয়। এই subarachnoid space সাধারণভাবে piamater এবং arachnoid mater-এর মধ্যবর্তী স্থান। এখানকার নির্দিষ্ট নার্ভগুলি ব্লক হওয়ায় ঐ সব নার্ভ শরীরের যে যে অংশে অনুভূতি জোগায়, সেই সব অংশ অসাড় হয়ে পড়ে।

এপিডুরাল (epidural) অ্যানেস্থিসিয়ায় লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ epidural space-এ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় এবং সেখানকার স্পাইনাল নার্ভগুলি ঐ ওষুধের প্রভাবে ব্লক হয়। এই এপিডুরাল স্পেস বা স্থান হলো vertebral canal-এর periosteum এবং spinal dura mater-এর মধ্যবর্তী স্থান।

কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ

কোকেন (Cocaine) :

এটি কোকা গাছের পাতা থেকে উৎপন্ন একটি উপক্ষার এবং সর্বপ্রথম লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। এটি মস্তিষ্ককেও উদ্দীপিত করে এবং তার ফলে রোগীর নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে যায়, রক্তচাপবৃদ্ধি পায়, বমি হয়, উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। পরে কিন্তু সব কিছু অবদমিত হয় এবং এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। এটি মেজাজ ভালো করে এবং সেজন্য অভ্যাসে বা নেশায় পরিণত হতে পারে।

এই ওষুধ mucous membrane-এ ভালো কাজ করে। সর্বাধিক মাত্রা ১০০ মিলিগ্রামের বেশী না হওয়াই উচিত। অত্যধিক মাত্রায় দিলে খিঁচুনি, চৈতন্য-লোপ, ব্যাহত শ্বাসপ্রশ্বাস এবং এমনকি স্তব্ধ হৃৎক্রিয়াও হয়ে যেতে পারে। এই সব কারণে এখন কোকেনের ব্যবহার বিশেষ হয় না।

প্রোকেন (Procaine) :

এটি একটি ভালো লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ এবং কোকেনের চেয়ে কম ক্ষতিকর। প্রোকেন প্রথমে মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রকে উদ্দীপিত করে এবং পরে অবদমন করে। এটি অভ্যাসে বা নেশায় পরিণত হয় না। এটি হৃৎপিন্ডের উত্তেজনাকে কমাতে সাহায্য করে। নার্ভ ব্লকের ক্ষেত্রে ১ থেকে ২% প্রোকেন ব্যবহার করা হয়। সর্বাধিক মাত্রা ৫০০ থেকে ১০০০ মিলিগ্রামের মধ্যেই রাখা উচিত। এর কার্যকারিতা ২ থেকে ৩ মিনিটের মধ্যেই আরম্ভ হয় এবং ৬০ থেকে ৯০ মিনিটের মত থাকে। প্রোকেন স্পাইনাল এবং এপিডুরাল অ্যানেস্থিসিয়াতেও ব্যবহার হয়।

অ্যামিথোকেন (Amethocaine) :

লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে এটি প্রোকেনের চেয়ে ১০ থেকে ২০ গুণ কার্যকরী। বহির্ভাগে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য 0.৫%, স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়ার জন্য ১% এবং এপিডুরাল অ্যানেস্থিসিয়ায় 0.১৫% অ্যামিথোকেন ব্যবহার করা হয়।

অন্যান্য লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের মত এটিও প্রথমে মস্তিষ্ককে উত্তেজনা জাগায় এবং পরে অবদমন করে। এটিও হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করে। তবে অন্যান্য খারাপ উপসর্গও হতে পারে এবং এমন কি মৃত্যুও ঘটাতে পারে।

লিগনোকেন (Lignocaine) :

লিগনোকেন একটি বহুলপ্রচলিত লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এটি অনেক বেশী নিরাপদ এবং এর খারাপ উপসর্গ খুবই কম। সাধারণতঃ ৫০০ থেকে ৭০০ মিলিগ্রামের বেশী ব্যবহার করা উচিত নয়। এটি বহির্ভাগের (surface) অ্যানেস্থিসিয়াতে, নার্ভ ব্লকে, স্পাইনাল এবং এপিডুরাল অ্যানেস্থিসিয়াতে ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়। লিগনোকেন (১ থেকে ২%) জেলী হিসাবে এবং মলম হিসাবেও ব্যবহার করা যায়।

লিগনোকেন যাতে অনেকক্ষণ কার্যকরী থাকে তার জন্য লিগনোকেনের সংগে এডরেনালিন (adrenaline) মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। তবে হাতের বা পায়ের আঙুলে, পুরুষাংগে যেখানে end arteries আছে, সেখানে শুধু লিগনোকেনই দিতে হবে। কেননা এডরেনালিন রক্তনালী সংকুচিত করে এবং তার ফলে রক্তপ্রবাহ কমে যায় এবং এতে সেখানে পচন বা gangrene পর্যন্ত হতে পারে।

ইনফিলট্রেশনে বা ত্বকের নীচে ইঞ্জেকশনে ০.৫%, নার্ভ ব্লকে ১ থেকে ১.৫%, স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়াতে ৫% এবং এপিডুরাল অ্যানেস্থিসিয়াতে ১.৫ থেকে ২% লিগনোকেন ব্যবহার করা হয়। লিগনোকেন সাধারণতঃ লিভারে বিপাক হয় এবং কিডনি দিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

সিনকোকেন (Cinchocaine) :

এটিও খুব কার্যকরী লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। ইঞ্জেকশনের পর এটি কার্যকর হতে কিছু সময় বেশী লাগে। সাধারণতঃ ৩ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে ব্যথা অনুভূতি কমে যায়। তবে এটি কার্যকর থাকে প্রায় ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মত।

এটি mucous membrane-এ ভালোভাবে কাজ করে তাই বহির্ভাগে

অ্যানেস্থিসিয়া ভালোই হয়। এর সর্বাধিক মাত্রা ১২০ মিলিগ্রামের বেশী হওয়া উচিত নয়। এটি নার্ভ ব্লক, স্পাইনাল এবং এপিডুরাল অ্যানেস্থিসিয়াতে ব্যবহার করা হয়।

প্রিলোকেন (Prilocaine) :

এটিও লিগনোকেনের মত একটি ভালো লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এটি খুবই নিরাপদ ওষুধ, তবে methaemoglobinaemia হতে পারে। এই ওষুধ লিভার এবং কিডনিতে বিপাক হয়।

প্রিলোকেনের কার্যকারিতা অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়—প্রায় ৩ ঘন্টার মত। এটি নার্ভ ব্লকে, স্পাইনাল এবং এপিডুরাল অ্যানেস্থিসিয়াতে সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা হয়। সর্বাধিক মাত্রা ৪০০ মিলিগ্রাম, তবে এডরেনালিনের সংগে দিলে ৬০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত দেওয়া যায়। অত্যধিক মাত্রায় দিলে রোগী অচৈতন্য হয়ে যেতে পারে, সার্বিক অবসাদ (cardiovascular collapse) হতে পারে এবং এমন কি মৃত্যুও হতে পারে।

মেপিভ্যাকেন (Mepivacaine) :

এটি খুবই নিরাপদ লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এটি লিগনোকেনের চেয়েও কম ক্ষতিকারক। ইঞ্জেকশনের পরে খুবই তাড়াতাড়ি কার্যকরী হয় এবং এর স্থায়িত্ব প্রায় ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মত থাকে।

এটি ত্বকের নীচে ইঞ্জেকশন দিয়ে, নার্ভ ব্লকে, স্পাইনাল এবং এপিডুরাল অ্যানেস্থিসিয়াতে ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ ৪০০ মিলিগ্রামের বেশী মাত্রায় মেপিভ্যাকেন দেওয়া উচিত নয়।

ইঞ্জেকশনের পর খুবই কম উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অল্প রক্তচাপহ্রাস এবং নাড়ীর গতিবৃদ্ধি হতে পারে। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে প্রসবকালীন সময়ে মেপিভ্যাকেন না দেওয়াই উচিত। কেননা এটি গর্ভপুষ্প বা placenta দিয়ে বেরুতে পারে এবং তার ফলে শিশুর ক্ষতি হতে পারে।

বুপিভ্যাকেন (Bupivacaine) :

এটি একটি নতুন লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এটি লিগনোকেন এবং মেপিভ্যাকেনের চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বেশী কার্যকরী। ইঞ্জেকশনের পরে এর

কার্যকারিতা সব থেকে বেশী সময় স্থায়ী থাকে—প্রায় ৫ থেকে ১৬ ঘণ্টার মত। সর্বাধিক মাত্র ২ মিলিগ্রাম প্রতি কে. জি. হিসাবে। এটির সংগেও এডরেনালিন দেওয়া যায়, তবে তাতে কার্যকারিতা খুব একটা বাড়ে না।

বুপিভ্যাকেন নার্ভ ব্লক, এপিডুরাল অ্যানেস্থিসিয়া ইত্যাদিতে ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়। অন্যান্য লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের তুলনায় এটি কম ক্ষতিকারক।

এটিডোকেন (Etidocaine) :

এটি একটি নতুন লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ এবং এটি লিগনোকেন থেকে উদ্ভূত। এটিডোকেনের কার্যকারিতা লিগনোকেনের চেয়ে অনেক বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকে। এর motor ব্লক sensory ব্লকের তুলনায় অধিকতর কার্যকরী। সুতরাং উপযুক্ত sensory ব্লকের জন্য এটিডোকেনের মাত্রা বেশী পরিমাণে দিতে হয়। বুপিভ্যাকেনের চেয়ে এটিডোকেনের ব্লক তাড়াতাড়ি হয় এবং এডরেনালিনের সংগে ব্যবহার করলে এটিডোকেনের কার্যকাল অনেকক্ষণ বেশী স্থায়ী হয়।

এপিডুরাল অ্যানেস্থিসিয়ায় এটিডোকেন ১% সলিউশনে ব্যবহার করা হয় এবং সাধারণতঃ ২০ মিলিলিটার সলিউশন লাগে। এর সংগে এডরেনালিন (৫ মাইক্রোগ্রাম / মিলিলিটার হিসাবে) দিলে ব্লকের স্থায়িত্ব ২ থেকে ৫ ঘণ্টা থাকতে পারে। প্রসবকালীন ব্যথা উপশমে এটিডোকেনের ব্যবহারে বিশেষ সুবিধা হয় না, কেননা এর sensory ব্লক সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই। অবশ্য অন্যান্য নার্ভ ব্লক এবং প্লেক্সাস ব্লকে এটিডোকেন ভালোভাবে ব্যবহার করা যায়। এটিডোকেন বুপিভ্যাকেনের চেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি শরীর থেকে নির্গত হয়ে যায় এবং এর toxicity তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়ার কিছু ঔষধপত্র

দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য সাধারণতঃ কখনোই জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া প্রয়োগ করা হয় না। কিন্তু কয়েকটি জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ বিশেষতঃ নাইট্রাস অক্সাইড, ট্রাইক্লোরোএথিলিন এবং মেথোক্সিফ্লুরেন ব্যথা উপশমের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে—রোগীকে অ্যানেস্থিসিয়া না দিয়েই। এতে রোগী অজ্ঞান হয় না, শুধু ব্যথা উপশমই হয়।

নাইট্রাস অক্সাইড (Nitrous oxide) :

শ্বাসগ্রহণযোগ্য অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে নাইট্রাস অক্সাইড খুবই বহুল ব্যবহৃত। এটি একটি রঙহীন মিষ্টিগন্ধের গ্যাস এবং এটি বাতাসের থেকে দেড়গুণ ভারী। এটি নীলরঙের সিলিন্ডারে ৭৫০ পাউন্ড / ইঞ্চি² চাপে তরল অবস্থায় থাকে। এটি দাহ্য নয় এবং বিস্ফোরণও ঘটায় না।

রক্তের প্লাজমাতে এই গ্যাস বেশী দ্রবীভূত হয়। কিন্তু হিমোগ্লোবিনে বা শরীরের অন্য কিছুতে এটি সংযুক্ত হয় না। এটি মস্তিষ্ককে অবদমিত করে। রোগীর ব্যথা বেদনা দূর হয়, এমন কি অ্যানেস্থিসিয়াও হয়। অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে এটি ব্যবহার হলেও শুধুমাত্র নাইট্রাস অক্সাইড দিয়ে অ্যানেস্থিসিয়া দিলে তা খুব বেশী পরিমাণে দিতে হয় এবং তার ফলে অক্সিজেনের ভাগ অত্যন্ত কমে যায়। সুতরাং রোগীর শরীরেও অক্সিজেনের অভাব ঘটে। তবে এটি ব্যথা বেদনা ভালোই উপশম করতে পারে। অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় অন্য উদ্বায়ী (volatile) অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ পরিপূরক হিসাবে নাইট্রাস অক্সাইডের সংগে দেওয়া হয়। নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহারে বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। অ্যানেস্থিসিয়ার পরে বমি হয় না। সোডালাইমের সংগে ব্যবহার করা যায়। এটি ব্যবহারের পর শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগেই আবার দেহ থেকে অপরিবর্তিত অবস্থায় বেরিয়ে যায়।

শুধুমাত্র ব্যথা উপশমের জন্য অক্সিজেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড শতকরা ৫০ ভাগ হিসাবে খুব সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা যায়। এই অক্সিজেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড মিকসচারের নাম এন্টোনক্স (entonox)। এটি সিলিন্ডারে ২০০০ পাউন্ড / ইঞ্চি² চাপে একই সংগে থাকে। খুব ঠান্ডা অবস্থায় (−৭° সেন্টিগ্রেড) এই সিলিন্ডার রাখলে অক্সিজেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড আলাদা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে রোগীকে প্রয়োগের সময় প্রথমদিকে বেশী অক্সিজেন এবং শেষদিকে বেশী নাইট্রাস অক্সাইড যায়। এ ক্ষেত্রে সিলিণ্ডারটি যদি ৫২° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার জলে ডুবিয়ে রাখা হয় এবং তিনবার উপর নীচ করে নেড়ে নেওয়া হয়, তবে আবার ঠিক হয়ে যায়। আবার সিলিণ্ডারটিকে ১০° সেন্টিগ্রেডে ২ ঘণ্টার মত রাখলেও ভালো হয়।

এই এন্টোনক্স সিলিন্ডার থেকে একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেন

এবং নাইট্রাস অক্সাইড শতকরা ৫০ ভাগ হিসাবে একই সংগে দেওয়া হয়। এই যন্ত্র মোটামুটি হাল্কা ধরনের মজবুত এবং সহজেই বহনযোগ্য।

এই এন্টোনক্স শল্যচিকিৎসার পরে ক্ষত ড্রেসিং করার সময়, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনা উপশমের ক্ষেত্রে, প্রসব বেদনা উপশমের ক্ষেত্রে এবং এমন কি করোনারী থ্রম্বোসিসের হৃৎপিণ্ডের ব্যথা কমানোর জন্য সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা যেতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী অসহ্য ব্যথা বেদনার ক্ষেত্রে এই এন্টোনক্সের সংগে অন্য ব্যথানাশক ওষুধ যেমন অ্যাসপিরিন বা মরফিন দেওয়া যেতে পারে।

নাইট্রাস অক্সাইড যদি শতকরা ৭০ ভাগ হিসাবে দেওয়া হয় তবে তা আরও ভালোভাবেই ব্যথা উপশম করতে পারে। কিন্তু তার ফলে অনেক সময় রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে সংজ্ঞালোপ কখনোই কাম্য নয়। সুতরাং শতকরা ৫০ ভাগ নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করাই বিধেয়।

ট্রাইক্লোরোএথিলিন (Trichloroethylene) :

ট্রাইক্লোরোএথিলিন একটি বর্ণহীন তরল উদ্বায়ী অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এটিতে waxoline নীল রঞ্জন (blue dye) দিয়ে রঙ করা থাকে—যাতে সহজেই ওষুধটিকে চেনা যায়। এটি মোটেই দাহ্য নয়—বিস্ফোরকও নয়। ট্রাইক্লোরোএথিলিন কখনোই closed circuitএ ব্যবহার করা উচিত নয়, কেননা সোডালাইমে এটি ডাইক্লোরোএসিটিলিন তৈরী করে—যার বিষক্রিয়ায় রোগীর নানান উপসর্গ, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে এটি বেশ কার্যকরী। এতে ব্যথা উপশমও বেশ ভালো হয়। এর প্রয়োগে রক্তচাপ মোটামুটি ঠিক থাকে, তবে নাড়ীর গতি কমতে পারে এবং হৃৎস্পন্দনের ছন্দপতন হতে পারে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বেড়ে যেতে পারে। এতে মাংসপেশীর শিথিলতা খুব একটা হয় না। অ্যানেস্থিসিয়ার পর বমি বড় একটা হয় না।

এই অ্যানেস্থিসিয়ার পর খারাপ উপসর্গ খুব বেশী দেখা দেয় না। এটি লিভার এবং কিডনির বিশেষ ক্ষতি করে না। তবে অনেকক্ষণ অনেকবেশী প্রয়োগের ফলে শরীরে এই ওষুধ জমে থাকতে পারে। এটি বেশীর ভাগ অপরিবর্তিত অবস্থায় শরীর থেকে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগেই বেরিয়ে যায়, তবে খানিকটা প্রস্রাবের সংগেও কয়েকদিন ধরে বেরিয়ে যায়।

ট্রাইক্লোরোএথিলিন শুধুমাত্র ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায় এবং তখন রোগী সম্পূর্ণ সজাগই থাকে। প্রসববেদনা কমানোর জন্য, দীর্ঘস্থায়ী অসহ্য ব্যথা উপশমের জন্য ট্রাইক্লোরোএথিলিন সাধারণ বাতাসের সংগে রোগীকে দেওয়া হয়। তবে এর মাত্রা শতকরা ০·৩৫ থেকে ০·৫ মধ্যে রাখতে হয়। বেশীমাত্রায় অনেকক্ষণ এই ওষুধ রোগীকে দিলে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে এবং অন্যান্য খারাপ উপসর্গও আসতে পারে।

ব্যথা উপশমের জন্য ট্রাইক্লোরোএথিলিন এবং সাধারণ বাতাস ব্যবহার করার জন্য বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির দরকার হয়। সব যন্ত্রপাতির মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের একটি টেকোটা (Tecota) মার্ক্ড ইনহেলার এবং অন্যটি ইমোট্রিল (emotril) ইনহেলার। এই দুইটি যন্ত্রপাতিই ট্রাইক্লোরোএথিলিনের প্রয়োগ মাত্রা সঠিক রাখতে সাহায্য করে। তাপ কমা বা বাড়ার জন্য ট্রাইক্লোরোএথিলিনের মাত্রা কমে না বা বাড়ে না। সাধারণভাবে প্রসববেদনা কমানোর সময় মায়ের ঝিমুনি এলেই এই ওষুধের প্রয়োগ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। দীর্ঘস্থায়ী অসহ্য ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রেও টানা ৬ ঘন্টার বেশী ট্রাইক্লোরোএথিলিন ব্যবহার করা উচিত নয়।

মেথোক্সিফ্লুরেন (Methoxyflurane) :

এটি একটি halogenated ইথার। এটি একটি স্বচ্ছ, রং-হীন, তরল উদ্বায়ী অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ। এর বেশ মিষ্টি গন্ধ আছে। এটি সাধারণভাবে দাহ্য নয় এবং বিস্ফোরণও ঘটায় না। এটি সোডালাইমের সংগে ব্যবহার করা যায়।

মেথোক্সিফ্লুরেন বেশ ভালোভাবে ব্যথা বেদনা দূর করে এবং এতে ভালো অ্যানেস্থিসিয়া হয়। তবে অ্যানেস্থিসিয়ার আরম্ভ খুব ধীরে হয়। এতে মাংসপেশীর শিথিলতা ভালোই হয়।

মেথোক্সিফ্লুরেন প্রয়োগে নাড়ীর গতি মোটামুটি ঠিকই থাকে, তবে রক্তচাপ হ্রাস হতে পারে। তবে রোগীর শরীরে যদি অক্সিজেনের অভাব ঘটে বা রক্তে কারবন ডাইঅক্সাইডের আধিক্য ঘটে, তবে হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হতে পারে। এর অত্যাধিক মাত্রায় শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হতে পারে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়।

মেথোক্সিফ্লুরেন সাধারণতঃ লিভারে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। তবে কিডনির কাজ ব্যাহত হতে পারে এবং তার ফলে নানা উপসর্গে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

মেথোক্সিফ্লুরেন বেশীর ভাগ শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগেই শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তবে কিছু পরিমাণে লিভারে biotransformation হয় এবং সেই বিপাকীয় পদার্থগুলি প্রস্রাবের সংগে বেরিয়ে যায়। অ্যানেস্থিসিয়ার পরবর্তী ১২ দিন পর্যন্ত প্রস্রাবের সংগে এই সব পদার্থ বেরুতে পারে।

মেথোক্সিফ্লুরেন শুধুমাত্র ব্যথাউপশমের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় বিশেষতঃ প্রসববেদনা কমানোর জন্য এবং দীর্ঘস্থায়ী অসহ্য ব্যথা বেদনা নিরসনের জন্য। এর জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতির দরকার হয় এবং রোগী নিজের ইচ্ছামত নিজেই এই ওষুধ নিতে পারে। সাধারণতঃ ০·৩% থেকে ০·৫% মেথোক্সিফ্লুরেন সাধারণ বাতাসের সংগে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ কার্ডিফ (cardiff) ইনহেলার সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা যায়।

এটি ট্রাইক্লোরোএথিলিনের মতই কার্যকরী ব্যথানাশক ওষুধ। তবে মেথোক্সিফ্লুরেনে কিডনির স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হতে পারে এবং এটি অপেক্ষাকৃত দামী ওষুধ। মেথোক্সিফ্লুরেন প্রয়োগে রোগী বেশ শান্ত হয়ে পড়ে এবং রোগী প্রায় ঘুমিয়ে পড়ে। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মেথোক্সিফ্লুরেনের মাত্রা খুব বেশী হয়ে না পড়ে অথবা অনেকক্ষণ ধরে যেন এই ওষুধ প্রয়োগ করা না হয়। এক সংগে ২ ঘণ্টার বেশী মেথোক্সিফ্লুরেন না দেওয়াই উচিত। রোগী যদি ট্রেট্রাসাইক্লিন (tetracycline) বা জেন্টামাইসিন (gentamycin) পায়, তবে মেথোক্সিফ্লুরেন প্রয়োগ না করাই উচিত, কেননা তাতে কিডনি খারাপ হওয়ার আশংকা বাড়ে।

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্যথা উপশমে নার্ভ ব্লক

দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য নার্ভ ব্লক একটি অতি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা। অসহ্য ব্যথা বেদনা বিশেষতঃ ক্যানসারঘটিত ব্যথা বেদনা অনেক সময়েই নার্ভ ব্লকের সাহায্যে উপশমের চেষ্টা করা হয়। এই নার্ভ ব্লক বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়। যে নার্ভগুলি ব্যথা বেদনার জন্য দায়ী সেগুলিকে ঠিক-ভাবে নির্ণয় করা হয় এবং তারপর সেগুলিকে ব্লক করা হয়। বিভিন্ন নির্ণয় পদ্ধতির মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। নার্ভকে বিশেষ পদ্ধতিতে উদ্দীপনা জাগিয়ে তার সঠিক অবস্থান বোঝা যেতে পারে। এর জন্য nerve stimulator বা intensifier ব্যবহার করা হয়। এরপর লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ঐ নার্ভে অথবা তার আশেপাশে ইঞ্জেকশন দিয়ে নার্ভ ব্লক করা হয়। এই অধ্যায়ে কিছু বহুলপ্রচারিত নার্ভ ব্লক সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

নার্ভ ষ্টিমুলেটর (Nerve stimulator) :

এটিকে অনেক সময় block aid monitor বলা হয়। এর নির্ধারিত সূঁচটি অগ্রভাগ ছাড়া সবটাই অপরিবাহী। নার্ভের কাছাকাছি এই সূঁচটি ফোটানো হয় এবং তারপর এর মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা জাগানো হয়। বৈদ্যুতিক প্রবাহ কম বেশী করে motor বা sensory উদ্দীপনা বা stimulation করা হয়। এই সূঁচ দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ গেলে সব থেকে বেশী বিদ্যুৎ উদ্দীপনা হয় এর অগ্রভাগে। অবশ্য বেশী বৈদ্যুতিক প্রবাহ গেলে গোটা সূঁচটি দিয়েই বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা জাগে। সুতরাং সাধারণভাবে গোটা সূঁচটি অপরিবাহী না হলেও চলে। এই যন্ত্রের সাহায্যে নার্ভের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে বিশেষ সুবিধা হয়।

Intensifier :

এটি আসলে image intensifier। এটি অত্যন্ত দরকারী যন্ত্র, এর সাহায্যে

সঠিক নার্ভ, নার্ভ প্লেক্সাস ইত্যাদি নিরূপণ করা যায়। প্রান্তিক নার্ভ ব্লক অথবা spinal canalএ নার্ভ ব্লক করতেও এটি ব্যবহার করা হয়। এতে x-ray এবং টেলিভিশন একত্রে থাকে। দরকার মত যে কোন ভংগিমায় x-ray করে সংগে সংগে সেটি টেলিভিশনে দেখা যায়। সুতরাং নার্ভ ব্লক করার সময় সূঁচটি ঠিক জায়গায় নেওয়া দরকার। এই যন্ত্রের সাহায্যে সূঁচের সঠিক অবস্থান নিরূপণে যথেষ্ট সহায়তা হয়। এই যন্ত্র percutaneous cordotomy, পিটুইটারি গ্রন্থিতে ইঞ্জেকশন, lumbar sympathetic block অথবা coeliac plexus block করতে খুবই প্রয়োজনে লাগে। যখন একটি বিশিষ্ট নার্ভকে নষ্ট করার জন্য neurolytic ওষুধ ইঞ্জেকশন দিতে হয়, তখন সঠিক নার্ভের অবস্থান না বুঝতে পারলে আশেপাশের অন্য নার্ভগুলিও নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে।

নার্ভ ব্লক করার জন্য যে সব লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ব্যবহার করা হয় তা মোটামুটি ষোড়শ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এই সব লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের অনেক সময় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়—সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। অবশ্য অনেক কারণেই এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। যেমন, কী ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর। অনেক বেশী মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগের ফলে, অত্যধিক concentration-এ ওষুধ প্রয়োগের জন্য, ভুলক্রমে ধমনীতে ওষুধ ইঞ্জেকশনের ফলে—আরও নানা কারণে এ রকমের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। রোগীর সেই ওষুধে hypersensitivity থাকলে, ইঞ্জেকশনের জায়গায় বেশী প্রদাহ থাকলে, রোগীর লিভারের অবস্থা খারাপ থাকলে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ না প্রয়োগ করাই ভালো। কেননা এ সব ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

দীর্ঘস্থায়ী ব্লকের জন্য কয়েকটি বিশেষ ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়। প্রান্তিক নার্ভের ক্ষেত্রে এবং স্পাইনাল বা এপিডুরাল ব্লকের জন্যও এই সব ওষুধ লাগে। এদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, অ্যাল-কোহল, ফেনল, ক্লোরোক্রেশল, ঠান্ডা স্যালাইন ইত্যাদি।

অ্যালকোহল (Alcohol):

ব্যথার দীর্ঘস্থায়ী উপশমের জন্য অনেক সময় নার্ভ ব্লকে অ্যালকোহল

ব্যবহার করা হয়। ১০০% অ্যালকোহল প্রান্তিক নার্ভে ব্যবহার করলে neurit's হতে পারে। সুতরাং একান্ত প্রয়োজনেই এটি ব্যবহার করা উচিত। নতুবা neuritis এর জন্যই পরে আবার ব্যথা হতে পারে।

স্পাইনাল ব্লকও এই অ্যালকোহল দিয়ে করা যায়। এ ক্ষেত্রে cerebrospinal fluid-এর চেয়ে অ্যালকোহলের specific gravity কম সুতরাং hypobaric। সুতরাং subarachnoid space-এ অ্যালকোহল ইঞ্জেকশন দিলে এটি ভাসে এবং সব থেকে উপরের লেভেলে থাকে। সুতরাং ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় রোগীকে ঠিকমত ভংগিমায় রাখা দরকার, যাতে উপরের দিকে অ্যালকোহল গিয়ে নির্বাচিত নার্ভগুলিকে ব্লক করতে পারে। এটি সাধারণ থোরাসিক লেভেলে ব্লক করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এখানেও image intensifier ব্যবহার করে সুঁচটির অবস্থিতি নির্ণয় করলে ভালো হয়।

রোগীকে এমনভাবে শোওয়াতে হয় যাতে ব্যথার দিকটি উপরের দিকে থাকে। অ্যালকোহল ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর অন্ততঃ ১ ঘণ্টা রোগীকে সেই ভংগিমায় রাখা উচিত যাতে ব্লক ভালো কার্যকরী হয়। অ্যালকোহল ইঞ্জেকশনের পরই রোগীর ব্যথা উপশম হয় না—অনেক সময় ৪৮ ঘণ্টা এমন কি এক সপ্তাহও লাগতে পারে, পুরোপুরি ব্যথা উপশম হতে।

ফেনল (Phenol) :

ফেনল neurolytic ওষুধ হিসাবে ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। ৮% ফেনলের বেশী concentration ব্যবহার করা হয় না। ৬% ফেনলই বেশী ব্যবহার করা হয়। এটি গ্লিসারিনের সংগে মিশিয়ে ব্যবহার হয়। ২০ ভাগ অথবা ১৫ ভাগ গ্লিসারিনের সংগে ১ ভাগ ফেনল মেশানো হয়। যখন subarachnoid space-এ ফেনল ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় তখন এটি নিচের দিকে চলে আসে। কারণ এর specific gravity সুষুম্না রসের চেয়ে বেশী এবং তাই এটি hyperbaric। ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় রোগীকে ব্যথার দিকে শোওয়ানো দরকার। রোগী সাধারণতঃ জেগেই থাকে এবং রোগী তার ব্যথা কমছে কিনা বলতে পারে। তবে অনেক রোগী অনেকক্ষণ ব্যথার দিকে শুয়ে থাকতে অস্বস্তি বোধ করে।

এই neurolytic ওষুধ যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় সেকরাল নার্ভের সংস্পর্শে

আসে এবং নষ্ট হয়ে যায়, তবে প্রস্রাবের গন্ডগোল হতে পারে। ফেনল এপিডুরাল ব্লকেও ব্যবহার করা হয়।

ক্লোরোক্রেশল (Chlorocresol) :

এটি ফেনলের চেয়ে ভালো neurolytic ওষুধ। তবে এটি ফেনলের মত সংগে সংগে কার্যকরী হয় না। যখন ফেনল ইঞ্জেকশন দিয়ে বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না, তখন ক্লোরোক্রেশল ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এটির ব্যবহারেও কিছু কিছু উপসর্গ দেখা দেয়।

ঠান্ডা স্যালাইন (Cold saline)

অনেকটা পরিমাণে ঠান্ডা স্যালাইন subarachnoid space-এ ইঞ্জেকশন দিলে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার উপশম ঘটে। রোগীকে ব্যথার দিকে পাশ ফিরিয়ে শোয়ানো হয়। লাম্বার পাংচার করে cerebrospinal fluid অনেকটা বের করে দেওয়া হয়। তারপর প্রায় ৬০ মিলিলিটার বরফ ঠান্ডা স্যালাইন ইঞ্জেকশন করা হয়। এই ইঞ্জেকশন অত্যন্ত ব্যথাদায়ক তাই আগেই জেনারেল অথবা স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে নিতে হয়।

এই পদ্ধতিতে প্রায় সংগে সংগেই ব্যথা উপশম হয়। এর বিশেষ কোন খারাপ উপসর্গ নেই, প্রস্রাবের গন্ডগোলও হয় না। তবে এতে খুব বেশী পরিমাণ স্যালাইন দেওয়ার জন্য ফুসফুসের শোথ (pulmonary oedema) হতে পারে।

তবে এর কার্যকারিতা ঠিক ঠান্ডা স্যালাইনের জন্য নয় যদিও ঠান্ডায় প্রান্তিক নার্ভের conduction অবদমিত হয়। এর আসল কার্যকারিতা ঐ স্যালাইনের hypertonicity-র জন্য। সাধারণতঃ ৭.৫% স্যালাইন ব্যবহার করা হয়। এর ব্যবহারে রোগী কয়েক সপ্তাহ এমন কি কয়েক মাসও ব্যথাহীন থাকতে পারে। প্রয়োজনবোধে আবার ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতেও পারে।

কয়েকটি বিশেষ ধরনের নার্ভ ব্লক

স্টিলেট গ্যাংলিয়ন ব্লক (Stellate ganglion block) :

এই স্টিলেট গ্যাংলিয়ন সব থেকে নীচের সারভাইকাল গ্যাংলিয়ন এবং প্রথম থোরাসিক গ্যাংলিয়ন একত্রে মিলে তৈরী হয়। এটি সপ্তম সারভাইকাল ভার্টিব্রার

transverse process এবং প্রথম পঞ্জরের গলার মাঝে সপ্তম সারভাইকাল ভার্টেব্রার উপরে থাকে।

প্রথমে clavicle-এর অন্তর্দিকের প্রান্ত বুঝে তার থেকে ২ সেন্টিমিটার উপরে একটি পয়েন্ট নেওয়া হয়। সেখানে প্রথমে চামড়ায় অল্প লিগনোকেন ইঞ্জেকশন দিতে হয়। তারপর শ্বাসনালী এবং ক্যারোটিড রক্তনালীর নাড়ী ঠিকমত বুঝে নিতে হয়। একটি বড় সূঁচ ঠিক লম্বভাবে চামড়া ভেদ করে পাঠানো হয় প্রায় ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। এর মধ্যেই সপ্তম সারভাইকাল ভার্টেব্রায় সূঁচের অগ্রভাগ ঠেকবে। সেখানেই ১°/. লিগনোকেন ১০ মিলিলিটার ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

এই ব্লক ঠিকমত হলে চোখের তারা ছোট হয়ে পড়ে, চোখ ঢুকে যায় এবং চোখের পাতা নীচে ঝুলে পড়ে। একে Horner's syndrome বলে। তাছাড়াও মাথায়, গলায় এবং হাতে রক্তনালীর প্রসারণ ঘটে। চোখের মধ্যকার চাপ কমে যায়। শ্বাসনালীর secretion, লালা এবং ঘাম নিঃসরণ কমে যায়। এতে হৃৎপিন্ডের ব্যথা এবং হাতের কজালজিক ব্যথাও কমে যায়। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার ক্ষেত্রে অ্যালকোহল বা ফেনল ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে।

এই ব্লক প্রয়োগে কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এতে প্লুরা, খাদ্যনালী, ডুরা মেটার (dura mater) ফুটো হয়ে যেতে পারে। ফুসফুসে সূঁচ চলে গেলে বায়ুবক্ষ (pneumothorax) হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি থাকার জন্য ফ্রেনিক (phrenic) নার্ভ এবং ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসও (brachial plexus) ব্লক হয়ে যেতে পারে।

ষ্টিলেট গ্যাংলিয়ন ব্লক অনেক অসুখেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। হৃৎপিন্ডের ব্যথায়, carotid sinus syndrome, হাতের কজালজিয়া (causalgia) ব্যথায়, হাতের হার্পিশজনিত ব্যথায় ইত্যাদিতে এর প্রয়োগ করা যেতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী কাঁধের ব্যথায়, রক্তনালীতে সংকোচনের ফলে হাতের ব্যথায় এই ব্লক খুবই ভালোভাবে ব্যথা উপশম করতে পারে। মাথায় এবং হাতে রক্তপ্রবাহ বাড়ে। মাথায় এবং ঘাড়ের ক্যানসারজনিত দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য অনেক সময় সারভাইকাল গ্যাংলিয়নের সংগে cranial নার্ভও ব্লক করা হয় এবং এতে neurolytic ওষুধ যেমন অ্যালকোহল বা ফেনল ব্যবহার করা হয়। অবশ্য এই neurolytic ওষুধ ব্যবহারের আগে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়া

ওষুধ দিয়ে আগেভাগে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া উচিত। এই সব ব্লকে image intensifier ব্যবহার করলে বিশেষ সুবিধা হয়।

লাম্বার সিমপ্যাথেটিক ব্লক (Lumbar sympathetic block) :

এই ব্লক সাধারণতঃ causalgia, thrombophlebitis, স্বল্প রক্তপ্রবাহ-জনিত পায়ে ব্যথা, হারপিশজনিত পায়ে ব্যথা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা যায়।

এই সিমপ্যাথেটিক চেন এবং গ্যাংলিয়ন ভার্টিব্রার anterolateral surface-এ থাকে এবং এইখানেই এই ব্লক করা হয়। দ্বাদশ থোরাসিক এবং প্রথম লাম্বার গ্যাংলিয়ন অনেক সময় একত্র হয়ে যায়।

এই ব্লক প্রয়োগ করার সময় রোগীকে উপুড় করে অথবা পাশ ফিরে শোয়াতে হবে। শিরদাঁড়া সামনের দিকে ঝুঁকে থাকবে, তার জন্য একটি বালিশ নীচে দিতে হবে। প্রথমে spinous process বুঝে নিতে হবে এবং তার উপরের দিক থেকে ৪ থেকে ৫ সেন্টিমিটার পাশে একটি পয়েন্ট নিতে হবে। ঐখানে একটি বড় সূঁচ চামড়ায় লম্বভাবে রেখে ভিতরের দিকে নিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না হাড়ে ঠেকে। সেখান থেকে একটু সরিয়ে ৩০° উপরের দিকে নিয়ে গেলে ভার্টিব্রার গায়ে লাগবে। আরও একটু নিয়ে গেলে সূঁচের অগ্রভাগ যখন হাড় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে তখনই লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ যেমন লিগনোকেন ইঞ্জেকশন দিতে হবে। এই ব্লক করার সময় x-ray এবং image intensifier-এর সাহায্য পেলে ভালো হয়।

শল্যচিকিৎসায় lumbar sympathectomy করার আগে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দিয়ে এই ব্লক করে দেখে নেওয়া হয় যে এতে সত্যিই রোগীর উপকার হচ্ছে কি না। ব্লকটি সম্পূর্ণ করতে হলে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ লাম্বার ভার্টিব্রার লেভেলে ব্লক করতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য ৬% ফেনল অথবা ১০০% অ্যালকোহল ৩ মিলিলিটার মাত্রায় প্রত্যেক লেভেলেই দিতে হবে। তবে সূঁচের সঠিক অবস্থান intensifierএর সাহায্যে আগেই দেখে নিতে হবে।

সিলিয়াক প্লেক্সাস ব্লক (Coeliac plexus block) :

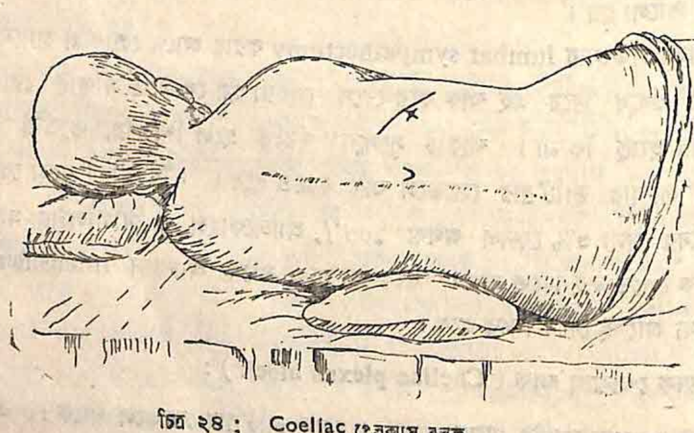
এই প্লেক্সাস পেটের মধ্যে প্রথম লাম্বার ভার্টিব্রার লেভেলে থাকে। এটি

দ্বাদশ থোরাসিক ভার্টিব্রার নীচের অর্ধের এবং প্রথম লাম্বার ভার্টিব্রার সামনে থাকে। এটি দুইটি এডরেনাল গ্রন্থির মাঝামাঝি জায়গায় coeliac artery এবং superior mesenteric artery-র সংগে থাকে। ডায়াফ্রামের crura-র সামনে এবং পাকস্থলী ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ অংগের পিছনে থাকে। এটি পেরিটোনিয়ামের বাইরে থাকে।

এই প্লেক্সাস দুইটি শরীরের মধ্য ভাগের দুই দিকে অবস্থান করে। পেটের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ প্রায় সমস্ত অংগের সিমপ্যাথেটিক এবং প্যারাসিমপ্যাথটিক স্নায়ু এই প্লেক্সাসের মধ্য দিয়ে যায়।

এই সিলিয়াক প্লেক্সাস ব্লক করলে পেটের মধ্যকার অংগসমূহের ব্যথা অনুভূতি থাকে না। অবশ্য pelvic viscera-র ক্ষেত্রে এটি খাটে না। এই ব্লকে অত্যধিক রক্তচাপহ্রাস হতে পারে। সুতরাং সেদিকে নজর রাখতে হবে এবং দরকার হলে আগেই শিরাপথে অন্তস্বরণ (infusion) দেওয়া যেতে পারে অথবা রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য এফিড্রিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া যেতে পারে।

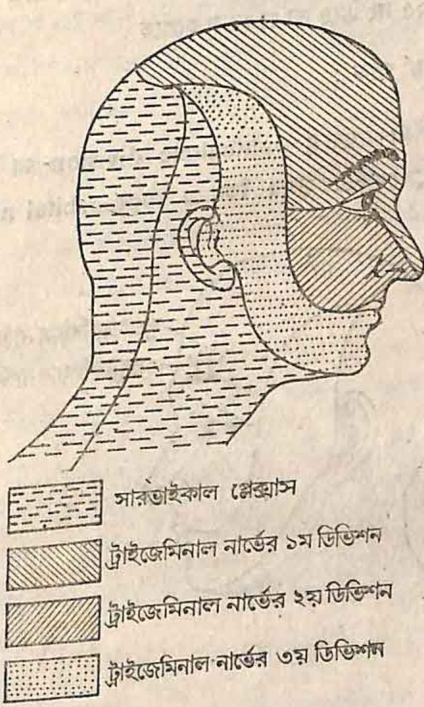
অগ্ন্যাশয়ে (pancreas) প্রদাহ হলে এই ব্লক খুবই উপকার দেয়। এতে ব্যথা কমে এবং অগ্ন্যাশয়ে রক্তপ্রবাহ বাড়ায়। উপর পেটের ক্যানসারজনিত দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা উপশমের জন্যও এই ব্লক করা হয়। এক্ষেত্রে ৫০% অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়। তবে তার আগে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দিয়ে দেখে নেওয়া উচিত যে এই পদ্ধতিতে সত্যিই রোগীর কোন উপকার হচ্ছে কি না।



চিত্র ২৪ ; Coeliac প্লেক্সাস ব্লক

প্রয়োগ পদ্ধতি (চিত্র ২৪) :

রোগীকে উপুড় করে শোওয়ানো হয়। কোলভাগে একটি বালিশ দিয়ে উরুদেশ একটু মুড়ে রাখা হয়। প্রথমে দ্বাদশ পাঁজরটি চিনে তার শরীরের মাঝ লাইন থেকে মোটামুটি ৭ সেন্টিমিটার দূরে একটি পয়েন্ট নিতে হবে। এটি সাধারণতঃ প্রথম লাম্বার স্পাইনের ঠিক পাশেই হয়। একটি প্রায় ৫ ইঞ্চি লম্বা সূচ ঠিক সমান্তরাল প্লেনে ফোটাতে হবে, যাতে এর অগ্রভাগ ঠিক প্রথম লাম্বার ভার্টিব্রার কাছে যায়। সাধারণভাবে সূচটি চামড়ার সংগে ৪৫ ডিগ্রি কোণে থাকে। প্রায় ৩ ১/২ থেকে ৪. ইঞ্চি সূচ ঢোকানোর পর এর অগ্রভাগ হাড়ে লাগে। তখন একটু সরিয়ে নিয়ে ঠিক ভার্টিব্রার পাশ দিয়ে আধ ইঞ্চির মত নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সিরিঞ্জ দিয়ে একটু টেনে দেখতে হবে কোন রক্ত আসছে কিনা। যদি না আসে ২০ থেকে ৪০ মিলিলিটার লোকাল অ্যানেস্থি-



চিত্র ২৫ : ট্রাইজেমিনাল নার্ভের অনুভূতি স্থান

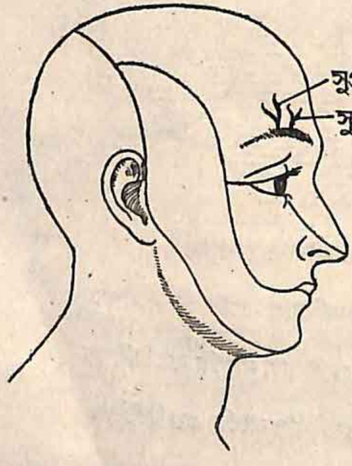
সিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দিতে হবে। এই ব্লকে লিগনোকেন, সিনকোকেন অথবা প্রিলোকেন (০·৫%) দেওয়া হয়। এর সংগে এডরেনালিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ব্লক (Trigeminal nerve block) :

ট্রাইজেমিনাল নিউর‍্যালজিয়ার অসহ্য ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য অনেক সময় এই ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ব্লক করতে হয়। এই নার্ভকে কখনও অন্তর্ভাগে কখনও বা প্রান্তিকভাগে ব্লক করা যেতে পারে। এই ট্রাইজেমিনাল নার্ভের বিভিন্ন শাখাকে দরকার মত ব্লক করা হয়। এদের মধ্যে কয়েকটি নার্ভ ব্লক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Infraorbital ব্লক, supraorbital ব্লক, mandibular নার্ভ ব্লক, এবং maxillary নার্ভ ব্লক প্রায়শই দরকার হতে পারে। এগুলির সম্বন্ধে কিছু অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ট্রাইজেমিনাল নার্ভ যে সব জায়গায় অনুভূতি যোগায় ২৫ নং চিত্রে তা দেখানো হয়েছে।

Supraorbital নার্ভ ব্লক :

এটি ট্রাইজেমিনাল নার্ভের ophthalmic division-এর অন্তর্গত একটি নার্ভ। এটি চক্ষু কোটরের উপর কিনারে supraorbital notch-এ থাকে।



চিত্র ২৬ : সুপ্রাঅরবিটাল নার্ভ ব্লক

এই নার্ভ ব্লক করার সময় প্রথমে রোগীকে ভালোভাবে চিৎ করে শোওয়ানো হয়। তারপর রোগীর supraorbital notch ঠিকমত হাতে অনুভব করতে হয়। একটি সূচ ঠিক লম্বভাবে এখানে ফোটানো হয় এবং ২ থেকে ৩ মিলিলিটার লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। (চিত্র ২৬)।

কপালের উপর দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে অ্যালকোহল ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে নার্ভের অবস্থিতি ঠিকমত নিরূপণ করে paraesthesia হলে তবেই নার্ভে ইঞ্জেকশন দেওয়া উচিত।

Infraorbital নার্ভ ব্লক :

এটি ট্রাইজেমিনাল নার্ভের maxillary division-এর অন্তর্গত একটি নার্ভ। এটি infraorbital foramen দিয়ে বেরিয়ে ম্যাক্সিলাতে আসে। দন্তচিকিৎসকরা সাধারণতঃ মুখের ভিতর থেকে এই নার্ভ ব্লক করেন। কিন্তু মুখের বাইরে থেকে এই নার্ভ ব্লক করাই বহুল প্রচারিত।

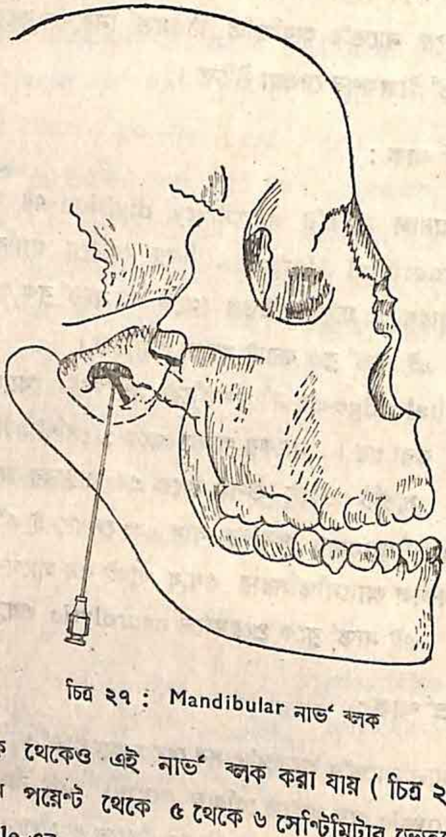
Inferior orbital ridge-এর নীচে শরীরের মধ্য লাইন থেকে ৩ সেন্টিমিটার দূরে এই নার্ভ ব্লক করা হয়। নাকের পাতা থেকে ১ সেন্টিমিটার দূরে চামড়ায় সূচ ফোটানো হয়। সূচটি একটু উপর দিকে এবং বাইরের দিকে চালানো হয় যাতে infraorbital foramen পর্যন্ত যায় এবং সেখানেই এই নার্ভ ব্লক করা হয়। এখানে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ খুবই কম লাগে—১ মিলিলিটার ওষুধ দিলেই হয়। এই নার্ভ ব্লকে প্রয়োজনে neurolytic ওষুধও দেওয়া হয়।

Mandibular নার্ভ ব্লক :

এটি ট্রাইজেমিনাল নার্ভের অন্তর্গত সব থেকে বড় নার্ভ। এটি মাথার মধ্য থেকে foramen ovale হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই নার্ভ mandible, pharynx, নীচের দাঁত, জিভের সামনের দুই তৃতীয়াংশ এবং কানের পিছনের দিকে অনুভূতি জোগায়। ট্রাইজেমিনাল নিউর্যালজিয়ার ব্যথা উপশমে এই নার্ভ ব্লক করা হয়। নীচের মাড়ির দাঁত তোলার ক্ষেত্রে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দিয়ে এই নার্ভ ব্লক করা হয়।

দাঁত তোলার ক্ষেত্রে এই ব্লক মুখের মধ্য দিয়ে করা হয়। মুখের মধ্যে mandible, retromolar fossa এবং internal oblique ridge প্রথমে বুঝে

নিতে হয়। এই ridge-এর ভেতরের দিকে এবং pterygomandibular ligament-এর বাইরের দিকে একটি সূচ ফোটানো হয়। অপর দিকের নীচের পাটির দাঁতের সমান্তরালে এই সূচ প্রায় ২·৫ সেন্টিমিটার পাঠানো হয়। সেখানেই ২ থেকে ৩ মিলিলিটার লোকাল অ্যানেস্থেসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

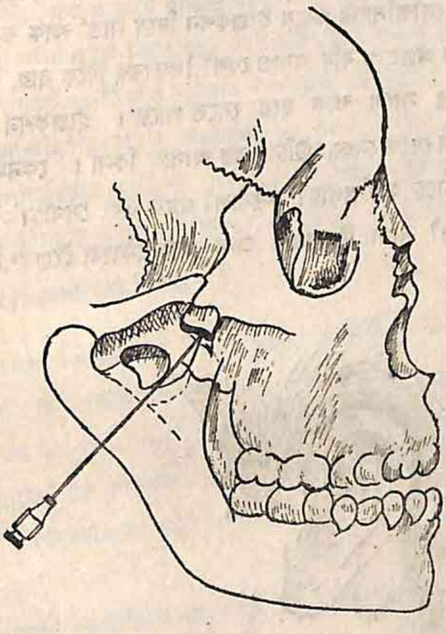


চিত্র ২৭ : Mandibular নার্ভ ব্লক

বাইরের দিক থেকেও এই নার্ভ ব্লক করা যায় (চিত্র ২৭)। এই নার্ভ zygoma-র মাঝ পয়েন্ট থেকে ৫ থেকে ৬ সেণ্টিমিটার ভেতরের দিকে থাকে। প্রথমে mandible-এর condyle এবং coronoid process বুঝে নিতে হয়। তারপর এর ঠিক মাঝ পয়েণ্টে একটা লম্বা সূচ চামড়ায় লম্বভাবে রেখে ফোটাতে হবে। এটি তখন প্রায় ৪ সেণ্টিমিটার গেলে pterygoid plate-এ লাগবে। এরপর একটু তুলে নিয়ে আবার ৬ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে নার্ভে সূচের অগ্রভাগ লাগলে রোগী বুঝতে পারে—paraesthesia হয়। এটি তখন foramen ovale-এর কাছেই থাকে এবং সেখানেই ৫ মিলিলিটার

লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। সূচ যদি বেশী দূর চলে যায় তবে eustachian tube-এ ক্ষতি হতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী অসহ্য ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়। তবে এর ব্যবহারের আগে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দিয়ে দেখে নেওয়া উচিত। এই ব্লকে **nerve stimulator**-এর সাহায্য পেলে খুবই সুবিধা হয়।



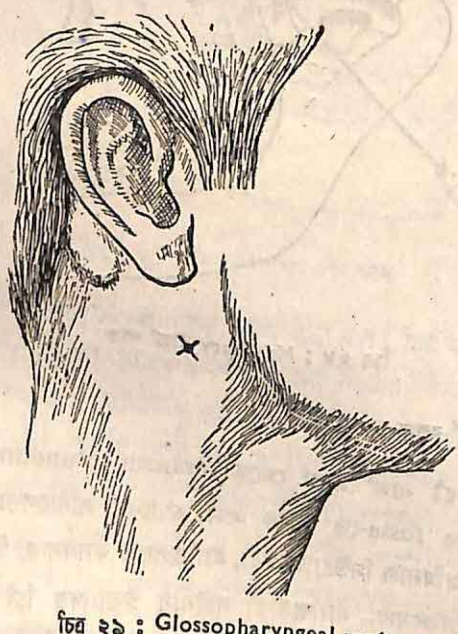
চিত্র ২৮ : Maxillary নার্ভ ব্লক

Maxillary নার্ভ ব্লক :

এই ম্যাক্সিলারী নার্ভ মাথা থেকে foramen rotundum দিয়ে বেরিয়ে pterygopalatine fossa-তে আসে এবং এখানেই সাধারণতঃ এই নার্ভ ব্লক করা হয়। ট্রাইজেমিনাল নিউর‍্যালজিয়া, ম্যাক্সিলাতে ক্যানসার, উপরের পাটিতে দন্ত এবং শল্যচিকিৎসায়, ম্যাক্সিলারী সাইনাস ইত্যাদির চিকিৎসায় এই নার্ভ ব্লক করা হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি (চিত্র ২৮) :

প্রথমে zygomatic arch-এর ঠিক মধ্যবর্তী স্থানটি নির্বাচন করতে হবে। সেখানে চামড়ায় লম্বভাবে সূচটি ফুটিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যাতে এই সূচের অগ্রভাগ lateral pterygoid plate-এ ঠেকে। তারপর ১ সেণ্টিমিটার সূচটি একটু তুলে আবার চালাতে হবে সামনের এবং উপরের দিকে। এতে সূচটি pterygopalatine fossa-তে ম্যাক্সিলারী নার্ভের কাছাকাছি আসবে। তখন লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দিয়ে নার্ভ ব্লক করা হয়। মনে রাখতে হবে সূচের অগ্রভাগ যদি আরও বেশী ভিতরের দিকে যায়, তবে infraorbital নার্ভও এর সংগে ব্লক হয়ে যেতে পারে। ইঞ্জেকশন দেওয়ার আগে সিরিঞ্জ একটু টেনে দেখে নেওয়া উচিত রক্ত আসছে কিনা। কেননা এই ম্যাক্সিলারী নার্ভের কাছে ম্যাক্সিলারী রক্তনালী থাকে এবং সেখানে সূচ ফুটে যেতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা উপশমের জন্য অ্যালকোহল ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে।



চিত্র ২৯ : Glossopharyngeal নার্ভ ব্লক

Glossopharyngeal নার্ভ ব্লক :

ট্রাইজেমিনাল নার্ভের এবং গ্লশোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভের নিউর্যালজিয়া হলে এই নার্ভ ব্লক করার প্রয়োজন হয়। জিভের পিছনের তৃতীয়াংশে শল্যচিকিৎসার সময় এই নার্ভ ব্লক করা যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে এর সংগে লিংগুয়াল (lingual) নার্ভ ব্লকও করা উচিত।

রোগীকে ভালোভাবে চিৎ করে শোয়ানো হয়। যে দিকে নার্ভ ব্লক করা হবে মুখটি তার উল্টো দিকে ঘুরিয়ে রাখতে হবে। প্রথমে mastoid process এবং mandible-এর কোণ বুঝে নিতে হবে এবং এদের ঠিক মাঝপয়েন্ট চিহ্নিত করতে হবে। সেই পয়েন্টে একটি সূচ চামড়ায় লম্বভাবে ফোটাতে হবে এবং মোটামুটি ৩ থেকে ৪ সেণ্টিমিটার গেলে styloid process-এ লাগবে। তখন একটু সরিয়ে আধ সেণ্টিমিটার styloid process-এর পিছনে যেতে হবে। সেখানে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন করে এই নার্ভ ব্লক করা হয় (চিত্র ২৯)।

Superior laryngeal নার্ভ ব্লক :

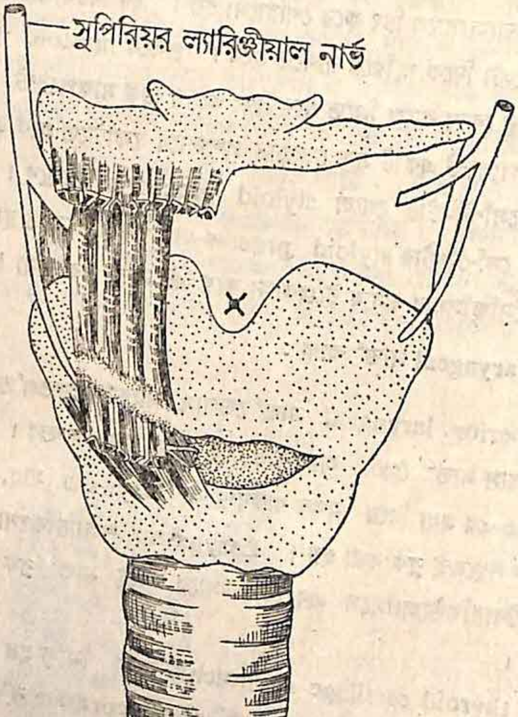
এই superior laryngeal নার্ভ ভেগাস নার্ভের অন্তর্গত একটি নার্ভ। এটিকে ভেগাস নার্ভ থেকে আলাদাভাবেই ব্লক করা সম্ভব। Thyrohyod membrane-এর মধ্য দিয়ে যখন বাকযন্ত্র বা larynx-এ যায়, সেই জায়গায় এই নার্ভকে সহজেই ব্লক করা হয়। Larynx-এর শল্যচিকিৎসায়, larynx-এর প্রদাহে টিউবারকিউলোসিসে এবং ক্যানসারে এই নার্ভ ব্লক করা প্রয়োজন হতে পারে।

প্রথমে thyroid cartilage-এর notchটি বুঝে নিতে হয়। সেখানে সূচ ফোটানো হয় এবং সূচটি hyod হাড়ের greater cornu-র নীচে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেই লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন করা হয়। দীর্ঘস্থায়ী অসহ্য ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে এই নার্ভ ব্লকে অ্যালকোহল ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় (চিত্র ৩০)।

ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস ব্লক (Brachial plexus block) :

এই প্লেক্সাস সাধারণতঃ পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম সারভাইকাল এবং প্রথম থোরাসিক নার্ভের anterior primary division দিয়ে তৈরী হয়।

এটিতে অনেক সময় চতুর্থ সারভাইকাল এবং দ্বিতীয় থোরাসিক নার্ভের কিছু অংশ এর সংগে যুক্ত হতে পারে। এই নার্ভগুলি প্রথম পঞ্জরের দিকে একত্রিত হয় এবং anterior scalene ও medial scalene মাংসপেশীর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে। Clavicle-এর নীচের দিকে এটি subclavian vein এবং artery-র কাছাকাছি থাকে। এই প্লেক্সাস সমস্ত হাতের motor এবং sensory supply করে।

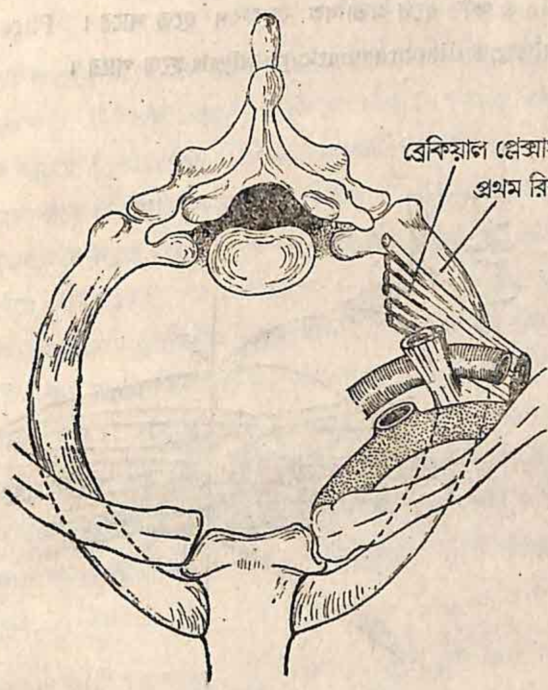


চিত্র ৩০ : সুপিরিয়র ল্যারিঞ্জীয়াল নার্ভ ব্লক

এই ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস ব্লক clavicle-এর উপর থেকে ব্লক করা যায়—তাকে বলে supraclavicular ব্লক। আর ঠিক বগলেতে ব্লক করলে তাকে বলে axillary ব্লক। যদি শুধু sensory ব্লক করা হয় তবে ১০ মিলিলিটার ১% অথবা ১·৫% লিগনোকেন ব্যবহার করা হয়। যদি পুরোপুরি motor ব্লক করতে হয় তবে ২% লিগনোকেন ব্যবহার করা দরকার।

Supraclavicular ব্লকের প্রয়োগ পদ্ধতি (চিত্র ৩১) :

রোগীকে অপারেশন টেবিলে চিৎভাবে শোয়ানো হয়। যেদিকে ব্লক করা হবে রোগীর মাথা তার উল্টোদিকে ফিরিয়ে রাখতে হবে এবং সেই দিকের হাতটি শরীরের পাশ দিয়ে নিয়ে একটু নীচের দিকে টেনে রাখতে হবে।

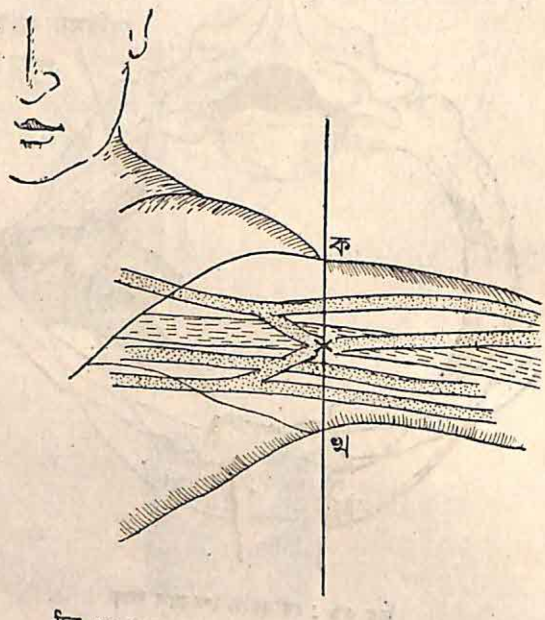


চিত্র ৩১ : ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস ব্লক
(Supraclavicular approach)

প্রথমে clavicle-এর মাঝ পয়েন্ট চিহ্নিত করতে হবে। তার ১ সেন্টিমিটার উপরের দিকে চামড়ায় একটি লম্বা সূচ ফোটাতে হবে এবং আস্তে আস্তে নীচের দিকে এবং পিছনের দিকে চালাতে হবে যতক্ষণ না প্রথম পাঁজরের গায়ে লাগে। সূচটি সাধারণতঃ ৩০° কোণে দেওয়া হয়। যদি সূচের অগ্রভাগ একেবারে নার্ভের গায়ে লাগে তবে রোগী তা বুঝতে পারে এবং বৈদ্যুতিক শক লাগার মত অনুভূতি হয়। যদি প্লেক্সাসে নাও লাগে তবুও ঐ জায়গায় এবং তার অল্প

আশেপাশে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ইঞ্জেকশন দেওয়ার আগে সিরিঞ্জ দিয়ে একটু টেনে দেখা উচিত রক্ত আসছে কিনা। রক্ত না এলে তবেই ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়।

এই ব্লকে কিছু উপসর্গ হতে পারে। সূচটি যদি ফুসফুসে ফুটে যায় তবে বায়ুবক্ষ (pneumothorax) হতে পারে। Subclavian artery এবং jugular vein-এ ক্ষতি হলে অত্যধিক রক্তক্ষরণ হতে পারে। Phrenic নার্ভ ব্লক হয়ে অনভিপ্রেত diaphragmatic paralysis হতে পারে।



চিত্র ৩২ : বাম বগলে ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের অবস্থান

Axillary ব্লকের প্রয়োগ পদ্ধতি (চিত্র ৩২):

এটিও ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস ব্লকের একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি। এর কয়েকটি সুবিধা আছে। এতে বায়ুবক্ষ (pneumothorax) হবার কোন ভয় থাকে না। অনভিপ্রেত ফ্রেনিক (phrenic) নার্ভ ব্লক, recurrent laryngeal নার্ভ ব্লক এবং ভেগাস নার্ভ ব্লক হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এর প্রয়োগ পদ্ধতি

অপেক্ষাকৃত সহজ এবং নিরাপদ। এটি দুই দিকে ব্লক করলেও কোন diaphragm paralysis বা শ্বাসকষ্টের কোন ভয় থাকে না।

এই ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস clavicle-এর নীচ দিয়ে গিয়ে রোগীর বগলে যায়। এই জায়গায় প্লেক্সাসের তিনটি cord, axillary artery এবং vein—একসংগে একটি connective tissue sheath-এর মধ্যে থাকে। এখানেই এই প্লেক্সাস ব্লক করা হয়।

রোগীকে অপারেশন টেবিলে শোয়ানোর পর যেদিকে ব্লক করা হবে সেই দিকের হাত সমকোণ (৯০°) abducted অবস্থায় রাখা হয়। হাতটি একটু বাইরের দিকে ঘুরে থাকলে (externally rotated অবস্থায়) ভালো হয়। ইঞ্জেকশনের জায়গা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। Axillary artery ভালোভাবে অনুভব করে নিতে হবে। তারপর একটি সূচ তার পাশ দিয়ে ঢোকানো হয় এবং ধীরে ধীরে চালানো হয় যতক্ষণ না fascial sheath ভেদ করে। সেখানেই ৫ থেকে ১০ মিলিলিটার ১.৫% বা ২% লিগনোকেন ইঞ্জেকশন দিতে হবে। সূচটি একটু তুলে নিয়ে axillary artery-র পেছনের দিকে একইভাবে ঐ ইঞ্জেকশন দিতে হবে। মোটামুটি ১০ মিনিটের মধ্যেই এই ব্লক কার্যকরী হয়।

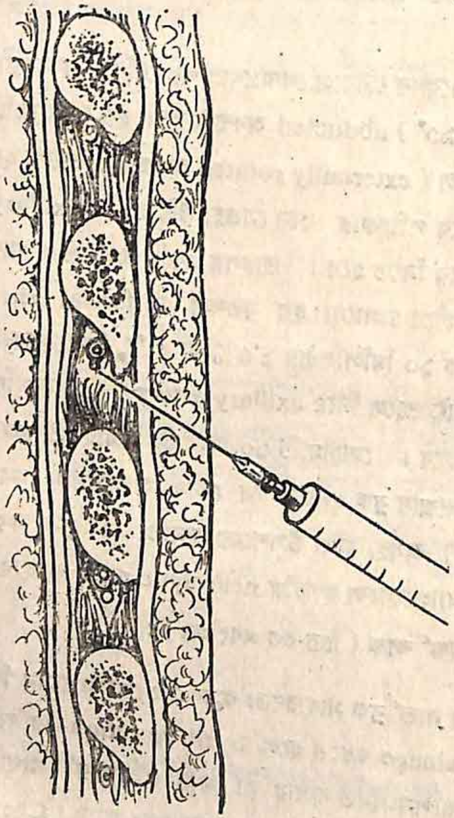
ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস ব্লক হাতের যে কোন অপারেশনে করা যেতে পারে। হাতের দীর্ঘস্থায়ী অসহ্য ব্যথা উপশমের জন্যও এই ব্লক করা যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে অ্যালকোহল জাতীয় neurolytic ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

Intercostal নার্ভ ব্লক (চিত্র ৩৩ এবং ৩৪):

ইণ্টারকস্টাল নার্ভ ব্লক সাধারণতঃ বুক এবং পেটের কোন কিছু অপারেশনে, empyema drainage করতে হলে বা rib resection-এর অপারেশনে ব্যবহার করা যায়। হারপিসজনিত ব্যথায় বা অন্য দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা উপশমের জন্য প্রয়োজনবোধে ইণ্টারকস্টাল ব্লক করার দরকার হতে পারে। Chest injury অথবা পাঁজর ভেঙে গেলে ব্যথা কমানোর জন্যও এই ধরনের ব্লক খুবই উপযোগী।

প্রত্যেক থোরাসিক স্পাইনাল নার্ভ intervertebral foramen থেকে বেরিয়ে এসে পাশাপাশি দুটি ভার্টিব্রার transverse process-এর মাঝামাঝি থাকে। এই নার্ভ intercostal space-এর মধ্যে গিয়ে পাঁজরের subcostal groove-এর মধ্যে থাকে। থোরাসিক শিরা, ধমনী এবং নার্ভ পরপর সাজানো থাকে।

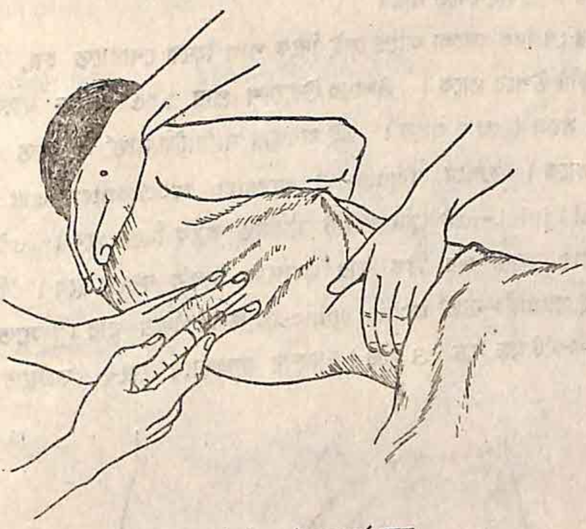
পিছনের দিকে থোরাসিক নার্ভ সাধারণতঃ external intercostal muscle এবং internal intercostal fascia-র মধ্যে থাকে। সামনের দিকে এই নার্ভ internal intercostal muscle এবং external intercostal fascia-র মধ্যে থাকে। থোরাসিক নার্ভকে যখন intervertebral foramen থেকে বের হওয়ার



চিত্র ৩৩ : ইন্টারকস্টাল নার্ভ ব্লক

পরই ব্লক করা হয় তখন তাকে paravertebral ব্লক বলে। এখানে থোরাসিক নার্ভ তার ramus communicans এবং posterior division নিয়ে ব্লক হয়। থোরাসিক নার্ভ যখন angle of rib-এর পর থেকে ব্লক করা হয় তখনই সেটি হয় ইন্টারকস্টাল (intercostal) নার্ভ ব্লক।

ইণ্টারকষ্টাল নার্ভ পাঁজরের যে কোন সুবিধাজনক অবস্থানে ব্লক করা যায়—পেছনের দিকে, পাশে অথবা সামনের দিকে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পাঁজরের angle-কেই বেছে নেওয়া হয়। সাধারণতঃ উপরের থোরাসিক নার্ভের ক্ষেত্রে midspinous line থেকে ৫ সেণ্টিমিটার দূরে এবং নীচের থোরাসিক নার্ভের ক্ষেত্রে ১০ সেণ্টিমিটার দূরে ইণ্টারকষ্টাল ব্লক করা হয়।



চিত্র ৩৪ : ইণ্টারকষ্টাল নার্ভ ব্লক

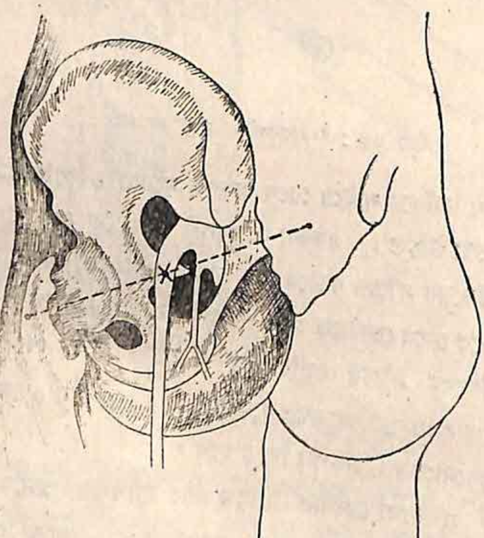
রোগীকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে রেখে আগেই মনোনীত পাঁজরটি ভালোভাবে অনুভব করে নেওয়া উচিত। একজন সহযোগী রোগীকে ধরে রাখলে সুবিধে হয়। এরপর পাঁজরের নীচের বর্ডারে ঠিক তার angle-এ একটি সুচ চামড়ার সংগে ঠিক লম্বভাবে রেখে ফোটাতে হবে—যতক্ষণ না হাড়ে লাগে। এবার আর একটু ঢুকিয়ে পাঁজরের নীচের বর্ডার পর্যন্ত যেতে হবে এবং intercostal fascia দিয়ে যাবার সময় অনুভব করে বুঝতে হবে। এখানে ৫ থেকে ৭ মিলিলিটার ১'৫% লিগনোকেন ইঞ্জেকশন দিতে হবে।

অপারেশনের বা ব্যথা বেদনার গুরুত্ব এবং ব্যাপকতা অনুযায়ী কতগুলি নার্ভ ব্লক লাগবে তা ঠিক করা হয়। সাধারণতঃ ৫ থেকে ৬টি সেগমেণ্ট (segment) ব্লক করতে হয় এবং অনেক সময় তা দু' দিকেই করতে হয়।

Sciatic নার্ভ ব্লক :

এই নার্ভ ব্লক অনেক সময় সায়েটিকাজনিত দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য ব্যবহার করা হয়। পায়ের শল্যচিকিৎসায় অন্য ব্লকের সংগে এই সায়েটিক নার্ভ ব্লকও করা হয়। Varicose vein-এর জন্য অপারেশনে এই ব্লকের সংগে ফিমোরাল (femoral) নার্ভ ব্লকও করতে হয়। এই সায়েটিক নার্ভ ব্লকের ফলে পায়ের রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায়।

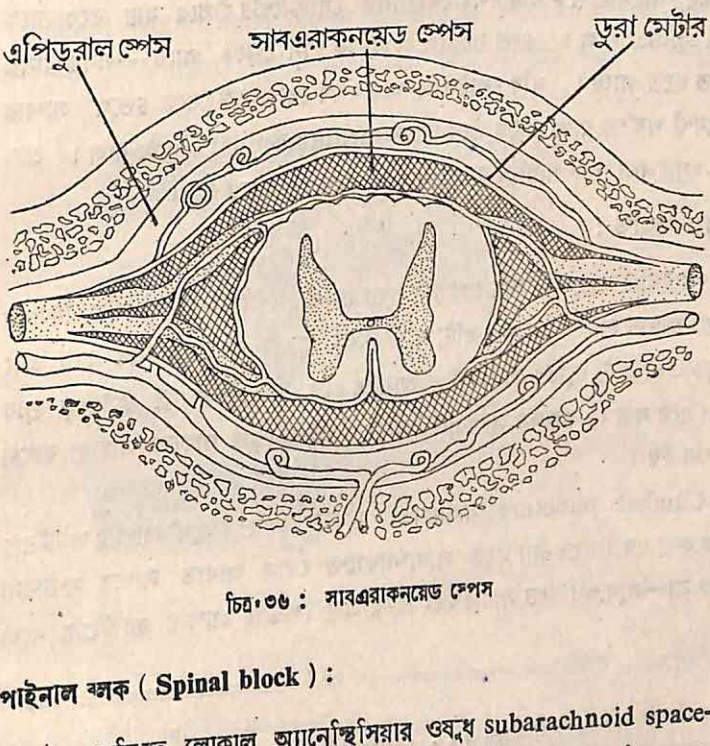
রোগীর যে দিক ভালো আছে সেই দিকে পাশ ফিরে শোয়াতে হয়, সুতরাং অসুস্থ দিকটি উপরে থাকে। উপরের উরুদেশ প্রায় ১৩৫° মুড়ে থাকে এবং নীচের পা সরল অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় সায়েটিক নার্ভ ঠিকমত টানটান অবস্থায় থাকে। প্রথমে femur-এর greater trochanter এবং sacro-coccygeal joint—এই দুটি পয়েণ্ট ঠিকমত বুঝে নিতে হবে। এই দুইটি পয়েণ্ট যোগ করার পর ঠিক তার মধ্যস্থান নির্ণয় করতে হবে। ঠিক এই জায়গাতেই সায়েটিক নার্ভ ischial spine-এর উপর দিয়ে যায়। সুতরাং ঐ জায়গাতে একটি বড় সুচ (৪ ইঞ্চি) চামড়ায় লম্বভাবে রেখে ফোটাতে হবে।



চিত্র ৩৫ : সায়েটিক নার্ভ ব্লক

এতে সূচের অগ্রভাগ নার্ভের গায়ে লাগলে paraesthesia হবে অথবা সূচ হাড়ের গায়ে লাগবে। সেখানেই ২০ থেকে ৩০ মিলিলিটার লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন দিতে হবে (চিত্র ৩৫) ঃ

এছাড়াও অনেক রকম পদ্ধতিতে সায়েটিক নার্ভ ব্লক করা যেতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনার ক্ষেত্রে বা ক্যানসারজনিত ব্যথার ক্ষেত্রে অ্যালকোহল দিয়ে ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে।



চিত্র ৩৬ : সাবএরাকনয়েড স্পেস

স্পাইনাল ব্লক (Spinal block) :

এই পদ্ধতিতে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ subarachnoid space-এ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। তার ফলে কিছু স্পাইনাল নার্ভ ব্লক হয়। ঐ সব নার্ভ শরীরের যে যে অংশে অনুভূতি যোগায়, সেই সব অংশে অ্যানেস্থিসিয়ার সৃষ্টি হয়। এই subarachnoid space সাধারণভাবে piamater এবং arachnoid mater-এর মধ্যবর্তী স্থান। এই স্থান সুষুম্না রস বা cerebrospinal fluid দিয়ে ভর্তি থাকে (চিত্র ৩৬)। এটি মস্তিষ্ক থেকে দ্বিতীয় সেকরাল ভার্টিব্রার নীচের লেভেল পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ হিসাবে ৫% লিগনোকেন খুবই ব্যবহার করা হয়। এর specific gravity সুষুম্না রসের থেকে বেশী। সুতরাং এটি hyperbaric এবং ইঞ্জেকশনের পরে এটি নীচের দিকেই থাকে। তাই ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় রোগীকে ঠিকমত ভংগিমায় রাখা উচিত। হাইপোবারিক ওষুধও পাওয়া যায় এবং সেক্ষেত্রে ওষুধটি ইঞ্জেকশনের পরে উপরের দিকে উঠে যায়। কিন্তু এই ওষুধ ব্যবহারের বিশেষ চল নেই।

এই স্পাইনাল ব্লক যদি দশম থোরাসিক সেগমেন্টের উপরে যায় তবে তাকে high spinal বলে। এতে রক্তচাপ অত্যধিক হ্রাস পেতে পারে—শ্বাসপ্রশ্বাসও ব্যাহত হতে পারে। যদি স্পাইনাল ব্লক দশম থোরাসিক থেকে চতুর্থ লাম্বার সেগমেণ্ট পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে তবে তাকে medium spinal block বলে। আর low স্পাইনাল ব্লকে সাধারণভাবে সেকরাল সেগমেণ্টই ব্লক হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি :

স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার সময় রোগীকে বসিয়ে অথবা পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে করতে হয়। রোগীর হাঁটু দুটি মুড়ে বুকের কাছে আনতে হবে এবং চিবুকটি ঐ হাঁটু দুটির কাছাকাছি আনতে হবে। এতে রোগী কুঁকড়ে প্রায় গোল হয়ে যায়। একজন সহকারী রোগীকে এই অবস্থায় থাকতে সাহায্য করলে সুবিধা হয়।

Lumbar puncture সাধারণতঃ তৃতীয় এবং চতুর্থ লাম্বার ভার্টিব্রার মাঝে করা হয়। কেননা এতে সুষুম্নাকাণ্ডে কোন আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে না—সুষুম্নাকাণ্ড সাধারণতঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় লাম্বার ভার্টিব্রার মধ্যে



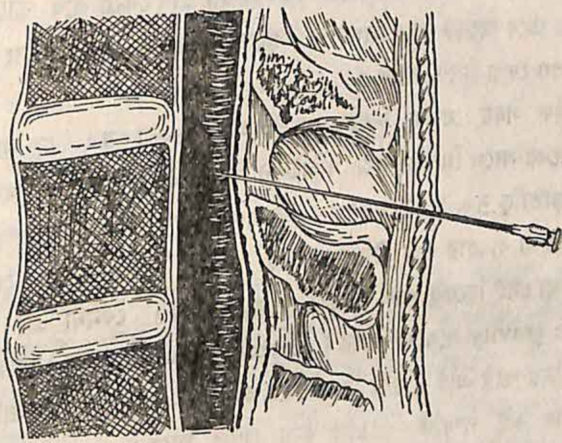
চিত্র ৩৭ : স্পাইনাল সূচ

শেষ হয়। প্রথমে ঐ জায়গাটিকে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দিয়ে অসাড় করে নেওয়া হয়। তারপর স্পাইনাল সূচ (spinal needle, চিত্র ৩৭) আস্তে আস্তে চালাতে হবে ঠিক শিরদাঁড়ার মাঝখানে এবং একটু উপরের দিকে। Duramater বিদ্ধ হয়েছে বুঝতে পারলে সূচের ষ্টিলেটটি খুলে নেওয়া হয়। তখন সূচ দিয়ে সুষুম্না রস (cerebrospinal fluid) বের হতে থাকে।

এরপর লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ মাত্রামত আস্তে আস্তে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। (চিত্র ৩৮)

স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়া কত কার্যকরী হবে তা নির্ভর করে অনেক কিছুর উপর—যেমন কী ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে, কতটা ব্যবহার করা হয়েছে, কী concentration-এ দেওয়া হয়েছে, কোন ভার্টিব্রার লেভেলে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে, কোন ভংগিমায় রোগীকে রাখা হয়েছে ইত্যাদি।

স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়ার অনেক কুফল হতে পারে। রোগীর রক্তচাপ অনেক কমে যেতে পারে। পরে রোগীর প্রচণ্ড মাথাব্যথা হতে পারে। পিঠেও



চিত্র ৩৮ : স্পাইনাল ব্লক

ব্যথা হতে পারে। রোগীর মস্তিষ্কে বা তার আবরণী meninges-এ প্রদাহ হতে পারে। রোগীর স্নায়ুঘটিত অসুখও হতে দেখা যায়।

স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়া কিন্তু ভালোভাবে মাংসপেশীসমূহে শিথিলতা আনতে পারে। রোগীর জ্ঞান পুরোমাত্রায় থাকে। ডায়াথার্মি বা cautery নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়ার কুফল দেখা যায় না।

অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়া না দেওয়াই উচিত। রোগীর অনিচ্ছা থাকলে, রোগীর মস্তিষ্কের অসুখ থাকলে, অত্যধিক রক্তাল্পতা থাকলে স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া হয় না। শিরদাঁড়ায় বিকৃতি থাকলে বা খারাপ

অসুখ থাকলে, পিঠের চামড়ায় প্রদাহ থাকলে, রোগীর রক্ত জমাট বাঁধার গোলমাল থাকলে কখনোই স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়া উচিত নয়।

দীর্ঘস্থায়ী ক্যানসারজনিত অসহ্য ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য অ্যালকোহল, ফেনল অথবা ক্লোরোক্রেশল দিয়ে স্পাইনাল ব্লক করা হয়। অধুনা বরফঠাণ্ডা স্যালাইন ইঞ্জেকশনও সাফল্যের সংগে দেওয়া হচ্ছে। অ্যালকোহল ব্যবহার করলে রোগীকে যে দিকে ব্যথা সেদিক উপরে রেখে পাশ ফিরিয়ে শোয়াতে হবে। এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র posterior nerve rootletsকেই ব্লক করা হয়—anterior motor root-কে বাদ দেওয়া হয়। এর ব্যবহারে কয়েকমাস পর্যন্ত ব্যথা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মোটামুটি শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে খুব ভালো সাফল্য আসে। তবে অনেক সময় মাংসপেশীসমূহে শিথিলতা, প্রস্রাব এবং পায়খানার গণ্ডগোলও দেখা দিতে পারে।

অনেক সময় ফেনল দিয়েও স্পাইনাল ব্লক করা হয়। ফেনল সাধারণতঃ গ্লিসারিনের সংগে মিশিয়ে ৫% সলিউশন হিসাবে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় এবং এতে বেশ তাড়াতাড়ি ব্লক কার্যকর হয়। এই পদ্ধতি শুধুমাত্র ক্যানসারজনিত যন্ত্রণা লাঘবের জন্য ব্যবহার করা উচিত। এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময় রোগীকে যে দিকে ব্যথা সেই দিকেই পাশ ফিরিয়ে শোয়াতে হবে। কেননা এই সলিউশনের specific gravity সুষুম্নারসের (cerebrospinal fluid-এর) চেয়ে বেশী এবং ইঞ্জেকশনের পরে এটি নীচের দিকে নেমে আসে। একই রোগীকে প্রয়োজনবোধে অনেকবার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে অন্যান্য উপসর্গ সাধারণতঃ কম হয়, তবে এতেও মাংসপেশীর শিথিলতা, প্রস্রাব এবং পায়খানার গণ্ডগোল হতে পারে।

বরফঠাণ্ডা স্যালাইন দিয়ে ব্লক দিলেও যন্ত্রণা লাঘব হতে দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে লাম্বার পাংচার করে খানিকটা সুষুম্নারস (cerebrospinal fluid) বের করে নেওয়া হয় এবং তার পর ২০ থেকে ৮০ মিলিলিটার বরফঠাণ্ডা স্যালাইন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। তবে সাধারণ তাপমাত্রায় ৭.৫% স্যালাইন ইঞ্জেকশন দিলেও ভালো কাজ পাওয়া যেতে পারে এবং এতে রোগী প্রায় ১০০ দিনের মত যন্ত্রণা বুঝতে পারে না। ঠাণ্ডা স্যালাইন ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় প্রচণ্ড ব্যথা হয়, তাই রোগীকে জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া দিয়ে এই ব্লক করা উচিত।

Spinal barbotage :

ক্যানসারজনিত যন্ত্রণায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। লাম্বার পাংচার করে ২০ মিলিলিটার সুষুম্নারস (cerebrospinal fluid) প্রথমে বের করে নেওয়া হয় এবং তারপরেই আবার সেই সুষুম্নারস ইঞ্জেকশন করা হয়। এইভাবে অন্ততঃ ১৫ বার বা তারও বেশীবার ইঞ্জেকশন দিতে হবে। সাধারণ তাপমাত্রাতেই এটি করা হয়। তবে তাতে কোন কাজ না হলে সুষুম্নারসকে ঠাণ্ডা করে আবার ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এতে অনেকসময় সুফল পাওয়া যায়। তবে অত্যধিক ঠাণ্ডা সুষুম্নারস ইঞ্জেকশনে রোগীর ভীষণ ব্যথা হয়। সুতরাং এতে অনেকসময় জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া লাগে। এই পদ্ধতিতে ঠিক কী ভাবে যন্ত্রণা লাঘব হয় তা বোঝা কঠিন। তবে এই barbotage যদি ব্যথা বেদনার সেগমেণ্টের জায়গায় করা হয়, তবে স্থানীয় চাপ সৃষ্টির জন্য যন্ত্রণা লাঘব সম্ভব হলেও হতে পারে।

এপিডুরাল ব্লক (Epidural block) :

এই পদ্ধতিতে স্পাইনাল নার্ভগুলিকে ব্লক করা হয় এপিডুরাল স্পেসের মধ্যে। লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ স্পাইনাল সূচের সাহায্যে এপিডুরাল স্পেসে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় এবং সেখানেই স্পাইনাল নার্ভগুলির ব্লক হয়।

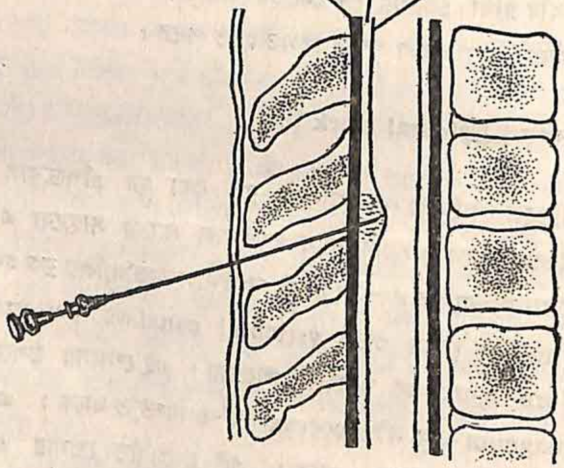
এই এপিডুরাল স্পেস থাকে vertebral canal-এর periosteum এবং স্পাইনাল dura mater-এর মধ্যবর্তী জায়গায়। এই স্পেসের উপরের দিকে foramen magnum এবং নীচে coccyx পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এই স্পেসে সাধারণভাবে নেগেটিভ প্রেসার থাকে। এই নেগেটিভ প্রেসার এপিডুরাল অ্যানেস্থিসিয়া দেওয়ার জায়গাটিকে চিনতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

এই এপিডুরাল স্পেস চেনার বেশ কয়েকটি উপায় আছে। লাম্বার পাংচার করার সময় সূচটি ligamentum flavum-কে ফুঁড়ে যাওয়ার পর প্রতিবন্ধ বেশ কমে যায়, এটি বেশ বোঝা যায়। তখন স্টিলেটটি খুলে নিয়ে ঐ স্পেসে বাতাস ইঞ্জেকশন দিলে বাতাস বেশ সহজভাবে চলে যাবে ঐ এপিডুরাল স্পেসে। অবশ্য অন্যভাবেও ঐ স্পেস বোঝা যায়। স্পাইনাল সূচের hub-এ স্যালাইনের ফোঁটা আগে থেকে দেওয়া থাকলে—ঐ স্পেসে সূচ গেলেই স্যালাইনের ফোঁটা নেগেটিভ

প্রেসারে ভেতরে টেনে নেয়। একটি ফোলানো বেলুন সূচের hub-এ লাগানো এপিডুরাল থাকলে স্পেসে সূচের অগ্রভাগ গেলেই বেলুনটি চুপসে যায়।

প্রয়োগ পদ্ধতি (চিত্র ৩৯) :

সাধারণভাবে রোগীকে শুইয়ে পাশ ফিরিয়ে ঠিক যেমনটি স্পাইনাল অ্যানেস্থিসিয়ার সময় করা হয় তেমনভাবেই এপিডুরাল ব্লক করা হয়। রোগীকে বসিয়ে এপিডুরাল ব্লক করা যায় না। নির্ধারিত intervertebral space-এ স্পাইনাল সূচ খুব আস্তে আস্তে চালাতে হবে। Ligamentum flavum দিয়ে



চিত্র ৩৯ : এপিডুরাল ব্লক

যাওয়ার পর স্টিলেটটি বের করে নেওয়া হয়। তখন সুষুম্নারস (cerebrospinal fluid) আসবে না এবং সিরিঞ্জ দিয়ে বাতাস দিলে তা সহজভাবে চলে যাবে। এতেই বোঝা যাবে সূচটি ঠিক এপিডুরাল স্পেসে আছে। তখন লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ধীরে ধীরে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। ১·৫% লিগনোকেন ১৫ থেকে ৩৫ মিলিলিটার দেওয়া যেতে পারে।

এপিডুরাল ব্লকে meningitis এবং স্নায়ুঘটিত কোন উপসর্গ সাধারণতঃ হয় না। স্পাইনাল ব্লকের মত এতে মাথাব্যথা হয় না। রোগীর রক্তচাপ একটু কমতে পারে, তবে খুব বেশী কমে না। এটি ভালোভাবে ব্যথা উপশম করে এবং মাংসপেশীসমূহে শিথিলতা আনে।

এই এপিডুরাল ব্লক যত্ন নিয়ে করা উচিত। অন্যমনস্কভাবে দিলে dural puncture হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্পাইনাল ব্লক করাই শ্রেয়। আবার সূচটি একটু সরিয়ে এনে এপিডুরাল স্পেসেই ইঞ্জেকশন দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য আবার অন্য intervertebral space-এ নতুন করে পাংচার করা যেতেও পারে।

অনিচ্ছাকৃতভাবে subarachnoid space-এ অনেকটা লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ ইঞ্জেকশন হয়ে গেলে total spinal block হতে পারে। এতে রোগীর অত্যধিক রক্তচাপহ্রাস হয়, শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। চোখের তারা প্রসারিত হয়ে পড়ে। রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় রোগীকে সংগে সংগে এন্ডোট্রেকীয়াল (endotracheal) টিউব পরিয়ে ১০০% অক্সিজেন দিয়ে শ্বাসকার্য চালাতে হয়। শিরাপথে জলীয় পদার্থ (fluid) দিতে হবে। রক্তচাপ বাড়ানোর জন্য vasopressor ওষুধ দিতে হবে।

এপিডুরাল ব্লক সবরকম পেটের অপারেশনে, পায়ের অপারেশনে এবং Caesarean section-এ ভালোভাবে দেওয়া যেতে পারে। ব্যথাহীন প্রসব বেদনার ক্ষেত্রেও এপিডুরাল ব্লক করা হয়। অপারেশন পরবর্তী ব্যথা বেদনার এবং ক্যানসারজনিত যন্ত্রণার উপশমে এপিডুরাল ব্লক খুবই কার্যকরী।

এপিডুরাল ব্লক কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠিকমত না হতে পারে। এই বিফলতা সাধারণভাবে দুটি কারণে হয়। প্রথমতঃ এই পদ্ধতিতে প্রায়োগিক দক্ষতা এবং ভালো অভিজ্ঞতার অভাবে হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ রোগী নির্বাচন যদি ঠিকমত না হয় তবে অকৃতকার্য হতে পারে—বিশেষতঃ বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে, যেখানে inter-spinous ligament এবং ligamentum flavum-এ অত্যধিক fibrosis বা calcification হয়ে গেছে। রোগীর শিরদাঁড়ায় বিকৃতি থাকলেও লাম্বার পাংচার কষ্টকর হয় এবং সেক্ষেত্রেও বিফলতা অসম্ভব নয়।

একটিমাত্র লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ইঞ্জেকশনে এপিডুরাল ব্লক বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। সুতরাং অনেকক্ষণ স্থায়ী করার জন্য অবিরাম (continuous) এপিডুরাল ব্লক করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি বিশেষ ধরনের স্পাইনাল সূচ

ব্যবহার করা হয়। একে বলে Tuohy needle (চিত্র ৪০)। এই সূচের অগ্রভাগ একটু বাঁকানো—এর ফলে dura mater ফুটো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে এবং প্রয়োজনে এই সূচের মধ্য দিয়ে ক্যাথেটার দিলে ইচ্ছেমত উপরের দিকে অথবা নীচের দিকে পাঠানো সহজ হয়। এক্ষেত্রে এপিডুরাল স্পেসে Tuohy needle দেওয়া হয়। স্টিলেট বের করে নিয়ে একটি লম্বা সরু পলিথিন ক্যাথেটার ওর মধ্য দিয়ে এপিডুরাল স্পেসে পাঠানো হয়। তারপর সূচটি সাবধানে বের করে নেওয়া হয়। ক্যাথেটারটি এপিডুরাল স্পেসেই থাকে এবং



চিত্র ৪০ : Tuohy needle

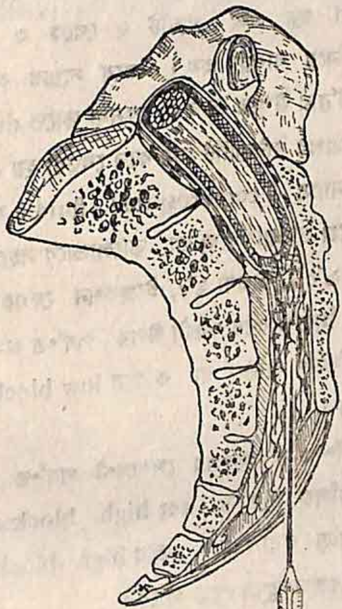
বাইরের দিকটি পিঠে ভালোভাবে aseptic precaution নিয়ে বীজানুমুক্ত অবস্থায় strap করা থাকে। প্রয়োজনমত বার বার লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ এর মধ্য দিয়ে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। অপারেশন পরবর্তী ব্যথা বেদনা কমাতে, ব্যথাহীন প্রসবের ক্ষেত্রে এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনা উপশম করতে এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

ক্যানসারজনিত যন্ত্রণা কমানোর জন্য ১০% ফেনল (গ্লিসারিনে) এই এপিডুরাল ব্লকে দেওয়া যেতে পারে। তবে এই পদ্ধতি খুব প্রচলিত নয়। এর প্রায়োগিক জটিলতাও আছে অনেক। তাই লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ দিয়ে continuous এপিডুরাল ব্লক খুব সাফল্যের সংগেই ব্যবহার করা হয়। ব্যথা বেদনা এবং যন্ত্রণা যদি খুবই প্রচণ্ড ধরনের হয় এবং অন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে যদি ব্যথামুক্তি না ঘটে, তবে অবিরাম (continuous) এপিডুরাল ব্লক খুবই উপযোগী হয়। এই পদ্ধতি খুবই সাবধানে এবং বীজানুমুক্ত সতর্কতায় করা উচিত। নতুবা বীজানু সংক্রমণ হওয়ার আশংকা থেকেই যায়। ভালো পর্যবেক্ষণে রেখে এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে এক মাস বা তারও বেশী এই এপিডুরাল ক্যাথেটার ঠিকমত এপিডুরাল স্পেসে রাখা যায়। প্রয়োজন হলে ক্যানসার রোগীর শেষ অবস্থাতেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

কডাল ব্লক (Caudal block) :

এটিকে extradural sacral blockও বলে। এই পদ্ধতিতে লিগনোকেন

জাতীয় লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ sacral canal-এর মধ্যে extradural spaceএ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এর ফলে রোগীর perineal region অথবা গুহ্যদেশ একেবারে অসাড় হয়ে যায়। লিগনোকেন ১.৫% অথবা ২% ব্যবহার করা হয়। একবার ইঞ্জেকশন দিলে প্রায় দেড় ঘণ্টার মত ব্যথা বেদনার অনুভূতি থাকে না। ব্যথাহীন প্রসবের ক্ষেত্রে অথবা pelvis-এর ক্যানসারজনিত ব্যথায় এই কডাল



চিত্র ৪১ : কডাল ব্লক

ব্লক খুবই কার্যকরী হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা উপশমের জন্য অবিরাম (continuous) কডাল ব্লকও করা যেতে পারে।

প্রয়োগ পদ্ধতি (চিত্র ৪১):

রোগীকে একটি টেবিলে উপুড় করে শোয়ানো হয়। উরুদেশের নীচে একটি পাতলা বালিশ দিলে ভালো হয়। ইঞ্জেকশন দেওয়ার জায়গা আয়োডিন

এবং স্পিরিট দিয়ে যথাসম্ভব বীজানুমুক্ত করা হয়। প্রথমে রোগীর coccyx-এর শেষাগ্র, sacral cornu এবং sacral hiatus হাত দিয়ে অনুভব করে বুঝে নিতে হবে। সাধারণতঃ sacral cornu-র মাঝখানে sacral hiatus-এর উপরে একটি স্পাইনাল সূচ চামড়ার সংগে ৪৫° কোণ করে ফোটানো হয়। তারপর সূচটি উপরের দিকে চালাতে হয় যতক্ষণ না sacrococcygeal ligament দিয়ে যায়। তারপর সূচের hub ৩০° কোণে নীচের দিকে নামানো হয় এবং সূচটি ২ থেকে ৩ সেণ্টিমিটার sacral canal-এর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সূচের অগ্রভাগ যেন কখনো দ্বিতীয় সেকরাল ভার্টিব্রার উপরে না যায়, কেননা তাতে dura mater-এ ফুটো হয়ে যেতে পারে। এরপর ষ্টিলেটটি বের করে নেওয়া হয়। সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে দেখা হয় রক্ত বা সুষুম্নারস (cerebrospinal fluid) আসছে কি না। যদি না আসে তখন সিরিঞ্জে হাওয়া দিলে তা ভালোভাবে সহজে ঐ স্পেসে যাবে। তারপর লিগনোকেন ১.৫% অথবা ২% ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। মোট কতটা ওষুধ দেওয়া হবে তা নির্ভর করে কতটা উপর পর্যন্ত অসাড় করতে হবে তার উপর। ওষুধের পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে low block, mid block বা high block করা যায়।

Low block-এ দ্বিতীয় লাম্বার সেগমেণ্ট পর্যন্ত অসাড় হয়। Mid block-এ দশম থোরাসিক পর্যন্ত এবং high block-এ চতুর্থ থোরাসিক সেগমেণ্ট পর্যন্ত অসাড় করা যায়। তবে high block বেশী করা হয় না কেননা এতে অত্যধিক রক্তচাপহ্রাস হতে পারে।

অপারেশন ছাড়াও pelvis বা পায়ের অসহ্য যন্ত্রণায়, সায়েটিকাতে এবং কোমরের ব্যথায় এই কডাল ব্লক করা যায়। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে সরু ক্যাথেটার কডাল স্পেসে রেখে অবিরাম (continuous) কডাল ব্লকও করা যায়। ক্যানসারে ৫% বেনজিল অ্যালকোহলও এই কডাল ব্লকে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এটি বিশেষ প্রচলিত পদ্ধতি নয়।

কডাল ব্লক মোটামুটি ভালো এবং এতে বিশেষ খারাপ উপসর্গ দেখা দেয় না। তবে কিছু অসুবিধাও হতে পারে। এই পদ্ধতিতে সময় একটু বেশীই লাগে। Sacrum-এ বিকৃতি থাকলে এবং অত্যধিক মোটা স্থূলকায় লোকদের এই ব্লক করা কঠিন। অসাবধানে সাবএরাকনয়েড স্পেসে বা রক্তনালীর মধ্যে ইঞ্জেকশন

হয়ে যেতে পারে। বেশী উপরের ব্লকে অত্যধিক রক্তচাপহ্রাস হতে পারে। এখানে জীবানু সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। মাংসপেশীসমূহে প্রয়োজন-মত শিথিলতা যথেষ্ট নাও যেতে পারে।

কডাল ব্লক কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে না করাই শ্রেয়। রোগীর মস্তিষ্কে বা স্নায়ুঘটিত অসুখ থাকলে, ইঞ্জেকশন দেওয়ার জায়গায় যদি প্রদাহ থাকে, sacrum-এর বিকৃতি থাকলে এবং রোগীর pilonidal cyst থাকলে কডাল ব্লক করা উচিত নয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ব্যথা উপশমের বিশেষ চিকিৎসা

দীর্ঘস্থায়ী অসহ্য ব্যথা বেদনা বা যন্ত্রণা অনেক সময়েই ওষুধ দিয়ে এমন কি নার্ভ ব্লক করেও স্থায়ী উপশম হয় না। সুতরাং স্থায়ী উপশমের জন্য যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গবেষণা চলছে। অনেক নতুন এবং বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। এদের কয়েকটি বিশেষ সাফল্যের সংগে ইদানীং ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই সব বিশেষ পদ্ধতির কয়েকটি এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা (Electrical stimulation) :

Melzack এবং Wall-এর 'gate control' মতবাদ অনুযায়ী সুষুম্নাকান্ডে বড় মায়েলিন সম্পৃক্ত A স্নায়ুতন্ত্রবাহিত অনুভূতির এবং ছোট C স্নায়ুতন্ত্র-বাহিত অনুভূতির মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে। এই ভারসাম্য সব-সময়ই কিন্তু পরিবর্তন হতে পারে। বড় স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে যদি বেশী অনুভূতি পাঠানো হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই 'gate' নিয়ন্ত্রিত হবে এবং ব্যথা অনুভূতি কমে যাবে। এ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে প্রথম অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র সুষুম্নাকান্ডের substantia gelatinosa-তে থাকে তা নয়, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের descending pathwayতেও থাকে। তার ফলে উদ্দীপনা অনুযায়ী ব্যথা অনুভূতি কমানো বা বাড়ানো যায়।

অসহ্য যন্ত্রণা উপশমের জন্য কয়েকটি বিশেষ জায়গায় বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা জাগালে সুফল পাওয়া যায়। এদের মধ্যে primary afferent neurone এবং সুষুম্নাকান্ডের dorsal column সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমনকি মস্তিষ্কেও যদি উদ্দীপনা জাগানো হয় তবে ব্যথা উপশম হতে পারে।

এই মতবাদ কাজে ব্যবহার করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যথা অনুভূতি কমানো হয়। রোগীর ব্যথার জায়গায় বা তার কাছাকাছি জায়গায় vibration করে, percussion করে অথবা কোন রকমের counter irritation করে সাফল্যের

সংগে ব্যথা উপশম করা যেতে পারে। Counter irritation সাধারণতঃ করা হয় বরফ ব্যবহার করে অথবা ব্যথানাশক স্প্রে ব্যবহার করে। এগুলি খুবই সহজ এবং নিরাপদ পদ্ধতি। দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনার ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রথম দিকে এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা জাগিয়ে ব্যথা নিবারণ সাধারণতঃ দুইটি বিশেষ পদ্ধতিতে করা হয়। তার একটি external electrical stimulation এবং অন্যটি dorsal column stimulation।

বাহ্যিক বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা (External electrical stimulation) :

এই পদ্ধতিতে অনেক দিনের পুরনো ব্যথা বেদনা এবং যন্ত্রণার চিকিৎসা করা হয়। অনেক সময় ওষুধে এবং অন্যান্য পদ্ধতিতে যখন কাজ হয় না তখন এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়।

এই পদ্ধতিতে একটি electrode রোগীর ব্যথার জায়গায়, চামড়ায় বা তার নীচে (subcutaneous) রাখা হয়। শরীরের যে ডার্মাটোমে ব্যথা সেখানেই ইলেকট্রোড রাখা ভালো। তারপর সেখানে নির্ধারিত সময়ের জন্য বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা জাগানো হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বড় বড় প্রান্তিক নার্ভ, বড় নার্ভ প্লেক্সাসকেও এইভাবে উদ্দীপিত করা যায় এবং তার ফলে ব্যথা উপশম ঘটে।

চামড়ায় বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা (transcutaneous electrical stimulation) জাগানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়। এতে সব রকমের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে। এগুলি ব্যবহার করা সহজ এবং নিরাপদ। রোগীকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিলে প্রয়োজনমত তারা নিজেরাই এটি ব্যবহার করতে পারে। এগুলি সাধারণতঃ খুব ছোট ধরনের হয়। শরীরে অনায়াসে এটি আটকে রাখা যায়। এগুলি প্রধানতঃ ব্যাটারী থেকে শক্তি পায়। এর voltage, frequency এবং pulse width বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। ইলেকট্রোডও নানা ধরনের হয়। তবে নমনীয় কারবন হলে ভালো হয়, কেননা তাতে পুড়ে যাবার ভয় কম থাকে। এই সব ইলেকট্রোড ব্যবহারের সময় বিশেষ জেলীর প্রয়োজন হয়।

রোগীর সব থেকে বেশী ব্যথার জায়গায়, তার পাশে অথবা সেই জায়গার প্রান্তিক নার্ভের কাছে এই ইলেকট্রোড রাখা হয়। তারপর বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা দেওয়া হয়। এই উদ্দীপনা এমনভাবে দিতে হবে যাতে রোগী মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য

বোধ করবে, কোন ব্যথা অনুভূতি হবে না এবং শুধু ঝিন ঝিন করবে। রোগী ৫ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে বুঝতে পারে তার ব্যথা অনুভূতি কমছে কিনা, দরকার মত voltage এবং frequency বাড়াতে হতে পারে। এই যন্ত্র একবার ঠিক করে দিলে পরে আবার সুবিধে মত পরিবর্তন করতে হতে পারে। ব্যথার গুরুত্ব অনুযায়ী কতক্ষণ বা কত ঘন্টা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে তা রোগীর উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। মোটামুটিভাবে এই পদ্ধতি খুবই নিরাপদ এবং এর প্রয়োগে কোন খারাপ উপসর্গ দেখা দেয় না।

তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এর বিফলতাও দেখা যায়। এটি কোমরের ব্যথায়, অপারেশন পরবর্তী ব্যথা বেদনায়, হার্পিসজনিত ব্যথায় এবং amputation পরবর্তী ব্যথায় খুবই ভালো কাজ দেয়।

অপারেশন পরবর্তী ব্যথা উপশমের জন্য এই transcutaneous electrical stimulation সাধারণতঃ incisionএর পাশেই ব্যবহার করা হয়। Incision-এর আধ ইঞ্চি দূরে দুইদিকে ইলেকট্রোড দেওয়া হয় এবং বৈদ্যুতিক stimulator-এর সাহায্যে উদ্দীপনা জাগানো হয়। এই বৈদ্যুতিক উদ্দীপনায় শুধু যে ব্যথা উপশম হয় তাই নয়, রোগীর অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী অনেক উপসর্গ এতে কমে যায়। রোগীর ফুসফুসজনিত উপসর্গ যেমন atelectasis কম হয়।

Dorsal column stimulation :

এই পদ্ধতিতে সুষুম্নাকান্ডের posterior column-এ first neurone fibre-এ বৈদ্যুতিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করা হয়। এতে সুষুম্নাকান্ডের posterior column-এর খুব কাছে ইলেকট্রোড রাখা হয় এবং বিদ্যুত প্রবাহের সাহায্যে সেখানে উত্তেজনা ঘটানো হয়। এই posterior column-তে বড় স্নায়ুতন্ত্র বেশীই থাকে। আগে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে এই ইলেকট্রোড বসানোর কাজ হতো এবং dura mater কেটে ইলেকট্রোড বসিয়ে আবার সেলাই করে দেওয়া হতো। কিন্তু অধুনা একটি Tuohy সূচের সাহায্যে এপিডুরাল স্পেসে এই ইলেকট্রোড বসানো হয়। এটি খুব সাবধানে এবং সঠিক জায়গায় বসাতে হয়। এভাবেও ইলেকট্রোড অনেকদিন রাখা যায় এবং এতে বড় অপারেশন এড়ানো যায়।

যে সব রোগীর ব্যথা একটি বিশেষ প্রান্তিক নার্ভের জন্য হয়, তাদের ক্ষেত্রে

ইলেকট্রোড সেই বিশেষ নার্ভেই বসানো যায় এবং সেক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী ভালো ফল পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই ইলেকট্রোড মস্তিষ্কতেও বসানো যেতে পারে। এই সব ইলেকট্রোড তারের সাহায্যে গ্রাহকযন্ত্র বা receiver-এর সংগে যুক্ত থাকে। গ্রাহকযন্ত্র সুবিধামত চামড়ার নীচে স্থাপন করা হয়। রোগী radio transmitter-এর সাহায্যে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

এই পদ্ধতি খুবই ভালোভাবে ব্যথা নিবারণ করতে পারে। এতে খারাপ উপসর্গ খুব একটা হয় না। তবে অনেক সময় চামড়ায় প্রদাহ হতে পারে। এই পদ্ধতির ব্যবহার যদি রোগীকে ঠিক মত শিখিয়ে দেওয়া হয়, তবে রোগী দরকার মত নিজেই তা ব্যবহার করতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনা এবং যন্ত্রণা উপশমের জন্য বিশেষতঃ ক্যানসারজনিত ব্যথার জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। এতেও চামড়ার মধ্য দিয়ে এপিডুরাল স্পেসে ইলেকট্রোড বসিয়ে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা জাগানো হয়। তবে এটি খুব প্রচলিত পদ্ধতি নয়।

এই dorsal column stimulation ছাড়াও অন্য বিশিষ্ট জায়গায় বৈদ্যুতিক উত্তেজনা জাগিয়ে ব্যথা উপশম করা যায়। থ্যালামাস এবং posterior internal capsule-এ ইলেকট্রোড বসিয়ে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা সৃষ্টি করলে দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণার উপশম ঘটে। কেন্দ্রীয় বা মস্তিষ্কজনিত ব্যথায় এটি ভালো কাজ করে। যেসব ক্ষেত্রে dorsal column stimulation-এ কাজ হয় না অথবা প্রায়োগিক কারণে dorsal column stimulation দেওয়া যায় না, তখন দীর্ঘস্থায়ী অসহ্য যন্ত্রণা উপশমের জন্য মস্তিষ্কে ইলেকট্রোড স্থাপন করা যেতে পারে। অবশ্য এতে অনেক সমস্যাও আছে। ঠিকমত জায়গায় সাবধানে ইলেকট্রোড বসাতে হবে এবং এটি ঠিকমত fix করে রাখতে হবে।

Cordotomy :

ক্যানসারজনিত অসহ্য ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে অনেক সময় শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এই সব অপারেশন খুব একটা সহজ নয় এবং এর অনেক কুফলও আছে। এটি খুব ভেবেচিন্তে নির্বাচিত ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা উচিত বিশেষতঃ রোগের শেষ পর্যায়ে। যখন অন্য কোন পদ্ধতিতে যন্ত্রণা নিরাময় করা যাচ্ছে না এবং রোগীর আয়ুষ্কাল ইতিমধ্যেই অনেক কমে গেছে তখনই এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

এই cordotomy অপারেশনে সুষুম্নাকান্ডের anterolateral অংশটুকু ছেদন করা হয়। যদি দেহের দুদিকের ব্যথা উপশমের দরকার হয়, তবে একটি বা দুটি ভার্টিব্রার laminectomy করা হয় এবং সুষুম্মাকান্ডের দুই দিকে দুইটি লেভেলে—একটি উঁচু লেভেলে এবং অন্যটি নীচের লেভেলে, anterolateral অংশটুকু ছেদন করা হয়। একই জায়গায় দুই দিকের অপারেশন করলে অনেক সময় ঐ জায়গা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ওঠে, বেশী রক্ত জমে এবং সুষুম্নাকান্ডে চাপসৃষ্টি করে।

অনেক সময় এই অপারেশন রোগীকে উপুড় করা অবস্থায় করা হয় এবং তাতে সুষুম্মাকান্ডের সামনের অংশে অপারেশন করতে সুষুম্মাকান্ডকে পেছনের দিকে ঘোরাতে হয়। এতে অনেক সময় সুষুম্নাকান্ডের রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হতে পারে। এর ফলে মাংসপেশীসমূহে দুর্বলতা এবং প্রস্রাবের গন্ডগোল হতে দেখা যায়।

প্রথম এবং দ্বিতীয় সারভাইকাল ভার্টিব্রার লেভেলে একটি স্পাইনাল সূচ subarachnoid spaceএ দেওয়া যায়। এরপর তার মধ্য দিয়ে একটি সরু শলাকা প্রবেশ করানো হয়। এই শলাকার অগ্রভাগ radioactive করা থাকে। এর সাহায্যে সুষুম্মাকান্ডের মনোনীত অংশ নষ্ট করে দেওয়া যায়। তবে এই শলাকার অবস্থিতি নিরূপণের জন্য x-ray control এবং television (intensifier) ব্যবহার করা উচিত। এই পদ্ধতি খুবই সাবধানে ব্যবহার করা উচিত এবং যাদের আয়ুষ্কাল খুবই কম তাদের ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োগ করা উচিত। নতুবা radioactivity জনিত অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেবে।

অনেক সময় সুষুম্নাকান্ডের মধ্যে একটি ইলেকট্রোড প্রবেশ করানো হয় এবং এতে radio frequency current পাঠানো হয়, এর ফলে সুষুম্নাকান্ডের anterolateral quadrantএ heat coagulation হয় এবং নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ অন্ততঃ ২০ মিনিট পাঠাতে হয়, তবে এক্ষেত্রে radio frequency বৈদ্যুতিক প্রবাহ ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ডের মধ্যেই কার্যকরী cordotomy করতে পারে।

যদি শরীরের একদিকে ব্যথা উপশমের জন্য cordotomy করা হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ কার্যকরী হয়। সাধারণতঃ পঞ্চম সারভাইকাল ডার্মাটোম পর্যন্ত ব্যথার এই প্রথম এবং দ্বিতীয় সাইভাইকাল ভার্টিব্রার লেভেলে cordotomy খুবই ভালোভাবে ব্যথা উপশম হয়। কিন্তু তার উপরের ডার্মা-

টোমের ব্যথা এতে উপশম হয় না। কেননা ব্যথা অনুভূতির স্নায়ুতন্ত্র সুষুম্নাকাণ্ডে তিন বা চার সেগমেন্ট যাবার পর তবেই অন্যদিকের antero-lateral quadrantএ cross করে।

Percutaneous cervical cordotomy :

Percutaneous cordotomy একটি প্রচলিত ভালো পদ্ধতি। এতে বড় অপারেশনের দরকার হয় না। চামড়া দিয়ে সূচ ঢুকিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের anterolateral tract-এ ক্ষত সৃষ্টি করা হয়। এতে direct current অথবা radiofrequency current ব্যবহার করা হয়। আবার strontium beta necrosis করেও cordotomy করা যায়। এটি অপারেশনের তুলনায় অনেক বেশী নিরাপদ পদ্ধতি এবং খুব খারাপ রোগীকেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। এর খারাপ উপসর্গ অনেক কম হয় এবং মৃত্যুহারও অনেক কম। তাই অপারেশন করে cordotomy এখন আর বিশেষ করা হয় না।

যদি দুইদিকেই cordotomy করা হয়, বিশেষতঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় সারভাইকেল ভার্টিব্রার লেভেলে, তবে respiratory outflow fibres ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তার ফলে অস্বাভাবিকভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হতে পারে। রোগী যখন জেগে থাকে, তখন মোটামুটি শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় কিন্তু তা অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে। কিন্তু যখন রোগী ঘুমিয়ে পড়ে স্বয়ংক্রিয় শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং এতে রোগীর মৃত্যুও ঘটে। একে Ondine syndrome বলে। এই সব রোগীর একদিকে যদি lateral cordotomy করা হয় এবং অন্যদিকে anterior cordotomy, তবে Ondine syndrome হওয়ার আশংকা বিশেষ থাকে না।

এই percutaneous cordotomy কোন সময়েই x-ray নিয়ন্ত্রণ ছাড়া করা উচিত নয়। ইলেকট্রোডের সঠিক অবস্থান নির্ণয় একান্তভাবেই দরকার। এই cordotomy করার পরে অনেক সময় মাংসপেশীসমূহে শিথিলতা দেখা দেয়—সাধারণতঃ যে দিকে অপারেশন করা হয় সেই দিকেই। খুব বেশী শিথিলতা হলে রোগী হাঁটা এবং চলাফেরা করতে পারে না। এই পদ্ধতি মোটামুটিভাবে ক্যানসারজনিত যন্ত্রণা নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। যাদের আয়ুষ্কাল মোটামুটি ২ বৎসরের মত তাদের ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। যদি দুই

দিকেই ব্যথা নিরাময়ের দরকার হয় তখন দুই দিকেই cordotomy করা যায়। আবার একদিকে cordotomy করার সংগে intrathecal ফেনল ব্যবহার করলেও ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে।

পিটুইটারি গ্রন্থিতে অ্যালকোহল ইঞ্জেকশন :

পিটুইটারি গ্রন্থিতে অ্যালকোহল ইঞ্জেকশন দিয়ে ক্যানসারজনিত যন্ত্রণার চিকিৎসা আধুনিককালে হচ্ছে। সাধারণতঃ ক্যানসারের শেষ পর্যায়ে খুব খারাপ অবস্থায় রোগীকে প্রচন্ড যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি দিতেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই ব্যথা উপশম হরমোন আসক্ত (hormone dependent) টিউমারে যেমন হয় তেমনই অন্য টিউমারের ক্ষেত্রেও ভালো ফল দেয়।

এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা মোটামুটিভাবে সহজ। তবে সূচের সঠিক অবস্থান জানতে image intensifierএর ব্যবহার করা একান্ত দরকার। একটি ৬ ইঞ্চি লম্বা trocar এবং canula নাকের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। এর অগ্রভাগে sphenoid sinusএর মধ্য দিয়ে গিয়ে pituitory fossa-তে যায়। সেখানেই পিটুইটারি গ্রন্থিতে ১০০% অ্যালকোহল ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। অ্যালকোহলের পরিমাণ সাধারণতঃ ১ মিলিলিটারের বেশী দেওয়া উচিত নয়। এই পদ্ধতি লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ায় অথবা জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়াতে করা হয়। খুবই সাবধানে ইঞ্জেকশন দেওয়া উচিত। যদি একটুও অ্যালকোহল middle fossa-তে চলে যায় তবে অত্যধিক মাথাব্যথা হয়। ক্যানুলা অতি অবশ্যই মধ্যলাইনে রাখা উচিত, নচেৎ cavernous sinus-এ চলে যেতে পারে এবং সেক্ষত্রে রক্তনালীতে ক্ষতি ও রক্তক্ষরণ হতে পারে।

পিটুইটারি গ্রন্হিতে একবার অ্যালকোহল ইঞ্জেকশন দিয়ে কাজ না হলে এক সপ্তাহ পর আবার ইঞ্জেকশন দেওয়া যায়। মোট তিন বার (এক সপ্তাহ অন্তর) ইঞ্জেকশনের বেশী দেওয়া উচিত নয়।

এই অ্যালকোহল ইঞ্জেকশনে সব সময়েই পুরোপুরি ব্যথা উপশম নাও হতে পারে। অনেক সময় বিফলতা আসে। এতে অনেক কিছু উপসর্গও দেখা দিতে পারে—যেমন ptosis, diplopia, hemianopia, meningeal irritation ইত্যাদি। এই পদ্ধতি প্রয়োগের পরে diabetes insipidus, hypoadren-alism এবং hypothyroidism হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পিটুইটারি গ্রন্থিতে অ্যালকোহল ইঞ্জেকশন দিলে কিভাবে ব্যথা বেদনা এবং যন্ত্রণা নিরাময় হয় তা সঠিক জানা যায়নি। তবে বলা হয় যে ব্যথা অনুভূতির গতিপথের কোন জায়গায়, থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস এবং brain stem-এর কোন সংযোগ মাধ্যমের উপর কাজ করেই ব্যথামুক্তি ঘটায়। সম্পূর্ণ ব্যথামুক্তি হলেও পরে আবার ব্যথা ফিরে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে আবার ইঞ্জেকশন দেওয়া যায়। ক্যানসারজনিত কারণে শরীরের দুইদিকেই যন্ত্রণা হলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ খুবই ভালো কাজ দেয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ব্যথা উপশমে অঔষধ কিছু চিকিৎসা

সম্মোহন বা মোহনিদ্রা (Hypnosis) :

Hypnosis বা মোহনিদ্রা দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনা উপশমের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। এটিকে সম্মোহনও বলা যেতে পারে। এতে মানুষের চেতনা পরিবর্তিত হয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মন বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় থাকে। রোগী একমাত্র তার সম্মোহনকারীর **suggestion** বা কথামত চলে। এতে রোগী একেবারে ঘুমিয়ে না পড়তেও পারে—তবে স্বাভাবিক জাগরণ থাকে না। রোগী এ অবস্থায় একটি সীমিত এবং বিশিষ্ট দিকেই মনোনিবেশ করতে পারে।

এই প্রক্রিয়ায় প্রথম পর্যায়ে রোগীর শারীরিক এবং মানসিক শিথিলতা হয়। রোগীর ঝিমুনি হয়; কিন্তু ঠিক ঘুমিয়ে পড়ে না। দ্বিতীয় পর্যায়ে রোগী সম্মোহনকারীর কথামত চলে। তৃতীয় পর্যায়ে রোগীর ব্যথা অনুভূতি থাকে না এবং রোগীর সে সময়ের ঘটনা মনেও থাকে না। রোগীর সাময়িকভাবে স্মৃতি-লোপ পায়। শেষপর্যায়ে রোগীর পুরোপুরি অ্যানেস্থিসিয়া হয়।

এই হিপনোসিস প্রয়োগ করার আগে ঠিকমত রোগী বাছাই করে নেওয়া একান্ত দরকার। সব রোগীকেই ঠিকমত সম্মোহিত করা যায় না। কিছু রোগী দ্বিতীয় পর্যায়, কিছু তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত সম্মোহিত হতে দেখা যায়, কিন্তু খুব কম লোকই চতুর্থ পর্যায় পর্যন্ত সম্মোহিত হয়। কিছু রোগীকে একেবারেই সম্মোহিত করা যায় না। সুতরাং এ প্রক্রিয়ায় বিফলতার হার অনেক বেশী। সাধারণতঃ কমবয়সী ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে সম্মোহিত করা যায়। বৃদ্ধদের ভালো সম্মোহন হয় না। লেখাপড়া জানা লোককে সম্মোহন করতে কষ্ট হয় না। মানসিক রোগগ্রস্ত লোক, খুঁতখুঁতে লোক, অনিচ্ছুক লোকেদের কখনই সম্মোহন করা উচিত নয়। যে সব লোক সম্মোহনকারীকে যথেষ্ট বিশ্বাস করে, যারা মনঃসহযোগ এবং সহযোগিতা করতে পারে, যারা বুঝতে পারে যে সম্মোহিত

হলে তার ব্যথা উপশম হবে বা উপকার হবে—তাদেরই ভালোভাবে সম্মোহন করা যায়। এই সম্মোহনে রোগীর কোন শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি হয় না, অবশ্য যদি অভিজ্ঞ চিকিৎসক আইনানুগভাবে সম্মোহন করে। সম্মোহনকারীর দায়িত্ব অনেক। তার যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব থাকবে, রোগী পুরোপুরি বিশ্বাস করবে, সেই রোগীকে চালনা করবে। রোগী কখনই সম্মোহনকারীর কোন কথার খুঁত ধরবে না, বিচার করবে না এবং অবিশ্বাস করবে না।

রোগীকে একটি শান্ত পরিবেশে রাখা হয়। রোগীকে সাধারণভাবে চোখ বন্ধ রাখতে বলা হয়, তারপর চোখ বন্ধ অবস্থায় কপালের ঠিক মাঝখানে একটি কাল্পনিক বিন্দুর দিকে দৃষ্টি এবং মনকে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করতে বলা হয়। পরে রোগী সম্মোহনকারীর ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবং তার কথা বা suggestion মত চলে। অবশেষে শরীরে ব্যথা অনুভূতি চলে যায়—মন পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়। স্মৃতিশক্তির সাময়িক বিলুপ্তি ঘটে। পরিশেষে পূর্ণ অ্যানেস্থিসিয়া হয়।

এই সম্মোহন প্রয়োগে রোগী ঘুমিয়ে থাকতে পারে অথবা জেগেও থাকতে পারে। সে সময় কোন ব্যথা অনুভূতি থাকে না। তবে এই সম্মোহন সব-সময় করা যায় না এবং এতে অনেক সময় লাগে। এতে বিফলতার হারও অনেক বেশী। তবে এর প্রয়োগে অন্যান্য ব্যথানাশক ওষুধের তুলনায় কোন খারাপ উপসর্গ হয় না। সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনার ক্ষেত্রে এই মোহ-নিদ্রা বা সম্মোহন দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে। অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যথা বেদনাও এই সম্মোহন প্রয়োগে উপশম করা যায়।

আকুপাংচার (Acupuncture) :

আকুপাংচার একটি প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাপদ্ধতি। আধুনিককালে এটি নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে এবং ব্যথা বেদনা উপশমের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি এই আকুপাংচার পদ্ধতি প্রয়োগ করে শল্যচিকিৎসাও করা হচ্ছে। অনেক অসুখের চিকিৎসায় যেমন হাঁপানি, রক্তচাপজনিত অসুখ, অনিদ্রা ইত্যাদিতে আকুপাংচার সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে খরচ খুব অল্প এবং যে কোন পরিস্থিতিতে এমন কি দূর গ্রামাঞ্চলেও আকু-পাংচার করার কোন অসুবিধা নেই, সুতরাং এর ব্যাপক ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু সে তুলনায় আমাদের দেশে এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। আগেকার দিনে অচিকিৎসক লোকই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন কিন্তু এখন বহু চিকিৎসক আমাদের দেশে এবং বিদেশেও এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ পাচ্ছেন এবং নিজেরাই আকুপাংচার প্রয়োগ করছেন।

তবে এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং একে সাধারণ গ্রাম্য চিকিৎসা বলে মনে করেন। কিন্তু এখন এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং যথেষ্ট গবেষণা হচ্ছে। এর সবটুকুই কিন্তু উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়।

আকুপাঙ্চার পদ্ধতিতে শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে সূচ বিদ্ধ করে চিকিৎসা করা হয়। প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের শরীরের জীবনীশক্তি (vital force of life energy—chee) শরীরের প্রধান নালী বা meridian (chingmai) দিয়ে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয় সারা শরীরে। এই মেরিডিয়ান শরীরের চামড়ার নীচে, এমন কি আভ্যন্তরীণ মস্তিষ্ক, লিভার, বৃক্ক ইত্যাদি সমস্ত অংগপ্রত্যংগের সংগে সংযোজিত হয়। এগুলি ফুস-ফুসের মেরিডিয়ান, লিভারের মেরিডিয়ান, হৃৎপিন্ডের মেরিডিয়ান, প্লীহার মেরিডিয়ান, বৃক্কের মেরিডিয়ান ইত্যাদি নামে পরিচিত। এগুলি ছাড়াও একটি বিশিষ্ট মেরিডিয়ান থেকে নানা দিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হয় এবং সেগুলি অন্য মেরিডিয়ানকে এবং শরীরের অন্য অংশের সংগে যুক্ত করে। এদের বলা হয় chingluo।

১২টি মেরিডিয়ান শরীরের বাম অর্ধভাগে এবং আরও ১২টি শরীরের ডান অর্ধভাগে থাকে। আরও ২টি শরীরের মধ্যভাগে—তার একটি সামনে আর একটি পিছনে থাকে। মোট ২৬টি মেরিডিয়ান সারা শরীরকে ঘিরে আছে। আকুপাংচার পয়েন্টগুলি সঠিকভাবে নিজস্ব জায়গায় এই মেরি-ডিয়ানের উপরে চিহ্নিত করা হয়। এই পয়েন্টগুলি এক হাজারের উপরে, তবে এদের মধ্যে ২৫০ থেকে ৩০০টি পয়েন্ট বিশেষভাবে এই চিকিৎসায় লাগে।

প্রাচীন চৈনিক মতবাদ অনুসারে মানুষের শরীর সুস্থ থাকার জন্য 'chee' স্বচ্ছন্দগতিতে শরীরে প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। যদি কোন কারণে কোন ভাবে এই প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে শরীরের একদিকে chee প্রবাহ বেড়ে যায়, অন্যদিকে তা অনেক কমে যায় এবং এতে শরীরের দুইদিকে কোন সমতা থাকে

না। এই অসমতাই সমস্ত রোগের এবং ব্যথা বেদনার কারণ। এখন কোনভাবে যদি chee প্রবাহ ঠিক করা যায় এবং সমতা আনা যায়, তবেই রোগ নিরাময় সম্ভব। আকুপাংচার পয়েন্টে সূচ বিদ্ধ করে বারবার উদ্দীপনা জাগালে chee প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, এগুলিকে tonification পয়েন্ট বলে। আর যেগুলি দিয়ে chee প্রবাহ কমানো হয় তাদের sedation পয়েন্ট বলে।

আকুপাংচার needle বা সূচ আগেকার দিনে হাড়, সোনা, রূপা, তামা বা লোহা দিয়ে তৈরী হতো, কিন্তু আজকাল ষ্টেনলেশ ষ্টীলের সূচ সাফল্যের সংগে ব্যবহার করা হয়। এই সূচ আগে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করা হতো কিন্তু এখন কম ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করা হয়।

আকুপাংচার কিভাবে ব্যথা বেদনা উপশম করে তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে চৈনিক মতে মানুষের মধ্যে দুই বিপরীতধর্মী শক্তি—পজিটিভ (yang) এবং নেগেটিভ (yin) সাধারণতঃ সমভাবে থাকে। মানুষের ফাঁপা অংগপ্রত্যংগগুলিতে যেমন পাকস্থলী, পিত্তস্থলী, অন্ত্র ইত্যাদিতে পজিটিভ বা yang শক্তি থাকে এবং অন্য ফাঁপা নয় এমন অংগপ্রত্যংগে যেমন লিভার, হৃৎপিন্ড, কিডনী ইত্যাদিতে নেগেটিভ বা yin শক্তি থাকে। এই দুই শক্তির অসাম্যই রোগের কারণ। আকুপাংচার মোটের উপর যেমন chee প্রবাহ অব্যাহত রাখে, তেমন পজেটিভ এবং নেগেটিভের সমতা রক্ষা করে।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি মতবাদে বলা হয় যে এই আকুপাংচার মোটামুটি large fibre pain inhibiting system-এর উপর কাজ করে ব্যথা অনুভূতি কমায়। আধুনিক চিকিৎসায় যেভাবে transcutaneous electrical stimulation ব্যথা বেদনা উপশমের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়—আকুপাংচারও সেইভাবে কাজ করে। আবার এমনও বলা হয়, আকুপাংচার সূচ ফোটানোর ফলে ত্বকের নীচের স্নায়ু থেকে encephalin এবং endorphin নামক দুইটি পদার্থ নিঃসৃত হয় এবং এদের জন্যই ব্যথা বেদনার উপশম হয়।

আকুপাংচার পদ্ধতিতে চিকিৎসার সময় রোগীর মানসিক অবস্থার দিকটি বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। যাদের খুব বেশী মানসিক চাপ আছে, যাদের ভয় এবং দুর্ভাবনা খুব বেশী তাদের এই পদ্ধতিতে খুব ভালো কাজ হয় না। অনেকক্ষেত্রে রোগীকে ভালোভাবে বোঝাতে হয়। প্রয়োজনে সম্মোহনও প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবার মনকে শান্ত করার জন্য ওষুধও দেওয়া হয়।

অপারেশন এবং অ্যানেস্থিসিয়া পরবর্তী ব্যথা উপশমের জন্য আকুপাংচার পদ্ধতি খুবই ভালো। এতে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা এমন কি তারও বেশী সময় ব্যথা উপশম হতে পারে, অন্য কোন ব্যথানাশক ওষুধও লাগে না। এই পদ্ধতিতে আনুষংগিক কোন উপসর্গ হয় না। তবে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার ক্ষেত্রে এটি কত কার্যকরী তার সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। আবার অনেকে হাতের, পায়ের বা কোমরের দীর্ঘস্থায়ী ব্যথায় এবং মাইগ্রেনে এই আকুপাংচার পদ্ধতি প্রয়োগ করে যথেষ্ট সুফল পেয়েছেন।

একথা অনস্বীকার্য যে আকুপাংচার পদ্ধতি এখন যথেষ্ট সাফল্যের সংগে পৃথিবীর অনেক দেশে বহুল ব্যবহার হচ্ছে। এ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণাও চলছে। এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও কিছু কিছু নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে এর প্রয়োগ অভিজ্ঞ চিকিৎসক দিয়েই করানো উচিত।

অডিওএনালজেসিয়া (Audioanalgesia):

মানসিক অসুখের চিকিৎসায় এবং ব্যথা বেদনা উপশমের ক্ষেত্রে গান এবং বাজনার যথেষ্ট অবদান আছে। গান এবং বাজনা সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে, মেজাজের পরিবর্তন ঘটায় এবং মনকে কল্পলোকে নিয়ে যেতে পারে। কিছু কিছু গান বাজনা মনকে খুশি করে, মানসিক চাপ কমায়, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যও আনে। কিন্তু বেশী আওয়াজের গান বাজনা এবং গোলমাল মানুষকে পীড়িত করে, মনে ভীতির সঞ্চার করে।

শব্দের অনুভূতি কানের ভিতর cochlea-তে প্রথম উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এর পর থ্যালামাস হয়ে এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কে যায়। মস্তিষ্কের temporal lobe-এর উপরিভাগে এই উদ্দীপনাকে শব্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে। থ্যালামাস থেকে কিছু উদ্দীপনা হাইপোথ্যালামাসে যায় এবং কিছু স্বয়ংক্রিয় ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

ব্যথা বেদনার ক্ষেত্রে গান বাজনা রোগীর মনকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। রোগীর শারীরিক কষ্ট তখন সাময়িকভাবে ভুলে যায়। রোগীর মন গান বাজনার সুখকর অনুভূতিতে ভরে ওঠে। এতে রোগীর ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

ব্যথা বেদনা উপশমের জন্য গান বাজনা চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহার করে দেখা

গেছে যে এতে রোগীর মন খুবই শান্ত হয়ে পড়ে। এর সংগে ব্যথানাশক ওষুধও ব্যবহার করা যায়, সেক্ষেত্রে ঐ সব ওষুধের মাত্রা আনুপাতিকহারে কম করাই ভালো।

রোগীর পছন্দমত গান বাজনা বাছাই করা উচিত। অ্যানেস্থিসিয়ার সময় গান বাজনা ব্যবহার করলে প্রাক-অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধ কম লাগে এবং রোগীর অ্যানেস্থিসিয়া খুব সহজেই হয়। বিশেষতঃ শিশু এবং কমবয়সী ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এটি খুবই উপযোগী। লোকাল বা আঞ্চলিক অ্যানেস্থিসিয়ার ক্ষেত্রে রোগী জেগে থাকে এবং তখন নানারকম ভয় ভাবনা হতে পারে। সেক্ষেত্রে মৃদু গান বাজনা তার মনকে শান্ত করতে পারে এবং স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে। মানসিক চাপ কমে এবং শরীরের মাংসপেশীও কিছু শিথিল হয়। প্রসব বেদনা উপশমের ক্ষেত্রেও এই গান বাজনা ব্যবহার করা যেতে পারে। দীর্ঘসময় গান বাজনা ব্যবহার করলে ৪৫ মিনিট অন্তর অন্তত ১৫ মিনিট বন্ধ রাখা উচিত। তা না করলে গান বাজনা এক ঘেয়ে হয়ে উঠবে এবং রোগীর বিরক্তির কারণ হবে।

যোগ ও ধ্যান (Yoga and meditation) :

যোগ এবং সমাধি ঠিকমত অভ্যাসে শারীরিক এবং মানসিক বৈকল্য আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। বিশেষতঃ ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণা ভয় ভাবনা ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাস করলে মস্তিষ্কের ধারণা শক্তি বাড়ে, স্নায়ু সতেজ হয়, মাংসপেশী সবল হয় এবং অনেক রোগও সেরে যায়। এতে দেহের শক্তি বৃদ্ধি পায়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

যোগের ফলে শরীরে এবং মনে ভালো শিথিলতা আসে এবং সমস্ত মানসিক এবং শারীরিক চাপ দূরীভূত হয়। এই যোগাভ্যাসের ফলে মাংসপেশীর টান, ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, মাথা ব্যথা ইত্যাদি অনেক সময় একেবারে ভালো হয়ে যায়। এতে শারীরিক পটুতা বাড়ে, মনও দৃঢ় হয়, ব্যথা বেদনা সহ্য করার ক্ষমতাও বাড়ে।

দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বেদনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ অনুযায়ী যোগ এবং ধ্যান করা দরকার। যৌগিক ব্যায়ামও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী করা উচিত। সব ব্যায়াম সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত হয় না, সুতরাং অসুখ অনুযায়ী ব্যায়ামের গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যায়ামের ফলে শিরদাঁড়ায়, অন্যান্য হাড়ের সন্ধি-স্থলে, মস্তিষ্কে, লিভারে, কিডনীতে, বিভিন্ন মাংসপেশীসমূহে, অন্ত্রে, স্নায়ু-মন্ডলীতে, বিভিন্ন গ্রন্থিসমূহে ইত্যাদিতে রক্ত প্রবাহ বাড়তে সাহায্য হয় এবং তার ফলে সেই সব অংগপ্রত্যংগ অধিক কর্মক্ষম হয়, সতেজ হয় এবং রোগ জয় করার ক্ষমতা বাড়ে।

বিংশ অধ্যায়
ফিজিওথেরাপি

আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে ফিজিওথেরাপির অবদান অনেক। অসুস্থ অংগ-প্রত্যংগ থেকে যথাসম্ভব পুরোমাত্রায় কাজ পেতে হলে অতি অবশ্যই ফিজিও-থেরাপির দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে। কোন কারণে মাংসপেশী অবশ হয়ে গেলে, হাড় ভাংগার পর বা অন্য কোন কারণে দুই হাড়ের সন্ধিস্থল যদি শক্ত (stiff) হয়ে যায়, যদি হাতের বা পায়ের বা শিরদাঁড়ার স্বাভাবিক নড়াচড়া ব্যাহত হয়, যদি মাংসপেশীসমূহে অস্বাভাবিক ব্যথা থাকে—এই সব অনেক অসুখেই ফিজিওথেরাপির ব্যবহার একান্ত দরকার। শল্যচিকিৎসার পরও অনেক সময় ফিজিওথেরাপির সাহায্য নেওয়া হয়, যাতে রোগীকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। এই ফিজিওথেরাপির সাহায্যে কী কী উদ্দেশ্য সাধিত হয় তা মোটামুটি নিম্নরূপ :

১। ফিজিওথেরাপির সাহায্যে শরীরের অংগপ্রত্যংগে রক্তচলাচল স্বাভাবিক করা যায়। আবার অনেক সময় রক্তচলাচল বাড়ানোও যেতে পারে। এতে শরীর সাধারণভাবে সুস্থ থাকে, কম রক্তপ্রবাহজনিত উপসর্গসমূহের উপশম হয় এবং healing process ত্বরান্বিত হয়। অসুস্থ অংগপ্রত্যংগে রক্তচলাচল বাড়াতে পারলে সেখানকার বিপাকীয় দূষিত পদার্থসমূহ এবং জলীয় ভাগ বেরিয়ে যেতে পারে। এতে সেখানকার ফোলা কমে যেতে সাহায্য হয়। ব্যথাও অনেক পরিমাণে কমে। মাংসপেশীসমূহও অধিকতর কার্যকরী হয়। আক্রান্ত জায়গার movement বা নড়াচড়াও স্বাভাবিক হতে সাহায্য হয়।

২। ফিজিওথেরাপির সাহায্যে রক্তচলাচলের সংগে শরীরের কোষ তরল (body fluid) স্বাভাবিক আদানপ্রদান (interchange) করানো যায়। আবার তা বাড়ানোও যেতে পারে। এতেও আক্রান্ত অংগপ্রত্যংগের ফোলা, ব্যথা, ইত্যাদি কমে। মাংসপেশীসমূহের কার্যকারিতাও বেড়ে যায়।

৩। হাড়ের সন্ধিস্থলের স্বাভাবিক নড়াচড়া ঠিক রাখা যায় এবং প্রয়োজনে

তা বাড়ানোও যেতে পারে। অনেক অসুখেই সন্ধিস্থলের mobility সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফিজিওথেরাপির সাহায্যে সেই সব সন্ধিস্থলের mobility স্বাভাবিক করা হয়। সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীসমূহের সবলতা (muscle power) বাড়ানো যেতে পারে।

৪। মাংসপেশীসমূহের power ফিজিওথেরাপির সাহায্যে স্বাভাবিক পর্যায়ে আনা যেতে পারে। প্রয়োজনে তা অনেক বাড়ানোও যেতে পারে। সাধারণভাবে হাড়ের বিভিন্ন সন্ধিস্থল এবং সেখানকার সংশ্লিষ্ট মাংসপেশী-সমূহের power—এই দুই জিনিষ পরস্পরের পরিপূরকভাবে কাজ করে। সন্ধিস্থল যদি কোন কারণে stiff হয়ে যায় তবে মাংসপেশীসমূহের power যতই ভালো থাকুক না কেন তা কোন কাজে লাগে না। আবার সন্ধিস্থল ঠিক থাকলেও মাংসপেশীসমূহ যদি খুবই দুর্বল থাকে তবে তাতেও বিশেষ উপকার হয় না। সুতরাং অসুখের ব্যাপকতা নির্ণয় করে ফিজিওথেরাপির সময় দুই দিকেই নজর দিতে হয়।

৫। ফিজিওথেরাপির সাহায্যে রোগী শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ যথাসম্ভব স্বাভাবিক করা যেতে পারে। হাঁপানি রোগীর ক্ষেত্রে, chronic bronchitis রোগীর ক্ষেত্রে রোগীকে ফিজিওথেরাপির সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করা যেতে পারে। ফুসফুসের collapse থাকলে রোগীকে এই থেরাপি প্রয়োগ করা যেতে পারে। অপারেশনের পর বিশেষতঃ বুকের অপারেশনের পর এই ধরনের থেরাপি খুবই প্রয়োজনীয়। এতে রোগী ঠিকমত কাশতে এবং কফ বের করে দিতে শিক্ষা পায়। রোগীর ফুসফুসেও ঠিকমত প্রসারণ এবং সংকোচন হয়।

৬। ফিজিওথেরাপির সাহায্যে অনেকরকমের উপসর্গ কমানো যেতে পারে। রোগীর ব্যথা কমানো বা উপশম করা যেতে পারে। রোগীর আক্রান্ত জায়গার ফোলা বা oedema কমানো যেতে পারে। রোগীর কোন মাংসপেশীর টান, spasm থাকলে তা কমানো যেতে পারে।

৭। ফিজিওথেরাপির সাহায্যে অনেক অসুখের নানান জটিলতা (compli-cation) থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। বহুদিনের প্যারালিসিস রোগীর trophic change, চাপক্ষত (bed sore) ইত্যাদি যাতে না হয় তার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। পড়ে যাওয়া রোগীর ক্ষেত্রে পরে যাতে contracture না হতে পারে তার জন্যও ফিজিওথেরাপির সাহায্যে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে

পারে। অপারেশনের পরে পায়ের মাংসপেশীসমূহের শিরায় যাতে থ্রম্বোসিস না হয়, রোগীর বুকে কোন গন্ডগোল দেখা না দেয় তার জন্য আগে থেকেই ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা করা দরকার।

৮। দীর্ঘস্থায়ী অসুখের ক্ষেত্রে, বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ফিজিওথেরাপির সাহায্যে সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো রাখা যায়। পরিমিত ব্যায়াম, ম্যাসাজ ইত্যাদির সাহায্যে শরীরের রক্তচলাচল স্বাভাবিক থাকে। দেহ তরল আদান-প্রদান (interchange) ঠিক থাকে, মাংসপেশীসমূহের সবলতা (power) যথাসম্ভব স্বাভাবিক থাকে, joint mobility মোটামুটি ঠিক থাকে—সুতরাং এই সবের জন্য সাধারণ স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।

ফিজিওথেরাপির চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। সেগুলির সম্বন্ধে কিছু জেনে রাখা প্রয়োজন।

ম্যাসাজ (Massage) :

আক্রান্ত অংগপ্রত্যংগে ম্যাসাজ করলে অনেক সময়েই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ম্যাসাজ নানাভাবে কাজ করে।

১। ম্যাসাজের ফলে ত্বকের প্রান্তিক স্নায়ুতন্তুগুলি অনেক সময় উদ্দীপিত হয়, আবার অনেক সময় প্রশমিত (sedated) হয়। এই প্রশমণের ফলে স্থানীয়ভাবে এবং এমনকি সারা শরীরে একটি শিথিলতা (relaxation) হয়।

২। ম্যাসাজের ফলে স্থানীয় জায়গায় রক্তচলাচল বৃদ্ধি পায় এবং অনেক সময় স্থানীয় কোষসমূহ থেকে হিস্টামিনজাতীয় পদার্থ নিঃসরণ হয়। এসবের ফলে রক্তনালীর প্রসারণ ঘটে।

৩। ম্যাসাজের ফলে শিরাবাহিত স্থানীয় রক্ত তাড়াতাড়ি অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে এবং তাজা ধমনীবাহিত রক্ত আক্রান্ত জায়গায় বেশীমাত্রায় আসতে পারে।

৪। ম্যাসাজে প্রদাহজনিত exudate বেশী শোষিত হতে পারে। শিরা দিয়ে এবং lymphatic system দিয়ে এই exudate শোষিত হয়।

৫। মাংসপেশীর স্বাভাবিক tone বজায় রাখতে চেষ্টা করে। এতে মাংসপেশীর শুকিয়ে যাওয়া বা atrophy হওয়ার সম্ভাবনা কমে। রোগমুক্তির পর অংগপ্রত্যংগ তাড়াতাড়ি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

৬। হাড়ের সন্ধিস্থলে কোন জল জমতে বা effusion হতে পারে না। সন্ধিস্থলে কোন adhesion হতে পারে না এবং তার mobility বজায় থাকে।

৭। যখন সারা দেহে ম্যাসাজ করা হয় তখন অনিদ্রার রোগীর মানসিক শান্তি ফিরে আসে এবং ঘুম আসতে সাহায্য করে।

৮। ম্যাসাজের ফলে আভ্যন্তরীণ অংগপ্রত্যংগেরও tone বাড়ে এবং কার্যক্ষমতা বাড়ে।

৯। চামড়া এবং তার নীচের subcutaneous tissue ম্যাসাজের ফলে ভালোভাবে stretch করতে পারে এবং নরম থাকে।

ম্যাসাজ নানাভাবে করা যায় এবং এদের কার্যকারিতাও বিভিন্ন রকমের। ম্যাসাজ মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) Effeurage : এই পদ্ধতিতে হাতের তালু দিয়ে stroking দেওয়া হয়। হাতের তালুতে আগে থেকে ট্যালকম পাউডার লাগিয়ে নিলে ভালো হয়। বাইরে থেকে হৃৎপিন্ডের দিকে যাওয়ার সময় stroking জোরে দিতে হয়, আর হৃৎপিন্ড থেকে প্রান্তদেশে আসার সময় stroking আস্তে দিতে হয়। এভাবে ম্যাসাজ দিলে ধমনীমধ্যকার রক্ত ভালোভাবে চলাচল করতে পারে।

খ) Petrissage : এতে হাত দিয়ে kneeding movement করা হয়। হাতের প্রান্তদেশ থেকে আরম্ভ করে উপর দিকে যেতে হয়। এতেও রক্তচলাচল বাড়তে সাহায্য হয় এবং exudate শোষিত হতে পারে।

গ) Tapotement : এই পদ্ধতিতে হাত দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এবং জোরে আঘাত (blow) দেওয়া হয়। দুই হাত দিয়েই করা হয়—এক হাতের পর অন্য হাত দিয়ে। এভাবে ম্যাসাজ দিলে সেখানকার শিরা উপশিরা ধমনী উদ্দীপিত হয় এবং আক্রান্ত জায়গায় রক্তপ্রবাহ বাড়াতে সাহায্য হয়।

শরীরের বিভিন্ন ধরনের movement এবং ব্যায়াম :

মাংসপেশীসমূহের এবং বিভিন্ন সন্ধিস্থলের নড়াচড়া শরীরের শিরা উপশিরায় রক্তচলাচলে এবং lymphatic drainage করতে সাহায্য করে। শরীরের movement দুইভাবে করা যেতে পারে—একটি passive—অন্যের সাহায্যে এবং অপরটি active—নিজে নিজে।

Passive movement করতে অন্যের সাহায্য লাগে—এটি কখনোই রোগী

নিজে করে না। সাধারণতঃ হাড়ের সন্ধিস্থল প্রথমে আস্তে আস্তে নাড়ানো হয় এবং তারপর জোরে জোরে নাড়ানো হয়। কিন্তু এতে রোগী যেন কোন ব্যথা না পায়। যাতে আক্রান্ত অসুস্থ জায়গার কোন ক্ষতি না হয়, সারতে বা healing-এ কোন বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। এই movement-এর আগে ভালোভাবে ম্যাসাজ করে নিতে হয়। এতে কাজ হলে এবং সন্ধিস্থলের mobility বাড়লে রোগীকে তখন নিজেই movement করতে বলা হয়।

রোগী নিজে movement করলে তাকে active movement বলা হয়। এতে রোগীর মানসিক শান্তি এবং বিশ্বাস ফিরে আসে। কিন্তু সবসময় ফিজিওথেরাপিষ্টের পরামর্শমত করা উচিত। এই active movement হঠাৎ খুব বেশী করা উচিত নয়, কেননা দুর্বল মাংসপেশীসমূহে খুব বেশী চাপ পড়লে হিতে বিপরীত হতে পারে। অল্প অসুস্থতার ক্ষেত্রে বা মাংসপেশী-সমূহের ছোটখাট দুর্বলতায় এই ব্যায়াম খুবই উপকারী। তবে বেশী ধরনের নার্ভ ক্ষতি থাকলে বা পোলিওমাইলাইটিসে যেখানে মাংসপেশীসমূহের দুর্বলতা খুবই বেশী, রোগী সেখানে নিজে কোন ব্যায়ামই করতে পারে না। সেসব ক্ষেত্রে মেশিনের সাহায্যে ব্যায়াম করানোর দরকার হয়। আধুনিককালে প্রত্যেক ফিজিওথেরাপি ইউনিটেই বহু ধরনের এই ব্যায়াম করানোর মেশিন ব্যবহার করা হয়।

আরও এক ধরনের movement করানো হয় তাকে বলে resisted movement। একটি বাধার সামনে জোর করে movement করা হয়—এতে muscle power বাড়তে সাহায্য হয়, balance এবং co-ordination—এসবেরও উন্নতি হয়। এতে রোগীর শরীরে রক্তচলাচলও ভালোভাবে হয়।

তাপ প্রয়োগ (Heat) :

শরীরের চামড়ায় তাপ প্রয়োগ করলে সেখানকার রক্তনালীর প্রসারণ ঘটে। সুতরাং আক্রান্ত জায়গায় রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায়। তাপ প্রয়োগে সেখানকার ব্যথা এবং ফোলা কমে যায়। তাপ প্রয়োগ নানাভাবে করা যেতে পারে।

১। আর্দ্র তাপ (Moist heat) :

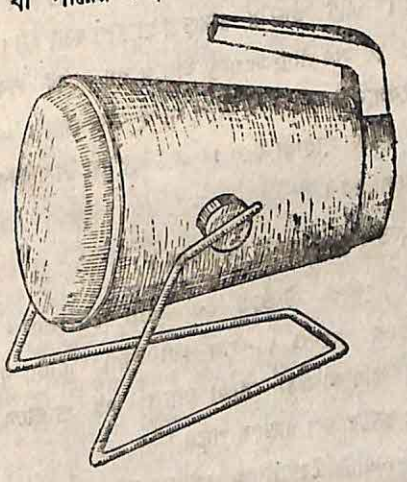
গরমজলে তুলো ভিজিয়ে এবং নিংড়ে নিয়ে আক্রান্ত জায়গায় সেঁক দেওয়া

হয়। তবে এটি এখন আর বিশেষ ব্যবহার করা হয় না। তবে ফোঁড়া, কার্বাঙ্কল ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুঁজ বের হওয়ার আগে এই ধরনের গরম সেঁকে খুবই উপকার পাওয়া যায়।

অনেক সময় hot bath দিলে উপকার হয়। সাধারণতঃ হাতের বা পায়ের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। এতে গরম জলে হাত বা পা ডুবিয়ে রাখা হয় এবং জলের তাপমাত্রা মোটামুটি ১১০° ফারেনহিটের কাছাকাছি রাখা হয়। পুড়ে যাওয়া রোগীদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় স্যালাইন বাথ দেওয়া হয়।

২। শুষ্ক তাপ (**Dry heat**) :

এটি খুবই উপযোগী পদ্ধতি। অনেকভাবে এটি প্রয়োগ করা যায়। **Radiant heat bath** নানা ধরনের এবং নানান সাইজের পাওয়া যায়। এর ছোট সাইজের বাথে হাত বা পায়ের অসুখে তাপ দেওয়া যায়। আবার বড় সাইজের



চিত্র ৪২ : Infra red ray

শরীরের বাথে অনেকটা জায়গাতেই তাপ দেওয়া চলে। এই বাথের ভিতরে অনেক বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো থাকে এবং এর ভেতরকার তাপ সুইচের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

ইনফ্রারেড তাপ (**Infra red ray**) :

এটি একটি ছোট বৈদ্যুতিক যন্ত্র (চিত্র ৪২)। অনায়াসে যেখানে সেখানে নেওয়া

যায়। বিদ্যুতে চলে। চিকিৎসকের পরামর্শমত রোগী বাড়িতেও এটি ব্যবহার করতে পারে। এই পদ্ধতিতে তাপ সাধারণতঃ চামড়াতেই বেশী হয়, আভ্যন্তরীণ কোষে এই তাপ যেতে পারে না। তার জন্য ডায়াথার্মি বা short-wave therapy বিশেষ উপযোগী।

Wax bath—এটি একটি বিশেষ ধরনের তাপ প্রয়োগ পদ্ধতি। এতে আর্দ্র এবং শুষ্ক তাপের সুবিধা পাওয়া যায়। একটি পাত্রে গলানো মোম থাকে এবং এর তাপমাত্রা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়। সেই গরম মোমের মধ্যে আক্রান্ত হাত বা পা ডুবিয়ে রাখা হয়। মোমের তাপমাত্রার দিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত নতুবা পুড়ে যেতে পারে।

আলট্রাভায়োলেট তাপ (Ultraviolet radiation) :

আলট্রাভায়োলেট তাপ সাধারণতঃ মার্কারী ভেপার টিউবে বৈদ্যুতিক প্রবাহের ফলে উৎপন্ন হয়। এটি স্থানীয় চামড়ায় প্রয়োগ করা হয়। সূর্যালোক এবং বাতাসের অভাবে যে সব deficiency অসুখ হয়—সেই সব অসুখে আলট্রা-ভায়োলেট (অতি বেগুনী) আলো ও তাপ খুবই কাজ দেয়। এটি চামড়ার ভিতরে calciferol তৈরী করতে সাহায্য করে। এটি শরীরে বিপাকেও সাহায্য করে এবং রোগীর স্বাস্থ্য ভালো হয়।

গ্যালভানিক বিদ্যুত (Galvanic current) :

এটি ব্যাটারী থেকে উদ্ভূত constant current। এটি অনেকসময় Faradic বিদ্যুতের সংগেও ব্যবহার করা হয়। এটির ব্যবহারে মাংসপেশী এবং স্নায়ুতন্ত্র কার্যকারিতা বোঝা যায়। এর প্রয়োগে চামড়ার রক্তনালী প্রসারিত হয় এবং রক্তচলাচল বাড়তে পারে।

Ionisation—এটিও বৈদ্যুতিক প্রয়োগের এক বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি। এতে দুটি ধাতুর ইলেকট্রোড একটি লিন্ট কাপড়ে ঢাকা থাকে। এই লিন্ট একটি বিশেষ সলিউশনে ভেজানো হয়। এরপর ঐ ইলেকট্রোড দুটি চামড়ায় লাগানো হয়। গ্যালভানিক (galvanic) বিদ্যুত প্রবাহের ফলে পজিটিভ এবং নেগেটিভ আয়ন (ion) চামড়ায় বাহিত হয়। এই আয়নের আদানপ্রদান (ionic interchange) শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সাধারণতঃ রিউম্যাটিক অসুখে অথবা আঘাতপ্রাপ্ত শরীরের অংগপ্রত্যংগে এর ব্যবহার হয়। জিংক

আয়োডিন অথবা স্যালিসিলেট আয়ন পজিটিভ বা নেগেটিভ ইলেকট্রোড থেকে চামড়ায় বাহিত হয়।

ফ্যারাডিক বিদ্যুত (Faradic current) :

এটি একটি alternating current। এটি induction coil থেকে উৎপন্ন হয়। অনেকসময় এই বিদ্যুত গ্যালভানিক বিদ্যুতের সংগে ব্যবহার হয়। যে সব মাংসপেশী শুকিয়ে গেছে তাকে উদ্দীপনা জাগাতে এবং কার্যকরী করে তুলতে এই বিদ্যুতের ব্যবহার করা হয়।

সাইনুসয়ডাল বিদ্যুত (Sinusoidal current) :

এটিও একটি alternating current। রোগীর হাত বা পা একটি গরম জলের টাবে রাখা হয় এবং সেই জলে বিদ্যুত চালনা করা হয়। এই পদ্ধতির প্রয়োগে আক্রান্ত জায়গায় রক্তচলাচল বাড়ে। মাংসপেশীসমূহে অল্প সংকোচন এবং প্রসারণ ঘটে। প্যারালিসিস রোগে এবং দীর্ঘস্থায়ী পুরানো স্নায়ুজাত ব্যথাতে এই বিদ্যুত প্রয়োগ খুবই উপকার দেয়।

মেডিকেল ডায়াথার্মি (Medical diathermy) :

এটি খুব বেশী frequency যুক্ত alternating current। এতে খুব দ্রুতগতিতে oscillation হয়। এতে দুটি ইলেকট্রোড থাকে। শরীরের আক্রান্ত জায়গায় এই ইলেকট্রোড দুটি দেওয়া হয় এবং বিদ্যুত প্রবাহের সময় বিদ্যুত দুই ইলেকট্রোডের মধ্যবর্তী শরীরের কোষসমূহের মধ্য দিয়েও যায়। এর ফলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে চামড়া, subcutaneous tissue অথবা deep fascia পর্যন্ত বিদ্যুত যায়--মাংসপেশীতে বিশেষ যায় না। এই পদ্ধতিতে রিউম্যাটিক অসুখের এবং আথ্রাইটিস অসুখের চিকিৎসা করা হয়।

সর্টওয়েভ (short-wave) থেরাপি—এতেও high frequency যুক্ত বিদ্যুত ব্যবহার করা হয়। এতে oscillation থাকে প্রতি সেকেন্ডে ১০ থেকে ১০০ মিলিয়ন cycle। এই ধরনের বিদ্যুত প্রয়োগে শরীরে আভ্যন্তরীণ কোষে মাংসপেশীসমূহেও তাপ সঞ্চার হয়। অনেক ধরনের অসুখে এর ব্যাপক ব্যবহার হয়, যেমন—ফোঁড়া, কার্বাঙ্কল, হাড়ের এবং তার সন্ধিস্থলের নানান অসুখে সায়েটিকার ব্যথায়, কোমরের ব্যথায়, নানা ধরনের neuritis এবং নিউর‍্যালজিয়া (neuralgia) ইত্যাদিতে। অনেক সময় ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি নিরাময়ের জন্যও এর ব্যবহার করা হয়।

চিত্র পরিচিতি

জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী

প্রয়োজনীয় রূপান্তর তালিকা

১ পাউন্ড=০'৪৫ কিলোগ্রাম=৪৫৩'৬ গ্রাম=১৬ আউন্স

১ গ্রাম=১৫'৪৩ গ্রেন

১ কিলোগ্রাম=২'২ পাউন্ড

১ গ্রেন=০'০৬৫ গ্রাম

১০০০ মাইক্রোগ্রাম=১ : ১০০০=১ মিলিগ্রাম/মিলিলিটার

১ : ১০০০০০=১০ মাইক্রোগ্রাম/মিলিলিটার

১ : ২০০০০০=৫ মাইক্রোগ্রাম/মিলিলিটার

১ মিলিমিটার পারদচাপ=১'৩৬ সেণ্টিমিটার জলচাপ

১ সেন্টিমিটার জলচাপ=০'৭৩৫ মিলিমিটার পারদচাপ

১ অ্যাটমোশফীয়ার=৭৬০ মিলিমিটার পারদচাপ

=১০'৩ মিটার জলচাপ

১ গ্রেন=৬৫ মিলিগ্রাম

১ আউন্স=২৮'৩ গ্রাম

১ ফ্লুইড ড্রাম=৩'৫ মিলিলিটার

১ ফ্লুইড আউন্স=২৮'৪ মিলিলিটার

১ পাইন্ট=৫৬৮ মিলিলিটার

১ গ্রাম=১০০০ মিলিগ্রাম=১৫'৪ গ্রেন

১ গ্যালন=৪৫৪৪ মিলিলিটার

১ মিলিলিটার=১৭ মিনিম

১ মিনিম=০'০৫৯ মিলিলিটার

১ চা চামচ=৫ মিলিলিটার

১ টেবিল চামচ=১৫ মিলিলিটার

১ কাপ=২৪০ মিলিলিটার

১ মিটার=৩৯'৪ ইঞ্চি

১ ইঞ্চি = ২'৫৪ সেন্টিমিটার = ২৫ মিলিমিটার

১ মাইক্রন = ১/১০০০ মিলিমিটার

গ্রেন থেকে গ্রাম : গ্রেন × ০'০৬৪৮ = গ্রাম

গ্রাম থেকে গ্রেন : গ্রাম × ১৫'৪৩২ = গ্রেন

তাপমাত্রা : °C = ২৭৩'১৫K = ৩২°F

সেলসিয়াস থেকে কেলভিন

K = °C + ২৭৩

কেলভিন থেকে সেলসিয়াস

°C = K − ২৭৩

সেলসিয়াস থেকে ফারেনহিট তাপমাত্রা

°F = (°C × ৯/৫) + ৩২

ফারেনহিট থেকে সেলসিয়াস তাপমাত্রা

°C = (°F − ৩২) × ৫/৯

লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের কার্যকাল (বসাক, ১৯৮১):

প্রোকেন	৬০ থেকে ৯০ মিনিট
মেপিভ্যাকেন	১২০ থেকে ২৪০ মিনিট
প্রিলোকেন	১২০ থেকে ২৪০ মিনিট
লিগনোকেন	৯০ থেকে ২০০ মিনিট
টেট্রাকেন	১৮০ থেকে ৬০০ মিনিট
বুপিভ্যাকেন	১৮০ থেকে ৬০০ মিনিট
এটিডোকেন	১৮০ থেকে ৬০০ মিনিট

পূর্ণবয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে (৬০ কে. জি. ওজন) কডাল, এপিডুরাল এবং প্রান্তিক নার্ভ ব্লকের জন্য নিরাপদ মাত্রা (বসাক, ১৯৮১) :

প্রোকেন	১০০০ মিলিগ্রাম
লিগনোকেন	৪০০ মিলিগ্রাম
মেপিভ্যাকেন	৫০০ মিলিগ্রাম (এডরেনালিন ১ : ২০০,০০০ যুক্ত)
প্রিলোকেন	৪০০ মিলিগ্রাম

বুপিভ্যাকেন ২২৫ মিলিগ্রাম (এডরেনালিন ১ : ২০০,০০০ যুক্ত) কডাল এবং এপিডুরালের জন্য।
৪০০ মিলিগ্রাম (এডরেনালিন ১ : ২০০,০০০ যুক্ত) প্রান্তিক নার্ভ ব্লকের জন্য।
এটিডোকেন ৪৫০ মিলিগ্রাম (এডরেনালিন ১ : ২০০,০০০ যুক্ত)

সাধারণ ব্যথানিবারক ওষুধের মাত্রা :

অ্যাসপিরিন ৩০০ থেকে ৯০০ মিলিগ্রাম দিনে ৩ থেকে ৪ বার
প্যারাসিটামল ০'৫ গ্রাম থেকে ১ গ্রাম দিনে ৪ বার পর্যন্ত
ইন্ডোমেথাসিন ২৫ থেকে ৭৫ মিলিগ্রাম
ফেনিল বিউটাযোন ৪০০ মিলিগ্রাম
কোডিন ৬০ মিলিগ্রাম মুখে
ডাইহাইড্রোকোডিন ৩০ থেকে ৬০ মিলিগ্রাম মুখে অথবা ইঞ্জেকশনে
ডেক্সট্রোপ্রোপক্সিফেন ৬৫ মিলিগ্রাম মুখে
পেন্টাযোসিন ৩০ থেকে ১০০ মিলিগ্রাম মুখে,
২০ থেকে ৬০ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশনে।
মরফিন ০'১ থেকে ০'২ মিলিগ্রাম/কে. জি. ইঞ্জেকশন হিসাবে
পেথিডিন ১'৫ থেকে ২ মিলিগ্রাম/কে. জি. ইঞ্জেকশনে
বুপ্রেনরফিন ০'৪ মিলিগ্রাম জিভের নীচে
ফেনোপেরিডিন ১ থেকে ২ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশনে
ফেন্টানিল ০'১ থেকে ০'২ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশনে
লিভরফেনল ২ থেকে ৪ মিলিগ্রাম
ফেনাযোসিন ৩ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশনে, ৫ মিলিগ্রাম মুখে
মেথাডোন ৫ থেকে ১০ মিলিগ্রাম মুখে
হিরোইন ২'৫ থেকে ১০ মিলিগ্রাম মুখে, ইঞ্জেকশনে ৩ থেকে ৬ মিলিগ্রাম
প্যাপাভেরেটাম ১০ থেকে ২০ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশনে

অন্যান্য কিছু ওষুধের সাধারণ মাত্রা :

ডায়াজিপাম ১০ মিলিগ্রাম মুখে অথবা ইঞ্জেকশনে
লোরাজিপাম ২ থেকে ৪ মিলিগ্রাম মুখে অথবা ইঞ্জেকশনে

নাইট্রাজিপাম ৫ মিলিগ্রাম মুখে

ক্লোরডায়াজিপক্সাইড ২ মিলিগ্রাম / কে. জি. মুখে এবং ১ মিলিগ্রাম / কে. জি ইঞ্জেকশনে

হ্যালোপেরিডল ৫ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশনে

হাইড্রোক্সিজিন ১·৫ থেকে ২ মিলিগ্রাম / কে. জি.

প্রোমেথাজিন ২৫ মিলিগ্রাম মুখে অথবা ইঞ্জেকশনে

ক্লোরপ্রোমাজিন ২৫ মিলিগ্রাম মুখে অথবা ইঞ্জেকশনে

ট্রাইফ্লুওপ্রোমাজিন ৫ থেকে ১০ মিলিগ্রাম মুখে অথবা ইঞ্জেকশনে

প্রোমাজিন ২৫ থেকে ৫০ মিলিগ্রাম মুখে অথবা ইঞ্জেকশনে

সাইক্লিজিন টারট্রেট ৫০ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশনে

প্রোক্লোরপেরাজিন ১২·৫ মিলিগ্রাম মুখে অথবা ইঞ্জেকশনে

এট্রোপিন ০·৬৫ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশনে

হায়োসিন ০·৬ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশনে

গ্লাইকোপাইরোলেট ০·০০৫ মিলিগ্রাম / কে. জি. ইঞ্জেকশনে

পারফেনাজিন ৫ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশনে

মেটোক্লোপ্রোমাইড ১০ মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশনে

শিশুদের ক্ষেত্রে কিছু ওষুধের মাত্রা :

এট্রোপিন ২০ মাইক্রোগ্রাম / কে. জি.

হায়োসিন ২০ মাইক্রোগ্রাম / কে. জি.

গ্লাইকোপাইরোলেট ৫ মাইক্রোগ্রাম / কে. জি.

ডায়াজিপাম ০·২ থেকে ০·৪ মিলিগ্রাম / কে. জি.

ড্রোপেরিডল ০·১ থেকে ০·২ মিলিগ্রাম / কে. জি.

ট্রাইমেপ্রাজিন ২ থেকে ৪ মিলিগ্রাম / কে. জি.

মরফিন ০·২ মিলিগ্রাম / কে. জি.

প্যাপাভেরেটাম ০·৩ মিলিগ্রাম / কে. জি.

ফেন্টানিল ০·৫ থেকে ১·৫ মাইক্রোগ্রাম / কে. জি.

শিশুদের ক্ষেত্রে লোকাল অ্যানেস্থিসিয়ার ওষুধের নিরাপদ মাত্রা :

লিগনোকেন ৫ মিলিগ্রাম / কে. জি.

বুপিভ্যাকেন ২ মিলিগ্রাম / কে. জি.

প্রিলোকেন ৬ মিলিগ্রাম / কে. জি.

শিশুদের ক্ষেত্রে ওষুধের মাত্রা নিরূপণ :

ক্লার্ক আইনানুসারে (বসাক, ১৯৮১) :

$$\text{শিশুর মাত্রা} = \frac{\text{শিশুর ওজন}}{১৫০} \times \text{পূর্ণবয়স্কের মাত্রা}$$

আভ্যন্তরীণ কিছু অংগপ্রত্যংগের নার্ভ :

বৃক্ক বা কিডনী : থোরাসিক ১০ থেকে লাম্বার ১

বৃক্কনালী (ureter) : থোরাসিক ১১ থেকে লাম্বার ১

অন্ডকোষ (testis) : থোরাসিক ১০

Epididymis : থোরাসিক ১১, ১২

মূত্রাশয় (bladder) : থোরাসিক ১১, ১২, লাম্বার ১, সেকরাল ৩, ৪

প্রস্টেট গ্রন্থি : থোরাসিক ১০, ১১, সেকরাল ১ থেকে ৫

ডিম্বকোষ (ovary) : থোরাসিক ১০

গর্ভাশয়ের মুখ (cervix uteri) ঃ থোরাসিক ১১, ১২, সেকরাল ১ থেকে ৪

গর্ভাশয় (uterine body) : থোরাসিক ১০ থেকে লাম্বার ১

স্পাইনাল প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় সেগমেন্টের লেভেল (লী ও অ্যাটকিনসন, ১৯৮১) :

Epigastric : থোরাসিক ৭, ৮

Abdominal : থোরাসিক ৯, ১২

Cremasteric : লাম্বার ১, ২

Plantar : সেকরাল ১, ২

Knee jerk : লাম্বার ২ থেকে ৪

Ankle jerk : সেকরাল ১, ২

Anal sphincter : সেকরাল ৪, ৫

শরীরের সুষুম্নাকান্ডের সেগমেন্টের লেভেল :

গুহ্যদেশ (perineum) : সেকরাল ১ থেকে ৪

কুঁচকি (inguinal region) : লাম্বার ১

নাভিদেশ (umbilicus) : থোরাসিক ১০

সাবকস্টাল আর্চ : থোরাসিক ৬ থেকে ৮

স্তন (nipple line) : থোরাসিক ৪ থেকে ৫

দ্বিতীয় ইন্টারকস্টাল স্পেস : থোরাসিক ২

Clavicle : সারভাইকাল ৩ থেকে ৪

শরীরে জলের পরিমাণ :

মোট জলের পরিমাণ : পুরুষদের ক্ষেত্রে ওজনের ৬০%

স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে ওজনের ৫৫%

বৃদ্ধ পুরুষদের ক্ষেত্রে ওজনের ৫৫%

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে ওজনের ৪৬%

শিশুদের ক্ষেত্রে ওজনের ৭৫%

বহিকোষীয় জলের পরিমাণ : মোট জলের ৩৫%

অন্তর্কোষীয় জলের পরিমাণ : মোট জলের ৬৫%

শরীরে রক্তের পরিমাণ :

শিশুদের ক্ষেত্রে ৮০ থেকে ৯০ মিলিলিটার / কে. জি.

পুরুষদের ক্ষেত্রে ৭০ মিলিলিটার / কে. জি.

স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে ৬০ মিলিলিটার / কে. জি.

পূর্ণবয়স্ক লোকের দৈনিক জল, খনিজ লবণ এবং খাদ্যতালিকা
(প্রতি কিলোগ্রাম ওজন হিসাবে) :

জল ৩০ থেকে ৩৫ মিলিলিটার

শক্তি বা তাপ ৩৫ থেকে ৪০ ক্যালোরি

প্রোটীন ০·৬ থেকে ০·৯ গ্রাম

অ্যামিনো এসিড ৯০ মিলিগ্রাম

শর্করা ২ থেকে ৩ গ্রাম

স্নেহ ২ গ্রাম

সোডিয়াম ১ থেকে ১·৪ মিলিমোল

পটাসিয়াম ০·৭ থেকে ০·৯ মিলিমোল

ক্যালসিয়াম ০·১১ মিলিমোল

ম্যাগনেসিয়াম ০·০৪ মিলিমোল

আয়রণ ১ মাইক্রোমোল
ম্যাংগানীজ ০˙৬ মাইক্রোমোল
জিংক ০˙৩ মাইক্রোমোল
কপার ০˙০৭ মাইক্রোমোল
ক্লোরাইড ১˙৩ থেকে ১˙৯ মিলিমোল

সুষুম্নারসের প্রকৃতি :

মোট পরিমাণ ১২০ থেকে ১৫০ মিলিলিটার
কোষ (cells) ০ থেকে ১০ প্রতি কিউবিক মিলিমিটার
প্রোটীন ২০ থেকে ৪০ মিলিগ্রাম / ১০০ মিলিলিটার
ইউরিয়া ১০ থেকে ৩০ মিলিগ্রাম / ১০০ মিলিলিটার
গ্লুকোজ ৪৫ থেকে ৮০ মিলিগ্রাম / ১০০ মিলিলিটার
সোডিয়াম ১৪১ মিলি ইক্যুইভ্যালেণ্ট / লিটার
পটাসিয়াম ২˙৯৬ মি. ইক্যুই. / লিটার
ক্যালসিয়াম ২˙৪৫ মি. ইক্যুই. / লিটার
ক্লোরাইড ১১৫ থেকে ১৩৫ মি. ইক্যুই. / লিটার
বাইকার্বোনেট ২৩ মি. ইক্যুই. / লিটার
পি এইচ. ৭˙২৩ থেকে ৭˙৩৫
ল্যাকটেট ১˙৯ মিলিমোল / লিটার
প্রেসার ৭০ থেকে ১৮০ মিলিমিটার জলচাপ

প্রস্রাব পরীক্ষা :

মোট পরিমাণ ১ থেকে ২ লিটার / ২৪ ঘণ্টা
স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ১০১০ থেকে ১০২৫
পি এইচ. ৪˙৮ থেকে ৭˙৪
সোডিয়াম ১১০ থেকে ২৪০ মি. ইক্যুই. / ২৪ ঘণ্টা
পটাসিয়াম ৩৫ থেকে ৯০ মি. ইক্যুই. / ২৪ ঘণ্টা
ক্লোরাইড ১৭০ থেকে ২৫০ মি. ইক্যুই. / ২৪ ঘণ্টা
ফসফেট ৩০ থেকে ৯০ মি. ইক্যুই. / ২৪ ঘণ্টা
ক্যালসিয়াম ০˙১ থেকে ০˙৩ গ্রাম / ২৪ ঘণ্টা

ইউরিয়া ১০ থেকে ৩০ গ্রাম / ২৪ ঘণ্টা

ইউরোবিলিনোজেন ০ থেকে ৪ মিলিগ্রাম / ২৪ ঘণ্টা

অ্যামোনিয়া ০'১৪ থেকে ১'৪৭ গ্রাম / ২৪ ঘণ্টা

ক্রিয়েটিন ০'১৫ থেকে ০'২৫ গ্রাম / ২৪ ঘণ্টা

ক্রিয়েটিনিন ১৬ থেকে ২১ মিলিগ্রাম / কে.জি. / ২৪ ঘণ্টা

ইউরিক এসিড ০'২ থেকে ০'৭ গ্রাম / ২৪ ঘণ্টা

ক্যাটিকোলামাইন / ২৪ ঘণ্টায়

(এডরেনালিন ও নরএডরেনালিন) : ১১৯ থেকে ৩৩৮ মাইক্রোগ্রাম

3 মিথোক্সি, 4 হাইড্রক্সি ম্যানডেলিক এসিড / ২৪ ঘণ্টায় : ২'৬ থেকে ৬'৫ মাইক্রোগ্রাম

ক্রিয়েটিনিন clearence ১১০ থেকে ১৩০ মিলিলিটার / মিনিট

ইউরিয়া clearence ৬০ থেকে ৯৫ মিলিলিটার / মিনিট

গ্লোমেরিউলার ফিলট্রেশন রেট ১০৫ থেকে ১৪০ মিলিলিটার / মিনিট

রক্ত পরীক্ষা :

হিমোগ্লোবিন : পূর্ণবয়স্ক পুরুষ : ১৩'৫ থেকে ১৮ গ্রাম/১০০ মিলিলিটার

পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোক : ১১'৫ থেকে ১৬'৫ গ্রাম/১০০ মিলিলিটার

নবজাত : ১৭ থেকে ২০ গ্রাম / ১০০ মিলিলিটার

শিশু—৩ মাস : ৯'৫ থেকে ১২'৫ গ্রাম / ১০০ মিলিলিটার

১ বৎসর : ১১ থেকে ১৩ গ্রাম / ১০০ মিলিলিটার

১০ থেকে ১২ বৎসর : ১১'৫ থেকে ১৪'৮ গ্রাম/১০০ মিলিলিটার

লোহিত কণিকার সংখ্যা :

পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪'৫ থেকে ৬'৫ মিলিয়ন / মি.মি.^{৩}

স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ৩'৯ থেকে ৫'৬ মিলিয়ন / মি.মি.^{৩}

শ্বেত কণিকার সংখ্যা :

মোট পরিমাণ ৪০০০ থেকে ১১০০০ / মি. মি.^{৩}

নিউট্রোফিল ৪০ থেকে ৭০%

লিম্ফোসাইট ২০ থেকে ৪৫%

মনোসাইট ২ থেকে ১০%

গ্রন্থ-বিবরণী

১। উইলি ডবলিউ. ডি. এবং চার্চিল-ডেভিডসন এইচ. সি. : এ প্রাকটিস অফ অ্যানেস্থিসিয়া। লয়েড লিউক (মেডিকেল বুকস) লিমিটেড, লন্ডন, ১৯৭৯।

২। এডামস জন ক্রফোর্ড : আউটলাইন অফ অর্থোপেডিক্স। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি এবং চার্চিল লিভিংষ্টোন, লন্ডন, ৮ম সংস্করণ, ১৯৭৬।

৩। ওয়েল জে. ও. : টিটিজ ম্যাসাজ এন্ড রেমিডিয়াল এক্সারসাইজেস ইন মেডিকেল এন্ড সার্জিক্যাল কন্ডিসনস্। জন রাইট এন্ড সন্স লিমিটেড, ব্রিস্টল, ১৯৬৮।

৪। কনডন আর. ই. এবং ডিকোশী জে. জে. : সার্জিক্যাল কেয়ার। লী অ্যান্ড ফেবিজার, ফিলাডেলফিয়া, ১৯৮০।

৫। কলিন্স ভি. জে. : প্রিন্সিপলস্ অফ অ্যানেস্থিসিয়োলজি। কোঠারি বুক ডিপো, বোম্বাই, ১৯৭২।

৬। গাইটন এ. সি. : টেক্সট বুক অফ মেডিকেল ফিজিওলজি। ডবলিউ. বি. সন্ডার্স কোম্পানি, ফিলাডেলফিয়া, লন্ডন, টোকিও, টরেন্টো, ১৯৮১।

৭। গ্যানং ডবলিউ. এফ. : রিভিউ অফ মেডিকেল ফিজিওলজি। লেঞ্জ মেডিকেল পাবলিকেশনস্, মেরুজেন কোম্পানি লিমিটেড। ১৯৬৯।

৮। গ্রাঞ্জার এম. ই. এবং কাল্ডওয়েল নর্থ : এপিডিমিওলজি অ্যান্ড ননড্রাগ ট্রিটমেন্ট অফ হেড পেন। এস. কার্গার, বাশেল, লন্ডন, প্যারিস, ন্যু ইয়র্ক, সিডনী, ১৯৭৮।

৯। গ্রে টি. সি. এবং নান জে. এফ. : জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া। প্রথম ভল্যুম। বাটার ওয়ার্থস্, লন্ডন, ১৯৮১।

১০। গ্রে টি. সি. এবং নান জে. এফ. : জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া, দ্বিতীয় ভল্যুম, বাটার ওয়ার্থস্, লন্ডন, ১৯৮১।

১১। থর্নটন জে. এ. এবং লেভি সি. জি. : টেকনিকস্ অফ অ্যানেস্থিসিয়া। চাপমান অ্যান্ড হল, লন্ডন, ১৯৭৪।

১২। পাল এ. কে. : এসেনসিয়ালস অফ অ্যানেস্থিসিয়োলজি। অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, কলিকাতা ও দিল্লী, ১৯৮০।

১৩। পাল এ. কে. : ড্রাগস্ এন্ড ইকুয়েপমেন্টস্ ইন অ্যানেস্থিটিক প্রাকটিস। ভারতী বুক ষ্টল, কলিকাতা, ১৯৮৪।

১৪। পাল এ. কে. : অ্যানেস্থিসিয়া। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৪।

১৫। প্রায়র ডবলিউ. জে. এবং বুশ ডি. সি. টি. : এ ম্যানুয়েল অফ অ্যানেস্থিটিক টেকনিকস্। জন রাইট এন্ড সন্স, লন্ডন, ১৯৬৯।

১৬। ফারমান জে. ভি. : অ্যানেস্থিসিয়া অ্যান্ড ই. এম. ও. সিস্টেম। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি, লন্ডন, ১৯৭০।

১৭। ফ্রীডম্যান এ. পি., গ্রাঞ্জার এম. ই. এবং কাল্ডওয়েল এন. : হেডেক টু ডে। এস. কার্গার, বাশেল, লন্ডন, প্যারিস, নূ্য ইয়ক, সিডনী, ১৯৭৮।

১৮। বসাক বি. কে. : ফার্মাকোলজি ফর দি অ্যানেস্থিটিস্ট। টেকনোমিক পাবলিশিং কোম্পানি, ইউ. এস. এ. ১৯৮১।

১৯। বেল জি. এইচ. এমল্লি-স্মিথ ডি. এবং প্যাটারসন সি. আর. : টেক্সট বুক ফিজিওলজি। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি এবং চার্চিল লিভিংষ্টোন, লন্ডন, ১৯৮০।

২০। বাক্সটন হর্কিন্স ডি. এ. : অ্যানেস্থিসিয়া, রিকভারী অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার। দি ইংলিশ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, লন্ডন, ১৯৭০।

২১। মিলার আর. ডি, : অ্যানেস্থিনিয়া। প্রথম ভল্যুম, চার্চিল লিভিংষ্টোন, এডিনবার্গ। ১৯৮১।

২২। মিলার আর. ডি. : অ্যানেস্থিসিয়া। দ্বিতীয় ভল্যুম, চার্চিল লিভিংষ্টোন, এডিনবার্গ, ১৯৮১।

২৩। মিলার এস. জে. এইচ. : পার্সনস্ ডিজিসেজ্ অফ দি আই। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি এবং চার্চিল লিভিংষ্টোন, লন্ডন ও এডিনবার্গ, ১৯৭৮।

২৪। লরেন্স ডি. আর. : ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি, লন্ডন, ১৯৮০।

গ্রন্থ-বিবরণী

১। উইলি ডবলিউ. ডি. এবং চার্চিল-ডেভিডসন এইচ. সি. : এ প্রাকটিস অফ অ্যানেস্থিসিয়া। লয়েড লিউক (মেডিকেল বুকস) লিমিটেড, লন্ডন, ১৯৭৯।

২। এডামস জন ক্রফোর্ড : আউটলাইন অফ অর্থোপেডিক্স। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি এবং চার্চিল লিভিংস্টোন, লন্ডন, ৮ম সংস্করণ, ১৯৭৬।

৩। ওয়েল জে. ও. : টিডিজ ম্যাসাজ এন্ড রেমিডিয়াল এক্সারসাইজেস ইন মেডিকেল এন্ড সার্জিক্যাল কন্ডিসনস্। জন রাইট এন্ড সন্স লিমিটেড, ব্রিস্টল, ১৯৬৮।

৪। কনডন আর. ই. এবং ডিকোশী জে. জে. : সার্জিক্যাল কেয়ার। লী অ্যান্ড ফেবিজার, ফিলাডেলফিয়া, ১৯৮০।

৫। কলিন্স ভি. জে. : প্রিন্সিপলস্ অফ অ্যানেস্থিসিয়োলজি। কোঠারি বুক ডিপো, বোম্বাই, ১৯৭২।

৬। গাইটন এ. সি. : টেক্সট বুক অফ মেডিকেল ফিজিওলজি। ডবলিউ. বি. সন্ডার্স কোম্পানি, ফিলাডেলফিয়া, লন্ডন, টোকিও, টরেন্টো, ১৯৮১।

৭। গ্যানং ডবলিউ. এফ. : রিভিউ অফ মেডিকেল ফিজিওলজি। লেঞ্জ মেডিকেল পাবলিকেশনস্, মেরুজেন কোম্পানি লিমিটেড। ১৯৬৯।

৮। গ্রাঞ্জার এম. ই. এবং কাল্ডওয়েল নর্থ : এপিডিমিওলজি অ্যান্ড ননড্রাগ ট্রিটমেন্ট অফ হেড পেন। এস. কার্গার, বাশেল, লন্ডন, প্যারিস, নু্য ইয়র্ক, সিডনী, ১৯৭৮।

৯। গ্রে টি. সি. এবং নান জে. এফ. : জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া। প্রথম ভল্যুম। বাটার ওয়ার্থ'স্, লন্ডন, ১৯৮১।

১০। গ্রে টি. সি. এবং নান জে. এফ. : জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া, দ্বিতীয় ভল্যুম, বাটার ওয়ার্থ'স্, লন্ডন, ১৯৮১।

১১। থ্রনটন জে. এ. এবং লেভি সি. জি. : টেকনিকস্ অফ অ্যানেস্থিসিয়া। চাপমান অ্যান্ড হল, লন্ডন, ১৯৭৪।

১২। পাল এ. কে. : এসেনসিয়ালস অফ অ্যানেস্থিসিয়োলজি। অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, কলিকাতা ও দিল্লী, ১৯৮০।

১৩। পাল এ. কে. : ড্রাগস্ এন্ড ইকুয়েপমেন্টস্ ইন অ্যানেস্থিটিক প্রাকটিস। ভারতী বুক ষ্টল, কলিকাতা, ১৯৮৪।

১৪। পাল এ. কে. : অ্যানেস্থিসিয়া। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৪।

১৫। প্রায়র ডবলিউ. জে. এবং বুশ ডি. সি. টি. : এ ম্যানুয়েল অফ অ্যানেস্থিটিক টেকনিকস্। জন রাইট এন্ড সন্স, লন্ডন, ১৯৬৯।

১৬। ফারমান জে. ভি. : অ্যানেস্থিসিয়া অ্যান্ড ই. এম. ও. সিষ্টেম। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি, লন্ডন, ১৯৭০।

১৭। ফ্রীডম্যান এ. পি., গ্রাঞ্জার এম. ই. এবং কাল্ডওয়েল এন. : হেডেক টু ডে। এস. কার্গার, বাশেল, লন্ডন, প্যারিস, নূ্য ইয়ক, সিডনী, ১৯৭৮।

১৮। বসাক বি. কে. : ফার্মাকোলজি ফর দি অ্যানেস্থিটিষ্ট। টেকনোমিক পাবলিশিং কোম্পানি, ইউ. এস. এ. ১৯৮১।

১৯। বেল জি. এইচ. এমস্লি-স্মিথ ডি. এবং প্যাটারসন সি. আর. : টেক্সট বুক ফিজিওলজি। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি এবং চার্চিল লিভিংষ্টোন, লন্ডন, ১৯৮০।

২০। বাক্সটন হর্কিন্স ডি. এ. : অ্যানেস্থিসিয়া, রিকভারী অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার। দি ইংলিশ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, লন্ডন, ১৯৭০।

২১। মিলার আর. ডি, : অ্যানেস্থিনিয়া। প্রথম ভল্যুম, চার্চিল লিভিংষ্টোন, এডিনবার্গ। ১৯৮১।

২২। মিলার আর. ডি. : অ্যানেস্থিসিয়া। দ্বিতীয় ভল্যুম, চার্চিল লিভিংষ্টোন, এডিনবার্গ, ১৯৮১।

২৩। মিলার এস. জে. এইচ. : পার্সনস্ ডিজিসেজ্ অফ দি আই। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি এবং চার্চিল লিভিংষ্টোন, লন্ডন ও এডিনবার্গ, ১৯৭৮।

২৪। লরেন্স ডি. আর. : ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি, লন্ডন, ১৯৮০।

গ্রন্থ-বিবরণী

১। উইলি ডবলিউ. ডি. এবং চার্চিল-ডেভিডসন এইচ. সি. : এ প্রাকটিস অফ অ্যানেস্থিসিয়া। লয়েড লিউক (মেডিকেল বুকস) লিমিটেড, লন্ডন, ১৯৭৯।

২। এডামস জন ক্রফোর্ড : আউটলাইন অফ অর্থোপেডিক্স। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি এবং চার্চিল লিভিংষ্টোন, লন্ডন, ৮ম সংস্করণ, ১৯৭৬।

৩। ওয়েল জে. ও. : টিডিজ ম্যাসাজ এন্ড রেমিডিয়াল এক্সারসাইজেস ইন মেডিকেল এন্ড সার্জিক্যাল কন্ডিসনস্। জন রাইট এন্ড সন্স লিমিটেড, ব্রিস্টল, ১৯৬৮।

৪। কনডন আর. ই. এবং ডিকোশী জে. জে. : সার্জিক্যাল কেয়ার। লী অ্যান্ড ফেবিজার, ফিলাডেলফিয়া, ১৯৮০।

৫। কলিন্স ভি. জে. : প্রিন্সিপলস্ অফ অ্যানেস্থিসিয়োলজি। কোঠারি বুক ডিপো, বোম্বাই, ১৯৭২।

৬। গাইটন এ. সি. : টেক্সট বুক অফ মেডিকেল ফিজিওলজি। ডবলিউ. বি. সন্ডার্স কোম্পানি, ফিলাডেলফিয়া, লন্ডন, টোকিও, টরেন্টো, ১৯৮১।

৭। গ্যানং ডবলিউ. এফ. : রিভিউ অফ মেডিকেল ফিজিওলজি। লেঞ্জ মেডিকেল পাবলিকেশনস্, মেরুজেন কোম্পানি লিমিটেড। ১৯৬৯।

৮। গ্রাঞ্জার এম. ই. এবং কান্ডওয়েল নর্থ : এপিডিমিওলজি অ্যান্ড ননড্রাগ ট্রিটমেন্ট অফ হেড পেন। এস. কার্গার, বাশেল, লন্ডন, প্যারিস, ন্যু ইয়র্ক, সিডনী, ১৯৭৮।

৯। গ্রে টি. সি. এবং নান জে. এফ. : জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া। প্রথম ভল্যুম। বাটার ওয়ার্থস্, লন্ডন, ১৯৮১।

১০। গ্রে টি. সি. এবং নান জে. এফ. : জেনারেল অ্যানেস্থিসিয়া, দ্বিতীয় ভল্যুম, বাটার ওয়ার্থস্, লন্ডন, ১৯৮১।

১১। থর্নটন জে. এ. এবং লেভি সি. জি. : টেকনিকস্ অফ অ্যানেস্থিসিয়া। চাপমান অ্যান্ড হল, লন্ডন, ১৯৭৪।

১২। পাল এ. কে. : এসেনসিয়ালস অফ অ্যানেস্থিসিয়োলজি। অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, কলিকাতা ও দিল্লী, ১৯৮০।

১৩। পাল এ. কে. : ড্রাগস্ এন্ড ইকুয়েপমেন্টস্ ইন অ্যানেস্থিটিক প্রাকটিস। ভারতী বুক স্টল, কলিকাতা, ১৯৮৪।

১৪। পাল এ. কে. : অ্যানেস্থিসিয়া। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৪।

১৫। প্রায়র ডবলিউ. জে. এবং বুশ ডি. সি. টি. : এ ম্যানুয়েল অফ অ্যানেস্থিটিক টেকনিকস্। জন রাইট এন্ড সন্স, লন্ডন, ১৯৬৯।

১৬। ফারমান জে. ভি. : অ্যানেস্থিসিয়া অ্যান্ড ই. এম. ও. সিস্টেম। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি, লন্ডন, ১৯৭০।

১৭। ফ্রীডম্যান এ. পি., গ্রাঞ্জার এম. ই. এবং কাল্ডওয়েল এন. : হেডেক টু ডে। এস. কার্গার, বাশেল, লন্ডন, প্যারিস, ন্যু ইয়ক, সিডনী, ১৯৭৮।

১৮। বসাক বি. কে. : ফার্মাকোলজি ফর দি অ্যানেস্থিটিস্ট। টেকনোমিক পাবলিশিং কোম্পানি, ইউ. এস. এ. ১৯৮১।

১৯। বেল জি. এইচ. এমল্লি-স্মিথ ডি. এবং প্যাটারসন সি. আর. : টেক্সট বুক ফিজিওলজি। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি এবং চার্চিল লিভিংষ্টোন, লন্ডন, ১৯৮০।

২০। বাক্সটন হফকিন্স ডি. এ. : অ্যানেস্থিসিয়া, রিকভারী অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার। দি ইংলিশ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, লন্ডন, ১৯৭০।

২১। মিলার আর. ডি, : অ্যানেস্থিনিয়া। প্রথম ভল্যুম, চার্চিল লিভিংষ্টোন, এডিনবার্গ। ১৯৮১।

২২। মিলার আর. ডি. : অ্যানেস্থিসিয়া। দ্বিতীয় ভল্যুম, চার্চিল লিভিংষ্টোন, এডিনবার্গ, ১৯৮১।

২৩। মিলার এস. জে. এইচ. : পার্সনস্ ডিজিসেজ্ অফ দি আই। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি এবং চার্চিল লিভিংষ্টোন, লন্ডন ও এডিনবার্গ, ১৯৭৮।

২৪। লরেন্স ডি. আর. : ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি, লন্ডন, ১৯৮০।

২৫। লিপটন স্যাম্পসন : দি কন্ট্রোল অফ ক্রনিক পেন। এডওয়ার্ড আর্নল্ড, লন্ডন, ১৯৭৯।

২৬। লী জে. এ. এবং অ্যাটকিনসন আর. এস. : এ সিনপসিস অফ অ্যানেস্থিসিয়া। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি, জন রাইট অ্যান্ড সন্স লিমিটেড, ব্রিস্টল, ১৯৭৮।

২৭। স্মিথ জি. এবং আইটকেনহেড এ. আর. : টেক্সট বুক অফ অ্যানেস্থিনিয়া। চার্চিল লিভিংস্টোন, এডিনবার্গ, লন্ডন, মেলবোর্ণ ও ন্যু ইয়র্ক, ১৯৮৫।

২৮। হল আই. এস. এবং কোলমান বি. এইচ. : ডিজিজেস্ অফ দি নোজ, থ্রোট অ্যান্ড ইয়ার। দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বুক সোসাইটি এবং চার্চিল লিভিংস্টোন, লন্ডন এবং এডিনবার্গ, ১৯৭৫।

২৯। হান্টার ডোনাল্ড : প্রাইসেস টেক্সট বুক অফ দি প্রাকটিস অফ মেডিসিন। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, লন্ডন, ন্যু ইয়র্ক, টরেন্টো, ১৯৭০।

৩০। হিউয়ার সি. এল. এবং অ্যাটকিনসন আর. এস. : রিসেন্ট এডভান্সেস্ ইন অ্যানেস্থিসিয়া অ্যান্ড এনালজেসিয়া। দ্বাদশ সংস্করণ, চার্চিল লিভিংস্টোন, এডিনবার্গ, ১৯৭৬।

৩১। হ্যান্ডফিল্ড জোন্স আর. এম. এবং পোরিট এ. ই. ঃ দি এসেনসিয়ালস্ অফ মডার্ণ সার্জারী। ই অ্যান্ড এস লিভিংস্টোন লিমিটেড, এডিনবার্গ ও লন্ডন, ১৯৭৫।

নির্দেশিকা

এই পুস্তকে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যথা বিশেষতঃ দীর্ঘস্থায়ী পুরানো ব্যথার বিভিন্ন দিক এবং তার আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সবিস্তারে যথাসম্ভব সহজ, সরল, সাবলীল এবং বোধগম্যভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ চিকিৎসক এবং মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের বিশেষতঃ যাদের বাংলাভাষায় বিশেষ আগ্রহ আছে, তাদের এই বইটি ব্যথাবিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী হবে। ব্যথাবিজ্ঞান বিষয়ে বাংলাভাষায় এই ধরনের পুস্তক এটিই সর্বপ্রথম। এর লেখক একজন অভিজ্ঞ অবেদন-বিদ্যাবিশারদ চিকিৎসক (অ্যানেস্থিসিয়োলজিস্ট) এবং প্রখ্যাত শিক্ষক।

চব্বিশ টাকা